প্রাগিতিহাসের মানুষ

শচীন্দ্রনাথ বসু





প্রাগিতিহাসের মানুষ

প্রাগিতিহাসের মানুষ

সৃষ্টি থেকে সভ্যতা পর্যন্ত মানুষের কাহিনী

শচীন্দ্রনাথ বসু

ফার্মা কে এল্ মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা * ১৯৬৩

প্রকাশক। ফার্মা কে এল্ মুখোপাধ্যায়, ৬/১এ বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন,
কলিকাতা ১২

মুদ্রক। মহাকালী প্রেস, ৩৪বি ব্রজনাথ মিত্র লেন, কলিকাতা ৯

চিত্রশিল্পী। প্রবীর সেনগুপ্ত, শচীন্দ্রনাথ বসু

আট টাকা

"Time present and time past
Are both perhaps present in time future,
And time future contained in time past."

T. S. Eliot

এই লেখকের রচনা

রম্যরচনা। মিহি ও মোটা

ভ্রমণ। দেশান্তরী, সব হারানোর দেশে

উপন্যাস। সাত সমুদ্র, সীতার স্বয়ংবর, নতুন ঠিকানা, মায়াপুরী

গল্প। শনিবারের সন্ধ্যায়

ভূমিকা

এই বইয়ের বিষয়বস্তু মানুষ, এতে তার ইতিবৃত্ত বলা হয়েছে মর্ত্যে আগমন থেকে ঐতিহাসিক কাল পর্যন্ত। অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় মানুষের অভ্যুদয় অনেকটা সাম্প্রতিক ঘটনা, সুতরাং তার আগে পৃথিবীর ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে প্রথম দিকে।

সৃষ্টির পটে মানুষের স্থান যথাযথ বুঝতে হলে যে মহাকাহিনীর সঙ্গে পরিচয় দরকার তার সূচনা জ্যোতির্মণ্ডলে, আর পরিণতি আধুনিক ইতিহাসে; জ্যোতির্বিদ্যা থেকে শুরু করে ভূবিদ্যা, প্রত্নজীববিদ্যা ও প্রত্নতত্ত্বের অধ্যায় পার হয়ে সে গল্প এখনও ক্রমশ-প্রকাশ্য। চক্রনিহারিকা থেকে আধুনিক মানুষ পর্যন্ত এক সুসংলগ্ন অবিচ্ছিন্ন ছবি সামনে না থাকলে পরিপ্রেক্ষিতের পূর্ণাঙ্গ উপলব্ধি সম্ভব নয়। সেই মহাকাহিনীর এক অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক পরিচ্ছেদ এই বইয়ের প্রতিপাদ্য।

তথ্য সংগ্রহ করতে অবশ্য আমাকে প্রায় সর্বতোভাবে পশ্চিমী লেখকদের শরণাপন্ন হতে হয়েছে—পশ্চিমে এ বিষয়ে উৎকৃষ্ট বইয়ের অভাব নেই, কারণ প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে সাধারণের ঔৎসুক্য আজ দ্রুতবর্ধিষ্ণু। কিন্তু তা বলে এ রচনা বিদেশী গ্রন্থের প্রতিচ্ছবি নয়—সেগুলিতে যে বিশেষ পশ্চিমী দৃষ্টিভঙ্গি প্রায়ই লক্ষিত হয় স্বভাবতই তা এখানে বর্জিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় প্রস্তর যুগ সম্বন্ধে তথ্য এ যাবৎ অল্প হলেও তার বিবিধ দিকের যথাসম্ভব সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিক কাহিনী-সূত্রের সঙ্গে যোগ রাখা হয়েছে দেশ বিদেশের পুরাণ কাহিনীর—সেখানেও কিছুটা অভিনবত্ব থাকতে পারে। তা ছাড়া, প্রসঙ্গক্রমে লেখকের ব্যক্তিগত মন্তব্য প্রকাশ পেয়েছে কোথাও কোথাও, যদিও সমগ্র রচনার তুলনায় তা নিতান্তই প্রাসঙ্গিক ও গৌণ।

প্রাগিতিহাসের দলিল ইতিহাসের মত সম্পূর্ণ ও প্রামাণিক হয় না কখনও, কারণ সাক্ষ্য বিরল ও আংশিক, বিশেষত দূর অতীতের। তারিখ নিয়ে প্রায়ই মতানৈক্য দেখা যায়, সেই কারণে পুরাপ্রস্তর যুগের বিভিন্ন পর্ব বিশেষজ্ঞরা সাধারণত মেপে থাকেন ভূতত্ত্বের কাঠামোতে, বিভিন্ন তুষার যুগের পটে, যাদের সীমা ও পরিধি মোটামুটি সর্বজনগ্রাহ্য। কিন্তু সাধারণের

পাঠ্য পুরাবৃত্তে তারিখ সম্বন্ধে ঔৎসুক্য স্বাভাবিক, সুতরাং আধুনিকতম খবর অনুসারে তা দাখিল করেছি যথাসম্ভব। দিন কাল নিয়ে কোনও পাঠকের সন্দেহ জাগলে মনে রাখা দরকার যে এ ক্ষেত্রে প্রায়ই নানা মুনির নানা মত। একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে : নবপ্রস্তর যুগের শুরু (কৃষির আবিষ্কার) মোটামুটি সাম্প্রতিক ঘটনা, কেউ বলেন খৃষ্টপূর্ব ৬০০০ সালের কাছাকাছি, কারও মতে আরও কিছু আগে, কিন্তু বড় জোর ৮০০০ বিসিতে। এ দিকে এইচ জি ওএল্স রচিত সুপ্রসিদ্ধ ও উৎকৃষ্ট বিশ্বের ইতিহাস গ্রন্থে এই আশ্চর্য ও দৃঢ় উক্তির সাক্ষাৎ মেলে যে কৃষির সূচনা হয়েছে ১৫,০০০-১২,০০০ বিসির মধ্যে এবং ১০,০০০ বিসিতে প্রায় সমগ্র মানব জাতি তা গ্রহণ করেছে। আসলে কৃষিবিদ্যা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে সময় লেগেছে অনেকটা, গর্ডন চাইল্ড এক জায়গায় লিখেছেন যে পুরাপ্রস্তর যুগ কোথাও কোথাও খৃষ্টীয় ১৮০০ সাল পর্যন্ত প্রলম্বিত।

মতানৈক্য ছাড়াও সত্যিকারের ভুল যে একেবারে নেই এই ধরনের তথ্য-ভারাক্রান্ত গ্রন্থে (বিশেষত প্রথম পাঠে) এমন দাবি কেউ করতে পারে না— আমিও করছি না।

যাঁরা একটু গভীর ভাবে জানতে চান বইখানি প্রধানত তাঁদের উদ্দেশ্যে রচিত, যদিও হালকা পাঠকরা কিছু কিছু বাদ দিয়ে পড়লে উপভোগের ব্যাঘাত হবে না।

এই বইয়ের কিছু উপাদান নিয়ে রচিত এগারোটি প্রবন্ধ রবিবারের স্টেটসম্যান পত্রিকায়, ও দশটি প্রবন্ধ আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই দুই সম্পাদকের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

মহাশূন্য মহাকালের অতিকায় পটে মানুষের কাহিনী অনুধাবন করতে গেলে মন চলে যায় দেশ কালের বাইরে বহু দূরে, তুচ্ছ বোধ হয় যা নিকট, যা ব্যক্তিগত। জানার বস্তুর পাশে পাশে এই অনুভবের বস্তুটি যদি লেখকের মত পাঠককেও স্পর্শ করে তবেই সম্পূর্ণ সার্থক তার পরিশ্রম।

শচীন্দ্রনাথ বসু

ভ্রম সংশোধন

পৃঃ	লাইন	যা আছে	যা হবে
৩	শেষ	এক কোটি বছর	এক কোটি কোটি বছর
৯৫	২১	মাত্র হাজার	মাত্র কয়েক হাজার
৯৮	১৯	১৭ লক্ষ বছর	১˙৭ লক্ষ বছর

১৮৩ পৃষ্ঠায় যে মানচিত্রটি আছে তাতে অ্যাসিরিয়ার স্থান ভুল দেখানো হয়েছে ; দেশটি আসলে সিরিয়ার পুবে ।

প্রথম খণ্ড

•

আগমনী

পৃথিবীর প্রস্তুতি

"অরূপ অকূল বাষ্পমাঝে বিধি কোমর বেঁধে
আকাশটারে কাঁপিয়ে যখন সৃষ্টি দিলেন কেঁদে
আদ্যযুগের খাটুনিতে পাহাড় হল উচ্চ,
লক্ষযুগের স্বপ্নে পেলেন প্রথম ফুলের গুচ্ছ।"

রবীন্দ্রনাথ

১। বিশ্ব, পৃথিবী, প্রাণ

সৃষ্টি সম্বন্ধে তিনটি গুরুতর মৌলিক প্রশ্নের জবাব আজ পর্যন্ত আমাদের অজানা—তা হল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, পৃথিবী ও প্রাণের জন্ম-ইতিহাস।

বিশ্বের উৎপত্তি বিষয়ে কতই না কাহিনী বিভিন্ন জাতির পুরাণে বহু সহস্র বছর ধরে প্রচলিত। অধিকাংশ পুরাকাহিনীতেই সৃষ্টি মানে শুধু মর্ত্য নয়, তার সঙ্গে স্বর্গ বা আকাশলোক অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত, বস্তুত এদের পতি পত্নী রূপেই কল্পনা করা হয়েছে, যেমন মিশরী গ্রীসীয় পলিনেশীয় ও অ্যাজ়টেক [জ় = z] পুরাণে, যেমন বেদের দ্যৌষ্পিতা ও পৃথিবী মাতা। মানুষ কুলের আগে এসেছে দেবকুল। সৃষ্টির পূর্বাবস্থার বর্ণনায় প্রায়ই কল্পনা স্তম্ভিত হয়—যেমন, অনির্দিষ্ট মূর্তিহীন বিশৃঙ্খলা (ব্যাবিলন), গহন অতল (মিশর), কুয়াশাবৃত বিস্ফারিত গহ্বর (আইসল্যাণ্ড), অসীম আকাশ নিশ্চল জলরাশি আর অখণ্ড স্তব্ধতা (মধ্য আমেরিকার মায়া সভ্যতা)। সবচেয়ে গম্ভীর বোধ হয় ঋগ্‌বেদের প্রসিদ্ধ নাসদীয় সূক্তের বর্ণনা : আরম্ভে সৎ অসৎ, মৃত্যু অমৃতত্ব, আকাশ অন্তরীক্ষ, রাত্রি দিন কিছুই ছিল না ; সর্বব্যাপী তমসার আড়ালে শুধু অনির্দিষ্ট বিশৃঙ্খলা, কেবল তাপজাত অদেহী শূন্যতা—তার মধ্যে এক ও অদ্বিতীয়, বায়ু বিনা আপন শক্তিতে নিঃশ্বসিত। ক্রমে দেখা দিল ইচ্ছা, এই ইচ্ছাই আদিম বীজ—এল জননী শক্তি।…এত বলে ঋষি আবার বলছেন, কিন্তু কে বলতে পারে কোথা থেকে সৃষ্টির উৎপত্তি, পৃথিবীর পরে

দেবতাদের জন্ম—তারাও তা জানে না। একমাত্র যিনি আদি হয়তো তিনিই জানেন, হয়তো তিনিও জানেন না!

কি করে আদিম বিশৃঙ্খলা থেকে সৃষ্টি দানা বাঁধল, কে বা কি শক্তি তার কর্তা ও কাণ্ডারী এই জটিলতম প্রশ্নেরও বিচিত্র মীমাংসা দেখা যায় পুরা কালের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে। ব্যাবিলনীয় পুরাণে এক দেবতা স্ত্রীরূপী বিশৃঙ্খলাকে দ্বিখণ্ডিত করে বানালে দ্যুলোক ও ভূলোক; চীনের এক কিংবদন্তী আরও কাব্যময়—প্রাথমিক আলো-আঁধার, তাপ-শীত, শুষ্ক-আর্দ্র নির্বিভেদ্ অবস্থা থেকে যা কিছু সূক্ষ্ম তা উর্ধ্বে উঠে সৃষ্টি করলে স্বর্গ, যা কিছু স্থূল তা নিচে গিয়ে বানালে মর্ত্য। মিশরী পুরাণে দেবাদিদেব সূর্য সব কিছুর স্রষ্টা, তার ভাবনার থেকে উদ্ভূত আকাশ ও অন্তরীক্ষ, তাদের সন্তান দ্যুলোক ও ভূলোক। গ্রীসীয় উপাখ্যানে প্রথমে অখণ্ড অন্ধকারের আড়ালে পাখিরূপী রাত্রি এক ডিম পাড়লে, তার খোসার উপরিভাগ থেকে হল স্বর্গ, নিম্নভাগ থেকে মর্ত্য, আর ভিতর থেকে কামদেব নির্গত হয়ে এদের বিবাহ ঘটালে, সৃষ্টি হল যক্ষকুল দেবকুল। এর সঙ্গে তুলনীয় ছান্দোগ্য উপনিষদের কাহিনী: আদিতে ব্রহ্মার ধ্যান থেকে এক ডিমের সৃষ্টি, ডিম ফেটে দু ভাগ হল, এক অর্ধ রূপার তৈরি, তা হল পৃথিবী, অন্য ভাগ সোনার, তা হল আকাশ—আর ভিতরের বিভিন্ন অংশ থেকে পর্বত, মেঘ, নদী, সমুদ্র ইত্যাদি। তদ্ যদ্ রজতং সেয়ং পৃথিবী যৎ সুবর্ণং সা দ্যৌর্যজ্জরায়ু তে পর্বতা যদুল্বং সমেঘো নীহারো যা ধমনয়স্তা নদ্যো যদ্বাস্তেয়মুদকং স সমুদ্রঃ॥ (৩, ১৯, ২)

ভাবতে মন্দ লাগে না যে স্বপ্ন ইচ্ছা বা ভাবনা থেকেই সব কিছুর জন্ম! আধুনিক জ্যোতিষ শাস্ত্রও বলছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গণিতের নিয়মে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা—এবং ভাব বা স্বপ্ন ছাড়া গণিত আর কিছু নয়, তাকেও ধরা ছোঁয়া যায় না। জেম্স জীন্স লিখেছিলেন সৃষ্টি কোনও অভ্রান্ত গণিতজ্ঞের চিন্তা বা মনন মাত্র।

সে যাই হক, বিজ্ঞানী তা বলে ওখানেই থেমে থাকেন নি। সৃষ্টির আগাগোড়া এবং তার মধ্যে মহাকাল আর মহাশূন্যের যে বিরাট বিস্তৃতি তা ক্ষুদ্র মানুষের ধারণার অতীত হতে পারে, কিন্তু ঐ গণিতের রাস্তা ধরে অন্তত এটুকু বোঝা গিয়েছে যে প্রকাণ্ড হলেও ব্রহ্মাণ্ড অসীম নয়। এবং

যেহেতু ঐ সীমার পরিধি প্রতি মুহূর্তে ভীষণ বেগে বেড়ে চলেছে সেহেতু একদা এর শুরুও ছিল।* কিন্তু ঐখানে এক দুরূহ প্রশ্ন : শুরুর আগে কি তা হলে মহাকালের চাকা থেমে ছিল—সময় তো থেমে থাকে না, তার কি ইতিহাস ?

মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানী জর্জ গ্যামো প্রস্তাব করেছেন যে এক আদিম উত্তপ্ত গ্যাস থেকে বর্তমান বিশ্বের সূচনা কয়েক শো কোটি বছর আগে, তাঁর মতে সেই সময়ে মাত্র আধ ঘণ্টার মধ্যে বস্তুর উপাদান সব মৌলিক পদার্থগুলি তৈরি হয়ে যায়। একদা এ সম্বন্ধে তাঁর এক চমৎকার বক্তৃতা শুনবার সুযোগ হয়েছিল, এবং বক্তৃতার শেষে জনৈক শ্রোতার মুখে উপরোক্ত প্রশ্নটির উত্তরে তিনি যা বললেন তা আরও চমৎকার : "সৃষ্টির ঘড়ি চলতে আরম্ভ হওয়ার আগে কি ঘটছিল ?...বিধাতা তখন ব্যস্ত ছিলেন যারা এই ধরনের বেয়াড়া প্রশ্ন করে তাদের জন্য নরক সৃষ্টি করতে।"

মহাভারতে মার্কণ্ডেয় যুধিষ্ঠিরকে গল্প বলেছিলেন যে সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এই চার যুগের এক হাজার চক্রে ব্রহ্মার এক দিন বা এক অর্ধ-কল্প ; এই ৪৩২ কোটি বৎসরান্তে ব্রহ্মার রাত্রি বা প্রলয় কাল ; কল্পান্তে নিদ্রার শেষে জেগে উঠে নারায়ণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তিনি আবার আকাশ পৃথিবী স্থাবর জঙ্গম সৃষ্টি করেন। গীতায়ও এরই প্রতিধ্বনি। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন

অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ (৮, ১৮)

দিন আগমনে অব্যক্ত থেকে সব ব্যক্ত পদার্থ উদ্ভূত হয়, অর্থাৎ নতুন করে সৃষ্টি আরম্ভ হয়, আবার রাত্রি সমাগমে সেই অব্যক্ততেই লীন হয়। এর আগের শ্লোকে ব্রহ্মার প্রতি দিন ও রাত্রিকে বলা হয়েছে সহস্র চতুর্যুগ। এখানে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে আধুনিক বিজ্ঞান বর্তমান ব্রহ্মাণ্ডের যে বয়স অনুমান করে আর এই এক কল্পার্ধ (৪৩২ কোটি বছর) প্রায় একই

*সম্প্রতি দূরতম নীহারিকা পুঞ্জের যে ছবি তোলা হয়েছে ২০০ ইঞ্চি দূরবীন দিয়ে তা সেকেণ্ডে ৯০,০০০ মাইল দূরে সরে যাচ্ছে ; আলোর বেগ এর মাত্র দ্বিগুণ। আধুনিক হিসাবে বিশ্বের শুরু ১০০০-১৭০০ কোটি বছর আগে। জিউইকি কিন্তু বলেন সব নীহারিকা সৃষ্টি হতে অন্তত এক কোটি বছর দরকার।

পর্যায়ে পড়ে—যদিও অবশ্য আমাদের শাস্ত্র অনুসারে এই ব্রহ্মাণ্ডের অর্ধেক আয়ুও (অর্থাৎ ২১৬ কোটি বছর) এখন ফুরায় নি।

সৃষ্টি যে অতি প্রাচীন ও অতি প্রকাণ্ড, তার যে চক্রবৎ লয় ও সূচনা ঘটে এই ধারণা ভারতীয় ধর্মাবলীর স্বাভাবিক অঙ্গ হলেও প্রাচীন য়োরোপীয় দার্শনিক চিন্তার পরিপন্থী। তবে খৃষ্ট জন্মের প্রায় ছ শো বছর আগে গ্রীসীয় দার্শনিক অ্যানাকৃসিম্যান্ডার বলেছিলেন ব্রহ্মাণ্ড যে প্রাথমিক উপাদানে তৈরি (উপরোক্ত জ্বলন্ত গ্যাস ?) বারে বারে তাতেই সে ফিরে যায়, আবার নতুন করে বিবর্তিত হয়। এই ধরনের বিবর্তনী ব্রহ্মাণ্ড আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানেরও একেবারে কল্পনার অতীত নয়। অধ্যাপক গ্যামোকে ঐ যে প্রশ্নটি করা হয়েছিল তার উত্তরে তিনিও এই সম্ভাবনার ইঙ্গিত করেছিলেন। ভারত ছাড়াও অন্য কোনও কোনও দেশের পুরাণে এর ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মেলে—যেমন মেকসিকোর অ্যাজ্‌টেক পুরাকাহিনী অনুসারে এর আগে পৃথিবী একে একে প্লাবন, ঝড় ও আগুনে ধ্বংস হয়ে আবার নতুন করে সৃষ্টি হয়েছে।

পৃথিবীর সৃষ্টি রহস্য ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির মত অত দুর্ভেদ্য হবে না এমন কথা আপাত দৃষ্টিতে মনে হলেও আজ পর্যন্ত এ প্রশ্নের কোনও সহজ উত্তর মেলে নি, এখনও এ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। কেউ বলেছেন মহাশূন্যের ঘূর্ণী গ্যাস ক্রমশ দানা বেঁধে বর্তমান সৌরজগতের সৃষ্টি করেছে। আবার কারও মতে অন্য কোনও জ্যোতিষ্ক হয় সূর্যের সঙ্গে ঠোকাঠুকি খেয়ে নয় তার কাছ ঘেঁষে যেতে মাধ্যাকর্ষণে কিছুটা গ্যাস ছিঁড়ে ফেলেছিল ; তার থেকে গ্রহমণ্ডলের উৎপত্তি। কিন্তু মুশকিল হল গণিতের হিসাব সম্পূর্ণ মেলে না কোন তত্ত্বেই। প্রতি বছরই নতুন থিওরি পেশ করা হয়। একটি বৈপ্লবিক সম্ভাবনা পণ্ডিতদের খুব আকর্ষণ করছে ; এই ধারণা অনুসারে গ্রহগুলির উপাদান জ্বলন্ত গ্যাস বা উত্তপ্ত পদার্থের আকারে ছিল না কখনও, মহাশূন্যের শীতল ও কঠিন বস্তুকণা জমে তারা গড়ে উঠেছে।

পৃথিবী এবং তার জনকের জন্ম রহস্য যাই হক, আমাদের গৃহ এই গ্রহটির জন্মদিন কিন্তু মোটামুটি সঠিক ভাবে হিসাব করা সম্ভব হয়েছে। এই ধরনের কাল গণনার উপায় আছে কয়েকটি, যেমন ভূমিক্ষয়ের বেগ বা সমুদ্রে লবণের পরিমাণ মেপে পৃথিবীর বয়স মোটামুটি অনুমান করা সম্ভব ; কিন্তু

সবচেয়ে আধুনিক ও নির্ভরযোগ্য পদ্ধতির ভিত্তি হল পাথরের অন্তর্গত তেজস্ক্রিয় পদার্থের ক্ষয়। জানা আছে যে ইউরেনিয়ম ক্ষয় হয়ে ক্রমশ রেডিয়মে পরিণত হয় এবং অর্ধেক পরিমাণ ক্ষয় হতে লাগে ৪৫০ কোটি বছর; রেডিয়মও অস্থায়ী, তার থেকে হয় সীসা, এই পরিবর্তনের অর্ধেক সম্পূর্ণ হয় ১৭০০ বছরে। দশ লক্ষ ভাগ ইউরেনিয়ম থেকে এ ভাবে বছরে ১/৭৬০০ ভাগ সীসা তৈরি হয়। ইউরেনিয়মের সমগোত্রীয় থোরিয়মও তেজস্ক্রিয় ধাতু, তারও পরিণতি সীসায়, তবে তা আরও ধীর। সীসার আর রূপান্তর নেই, তার পরিমাণ মেপে তাই পাথরের বয়স অনুমান করা সহজ। তেমনি পটাসিয়ম থেকে হয় আরগন, রুবিডিয়ম থেকে স্ট্রন্‌শিয়ম, এবং কাল গণনায় সম্প্রতি এই রূপান্তরগুলি বেশী ব্যবহার হচ্ছে। আপাতত প্রাচীনতম পাথর যা জানা গিয়েছে তার বয়স প্রায় ৩১০ কোটি বছর ; উল্‌কা খণ্ডের বয়স পাওয়া গিয়েছে ৪৬০ কোটি বছর, এবং এগুলি পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহের সঙ্গেই সৃষ্টি হয়েছে বলে ধরা হয়। পৃথিবী ও সৌরজগতের বয়সের অনুমান ৪৬০ কোটি বছর।

এর মধ্যে অধিকাংশই কেটে গিয়ে থাকতে পারে প্রাণের অভ্যর্থনার জন্য তৈরি হতে হতে। পৃথিবীর উৎপত্তি জলন্ত গ্যাসপিণ্ডের থেকে না হয়ে শীতল বস্তুর থেকে হয়ে থাকলেও তেজস্ক্রিয় পদার্থের ক্ষয়ের ফলে তা খুব তেতে উঠেছিল। মেঘ ভেঙে বৃষ্টি নামে, দেখতে দেখতে উবে যায় ধোঁয়া হয়ে। যুগ যুগ পরে পাথরের খাতে খোবলে জল জমে তৈরি হল মহাসাগর। অবশেষে একদা তারই মধ্যে নড়ে উঠল ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণ, দেখা দিল আইনস্টাইন ও রবীন্দ্রনাথের, হাইড্রোজেন বোমা ও মহাশূন্য-যানের প্রথম সম্ভাবনা!

কি করে সম্ভব হল এই অবিশ্বাস্য অলৌকিক ঘটনা তা আজও জানা নেই। প্রাণ সৃষ্টির আশ্চর্য রহস্যের মুখোমুখি হয়ে কেউ কেউ ভেবেছে যে প্রাণবীজ প্রথমে এখানে এসেছে মহাশূন্যের থেকে, উল্‌কাকে বাহন করে। কল্পনাপ্রবণ লোকেরা এমন কথাও ভাবতে আরম্ভ করেছে যে আজ পৃথিবী-বাসীরা যেমন দিক বিদিকে রকেট পাঠাচ্ছে সেই রকম কোনও বাহন-যোগে গ্রহান্তর থেকে জীবাণু প্রথম পৌঁছে থাকতে পারে পৃথিবীতে। আমাদের খোঁজের ফলে যদি কোনও দিন অন্যত্র এমন প্রাণবস্তুর সন্ধান মেলে যার সঙ্গে

আমাদের পরিচয় আছে তবে এ সম্বন্ধে নতুন করে ভাবতে হবে; ১৯৬১ সালের শেষে দু জন মার্কিন বিজ্ঞানী উল্‌কাতে শেওলা জাতীয় প্রাণীর চিহ্ন পেয়েছেন বলে দাবি করেছেন। এখন পর্যন্ত মনে হয় প্রাণের উদ্ভব এই পৃথিবীতেই—সেই যেখানে সূর্যের আলো এসে পড়েছিল আদিম অগভীর সাগরের উষ্ণ নোনা জলে।

সেই প্রাচীনতম প্রাণীর চেহারা সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হয়েছে। সম্ভবত তা ভাইরাস জাতীয় জিনিস, যা সাধারণ ব্যাকটিরিয়ার চেয়েও ক্ষুদ্র ও সরল। ছোট জাতের ভাইরাসদের দেখা যায় না সবচেয়ে শক্তিশালী অনুবীক্ষণেও, এক মিলিমিটারের মধ্যে পাশাপাশি দশ হাজারটিকে বসানো চলে। এদের এক দল ধ্বংস করে ব্যাকটিরিয়াকে, আবার অনেকে মানুষের দেহে সর্দি, বসন্ত ইত্যাদি রোগের সৃষ্টি করে। এবং আশ্চর্যের বিষয় যে জীবাণু, উদ্ভিদ বা পশু এই কোনও এক রকম প্রাণীর সংসর্গ ছাড়া এরা সম্পূর্ণ নির্জীব, নিষ্ক্রিয়, জননে অক্ষম—অনেকটা রাসায়নিক বস্তুর মত তখন তাদের ব্যবহার।

এই আধা-প্রাণ আধা-জড়বস্তু প্রাণ হিসাবে সরলতম ক্ষুদ্রতম হলেও কিন্তু জৈব-রসায়নীর দৃষ্টিতে বস্তু হিসাবে প্রায় জটিলতম, বৃহত্তম। সেই কারণেই গবেষণাগারে প্রাণ সৃষ্টি এত কঠিন, হীনতম প্রাণী যা অবলীলাক্রমে সম্পন্ন করে তার তুলনায় বিশ্বের সেরা জৈব-রসায়নীদেরও ক্ষমতা অতি সামান্য। কিন্তু খুব সাম্প্রতিক খবরে মনে হয় এই ঘটনা অবশ্যম্ভাবী, এবং তার খুব দেরিও নেই। জীববিজ্ঞানীরা ধরতে পেরেছেন যে নিউক্লেইক এ্যাসিড নামক এক শ্রেণীর বস্তুর মধ্যেই প্রাণের চাবিকাঠি, কারণ এর এক আশ্চর্য ক্ষমতা আছে নিজেকে বাড়িয়ে চলবার—যা প্রাণী মাত্রেরই বৈশিষ্ট্য। এই নিউক্লেইক এ্যাসিড আছে সব প্রাণীর প্রতি দেহকোষের কেন্দ্রে, সেখানে যে বংশকণা (gene) প্রাণীর আকৃতি প্রকৃতির অনেক কিছু নির্ধারিত করে নিউক্লেইক এ্যাসিড তারই উপাদান; ভাইরাসের ক্ষুদ্র দেহে কতটুকুই বা স্থান, সেখানেও এর প্রভুত্ব অপ্রতিহত। প্রাণের এই চাবিকাঠি কি করে মানুষের হাতে গড়ে তোলা যায় তারই গবেষণায় জগতের শ্রেষ্ঠ রসায়নী অনেকে আজ উঠে পড়ে লেগেছেন।

এ কাজে সফল হতে অবস্থার যে সঠিক যোগাযোগ দরকার, প্রকৃতির বৃহত্তর কর্মশালায় একদা সেই আদিম বন্ধ্যা পৃথিবীর জলে কাদায় আলো

বাতাসে মিলে ঠিক তাই ঘটেছিল। প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি বাতাসে ছিল গ্যাস রূপে, জলে বিবিধ লবণ রূপে, একেবারে সঠিক পরিমাণে; বাতাসের তাপ ও চাপ ছিল সম্পূর্ণ উপযুক্ত। সে কালের বাতাসে সম্ভবত অক্সিজেন ছিল না আজকের মত, তার ফলে সূর্যের অতিবেগনী রশ্মি এসে পৌঁছাতে পারত শেষ-পর্যন্ত; পরীক্ষায় প্রমাণ হয়েছে যে এই রশ্মির প্রভাবে জল, কারবন ডাইঅক্সাইড ও অ্যামোনিয়া এই কটি সরল পদার্থের সংযোগে শর্করা ও নাইট্রোজেন-সম্বলিত অপেক্ষাকৃত জটিল জৈব উপাদানের সৃষ্টি সম্ভব। হয়তো এ ধরনের বস্তু সে কালের সেই প্রথম প্রাণকণার 'খাদ্য' ও দেহ গঠনের সহায়ক হয়ে থাকতে পারে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে রসায়ন শাস্ত্র সৃষ্টির বহু আগে এবং পৃথিবীর প্রাথমিক চেহারাটা যখন মানুষের কল্পনারও বাইরে ছিল তখন থেকেই অনেকে অনুমান করেছেন যে জলেই প্রাণের উদ্ভব। যে অ্যানাক্সিম্যান-ডারের কথা একটু আগেই বলেছি প্রায় ২৫০০ বছর আগে তিনি লিখেছিলেন যে প্রাণের জন্ম আদিম কাদায়। বিবিধ পুরাণে দেখা যায় আদিম পৃথিবীতে জল স্থলের ব্যবধান সৃষ্টি করে প্রাণের পথ তৈরি করাই এক প্রধান সমস্যা। ব্যাবিলনীয় উপাখ্যানে প্রথমেই দেবতারা ভাবতে বসেছে কি করে জল সরিয়ে ফলপ্রসূ মাটিকে মুক্ত করা যায়। কিছু কাল পরে এর অনতিদূরের ইহুদি-খৃষ্টান কাহিনীতে বহু দেবতা পরিণত হয়েছে এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরে; এই পুরাণ অনুসারে প্রথমে চরাচর জলমগ্ন ছিল, পরে ঈশ্বর দ্যুলোক সৃষ্টি করলেন, তার উপরে জল নিচে জল; নিচের জল এক দিকে সরিয়ে হল সমুদ্র, তখন পৃথিবী দেখা দিল; প্রাণের সূচনা কিন্তু স্থলেই মনে হয়—জলের প্রাণী সৃষ্টি হওয়ার আগে সেখানে নানা শ্রেণীর উদ্ভিদ (এমন কি ফলগাছ পর্যন্ত) দেখা দিয়েছিল। এই মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলের বহু দূরে আমেরিকার মায়া সৃষ্টিবৃত্তান্তেও শোনা যায় দৈববাণী: জল সরে স্থল মুক্ত হক, যাতে বসুন্ধরা কঠিন হয়ে ফল ধরতে পারে।···

যাই হক, উপযুক্ত অবস্থার যোগাযোগে প্রাণ তো জন্ম নিল। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে খুব সম্ভবত শুধু এক বারই ঘটেছে সেই যোগাযোগ, নতূন করে প্রাণ আর দ্বিতীয় বার জন্ম নেয় নি। সে দিন থেকে সেই

সামান্য অদৃশ্য আদি প্রাণেরই জটিল থেকে জটিলতর অভিব্যক্তি ঘটে চলেছে পৃথিবীর লীলাক্ষেত্রে কোটি কোটি বছর ধরে। অবশ্য এ তত্ত্ব মেনে নিতে মানুষকে অনেক বেগ পেতে হয়েছে, তার গল্প বলছি একটু পরেই।

২। প্রাণের মেলায় প্রকৃতির বাছাই

বন্ধ্যা বসুন্ধরার কোলে প্রাণ সৃষ্টির পর শুরু হল বিচিত্র জীবের মিছিল, হয়তো ১০০ কোটি বছর কি তারও আগে। একটি মাত্র আনুবীক্ষণিক কোষকে আশ্রয় করে যার আগমন ক্রমে তারই পরিণতি অতিকায় তিমি ও ডাইনোসরে। এক দিকে বহুবিধ উদ্ভিদ, অন্য দিকে কত ছোট বড় স্থলচর, জলচর, উভচর, আকাশচর জন্তুর মধ্য দিয়ে প্রাণ শক্তি এগিয়ে চলল—তারা কেউ সুন্দর, কেউ ভীতিকর, কেউ বা অদ্ভুত। তাদের অনেকে আজ সম্পূর্ণ লুপ্ত, কেউ রেখে গিয়েছে শুধু কয়েকটি কঙ্কালের বা তার অংশ মাত্রের সাক্ষী, কেউ বা শুধু দেহের ছাপ পাথরের গায়ে; কেউ বা তাও না, তাদের খবর হয়তো কোন দিনই জানব না আমরা।

কেন এরা এমন করে বিদায় নিল চির দিনের মত? কেউ হার মানল অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায়, কারও শত্রু হয়ে দাঁড়াল বিরুদ্ধ প্রকৃতি—তার পরিবর্তনের ফলে জীবনসংগ্রাম অতি কঠিন হয়ে উঠল। অতিকায় দেহ, মোটা বর্ম বা ঐ রকম অন্য কোনও বিশেষত্ব কেউ এত বেশী অর্জন করলে যে অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সেগুলি বর্জন করা আর সম্ভব হল না। দেহের ভার যার পক্ষে জলে রক্ষা করা সহজ ছিল, জল যখন শুকিয়ে গেল তখন ডাঙায় সে যেন জলে পড়ল। শত্রুর থেকে আত্মরক্ষার জন্য যে গজিয়েছিল ভারী খোলস সে দেখলে তার চেয়ে বরং বেশী দরকার ছিল 'যঃ পলায়তি স জীবতি' এই নীতি অনুসারে

পায়ের জোর আর হালকা দেহ। কিন্তু ক্রমবিকাশের রাস্তা একমুখী, সেখান থেকে ফিরে আসা যায় না, সুতরাং অত্যধিক বিশেষত্ব অর্জনের অন্ধ গলিতে মারা পড়ল অনেকে। যারা এ ধরনের ভুল এড়িয়েছে অথবা ভাগ্যের জোরে প্রকৃতির খেয়াল খুশির, অর্থাৎ ভৌগোলিক পরিবেশ ও আবহাওয়ার আনুকূল্য পেয়েছে তারা বেঁচে রইল।

এই বিচিত্র মেলার সঙ্গে পরিচয় করা অথবা কি করে এই মিছিল গড়ে উঠল সেই সূত্র অনুধাবন করা অতি রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা, কিন্তু তার স্থান এখানে নয়; একেবারে শেষে আবির্ভূত হয়েও আজ যে নিঃসন্দেহে মিছিলের মাথায় সেই আশ্চর্যতম সৃষ্টি মানুষই এ বইয়ের বিষয়বস্তু। তবে ঐতিহাসিক পটভূমির একটা ছক চোখের সামনে থাকলে পরিপ্রেক্ষিতের ধারণা সহজ হয়। তা ছাড়া প্রাণের ক্রমবিকাশ ও নতুন প্রাণীর আবির্ভাব কি ভাবে ঘটে সে সম্বন্ধেও দু কথা বলে নেওয়া দরকার।

পৃথিবী শক্ত হয়ে জমার পর থেকে আজ পর্যন্ত তার উপর অনেকগুলি ছোট বড় ভৌগোলিক পরিবর্তন ঘটেছে। স্থল তলিয়ে গিয়েছে জলের নিচে, আবার জল ফুঁড়ে পাহাড় মাথা তুলেছে; মাত্র সাত কোটি বছর আগেও এই আকাশচুম্বী হিমালয় ছিল সাগর গর্ভে। পৃথিবীর গর্ভে যেন আছে এক বন্দী দানব, কিছু কাল পর পর সে লাফালাফি আরম্ভ করে, বসুন্ধরার ত্বক জায়গায় জায়গায় ফুলে ওঠে তার দাপটে, স্থল মাথা তোলার ফলে জল গিয়ে জমে শুধু গভীর সমুদ্রে। এই সব বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ফলে আবহাওয়ারও নানারকম অদল বদল হয়। তার পর ব্যর্থ দানব আবার বসে বসে দম নেয়—ক্রমশ, কোটি কোটি বছর ধরে আবার পৃথিবীর গা সমতল হয়ে আসে, বৃষ্টিতে পাহাড় ক্ষয়ে যায়, সেই পলি এসে জমে সমুদ্রগর্ভে, ঠেলে তোলে জল, তা আবার গ্রাস করে স্থল—আবহাওয়া নরম হয়ে আসে, যত দিন না জেগে ওঠে দানব। বিগত ৫০ কোটি বছরের মধ্যে আজ পর্যন্ত এই গোছের বড় বিপ্লব পৃথিবীকে গ্রাস করেছে তিন বার—সব শেষেরটি মাত্র দশ লক্ষ বছর আগে, তার আগের দুটি যথাক্রমে ২৫ ও ৫০ কোটি বছর আগে। এই তিনটি মহাবিপ্লবের মধ্যে ভূতত্ত্ববিদরা আবার দশ এগারোটি সুনির্দিষ্ট ছোট বিপ্লবের নির্দেশ পেয়েছেন।

এই সব ভৌগোলিক ও আবহাওয়ার পরিবর্তন তাদের ছাপ রেখে গিয়েছে শুধু বিভিন্ন শ্রেণীর পাথরের মধ্যেই নয়, নানা রকম নতুন প্রাণীর উদ্ভবের মধ্যেও। এই প্রক্রিয়াকে ডারউইন বলেছেন 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' (natural selection) এবং তা অনেকটা এ ভাবে কাজ করে : একই জাতির দুটি প্রাণী—এমনকি যমজ ভাইও—কখনও সম্পূর্ণ অনুরূপ হয় না ; এর কারণ দেহকোষে বংশকণার অদল বদল—এক দান খেলার পর তাস যেমন বেঁটে নেওয়া হয় প্রতি জন্মে এদেরও তেমনি নতুন বিন্যাস ঘটে। এই জন্মগত প্রভেদের ফলে যে কোনও প্রাকৃতিক পরিবেশের পটভূমিতে প্রাণীদুটির যোগ্যতাও সম্পূর্ণ সমান নয় ; যাদের মধ্যে এমন বৈশিষ্ট্য আছে যা সেই অবস্থায় বেঁচে থাকতে সাহায্য করে তারা বাঁচে, অন্যেরা প্রতিযোগিতায় পিছনে পড়ে বংশপরম্পরায় ক্রমশ লোপ পায়। অবশ্য হয়তো অন্য একটি পরিবেশে, হয়তো কয়েক মাইলের মধ্যেই এদের উপর প্রকৃতির নেকনজর, সেখানে প্রথম গোষ্ঠী হেরে যেতে পারে। এরই নাম 'যোগ্যতার জিত' বা survival of the fittest।

কখনও কখনও প্রকৃতির খেয়ালে বংশকণার আকস্মিক পরিবর্তন বা মিউটেশন (mutation) ঘটে। সম্প্রতি রঞ্জন রশ্মির সাহায্যে মানুষও শিখেছে এই কারসাজি, সুতরাং আজ সে পরীক্ষাগারে সৃষ্টি করতে পারে নতুন প্রাণী। তা ছাড়া মানুষের আবির্ভাবের ফলে প্রকৃতির আর সে চেহারা নেই, তার অনেক কিছু পরিবর্তন ঘটেছে অল্প দিনে, সুতরাং প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চেও প্রায় আমাদের চোখের সামনে তৈরি হচ্ছে নতুন প্রাণী।

একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে এখানে। ইংলণ্ডের নানা জায়গায় কয়েক রকম মথ জাতীয় পতঙ্গ উড়ে বেড়াত, তাদের পাখার রং প্রধানত সাদা, তার মধ্যে কালো রেখার আঁকিবুকি। ঐ সব অঞ্চলের যে গাছে তারা বসত তাদের গায়েও এক ধরনের ছাতা গজিয়ে রং দাঁড়াত অনেকটা ঐ রকম। মিউটেশনের ফলে সাদার মধ্যে মাঝে মাঝে কালো জাতের মথও দেখা দিত, কিন্তু তাদের সংখ্যা ছিল অনেক কম। বিগত ১০০ বছরের মধ্যে কিন্তু সাদার তুলনায় কালোর সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছে বিভিন্ন পতঙ্গের মধ্যে, এবং মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে এদের মধ্যে কেউ কেউ সম্পূর্ণ নতুন প্রজাতি (species) অর্থাৎ নতুন প্রাণী হয়ে দাঁড়াতে পারে। এর

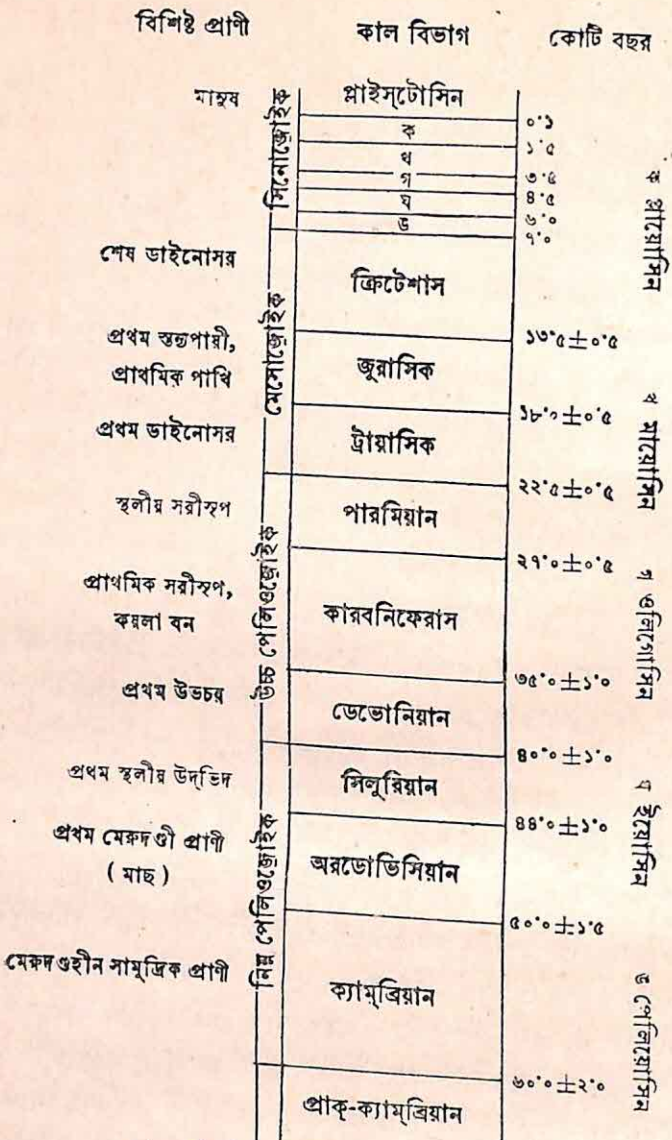
কারণ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের গবেষণার যা ফল তার থেকে মনে হয় ঐ সব অঞ্চলে নতুন কারখানা গড়ে ওঠাতে গাছের উপর কালি পড়েছে, সেই পট-ভূমিতে সাদা পতঙ্গ পাখিদের চোখে পড়েছে সহজে ; যদিও বছর কয়েক আগে গাছের সঙ্গে গা মিলিয়ে তারাই শত্রুর চোখে ধুলো দিত, এখন কালো যোগ্যতর—সুতরাং তারই জয়। এ ক্ষেত্রে অবশ্য ভিন্ন পরিবেশ সৃষ্টি করলে প্রকৃতি নয়, মানুষ—কিন্তু প্রক্রিয়াটা সর্বত্রই এক। হয়তো ঐ অঞ্চলে কোনও খনি আবিষ্কারের ফলেই কারখানা গড়ে উঠেছিল ··· কে জানত মাটির নিচের জড় পাথরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আকাশচর এক জীবের ভাগ্য ! প্রকৃতির হাত প্রচ্ছন্ন হলেও এখানেও মূলে আছে সে।

কৃত্রিম উপায়ে এই ধরনের নির্বাচন অবশ্য বিজ্ঞানীরা গবেষণাগারে ফলিয়েছেন অনেক দিন আগেই, বিশেষ করে স্বল্পায়ু প্রাণীদের উপর। আজকের বহু ফুল ফল তরি তরকারি তার সাক্ষী। প্রকৃতি তার নিজের পরীক্ষা চালিয়েছে প্রাণ সৃষ্টির শুরু থেকে, কোটি কোটি বছর কেটে গিয়েছে বৃহত্তর প্রাণীদের আবির্ভাব থেকে অবলোপে। ভাবতে অবাক লাগে যে সৃষ্টির গোড়াতে যদি এই অতিসূক্ষ্ম বংশকণা না থাকত, না থাকত জন্মে জন্মে তাদের নতুন বিন্যাস, তা হলে ভাইয়ে ভাইয়ে পার্থক্যের সম্ভাবনাও থাকত না, প্রাণ থেমে থাকত অপরিবর্তনের অন্ধকূপে, ভাইরাস থেকে হাতি বা মানুষ কোনও দিন সৃষ্টি হত না !

৩। যুগান্তরের সাক্ষী ফসিল

পৃথিবীর আবহাওয়া ও ভৌগোলিক পরিস্থিতির সঙ্গে প্রাণীর উদ্ভব ও অভিব্যক্তি যখন এত নিকট ভাবে জড়িত তখন আশা করা যায় যে একের পরিবর্তনে অন্যের ধারাও তরঙ্গায়িত হবে। বস্তুত অতীতের দিকে তাকালে আমরা এই রকম ছোট বড় উত্থান পতন অনেক দেখতে পাই, কিন্তু সেই আলোচনার আগে কালের ভাগাভাগি সম্বন্ধে দু কথা জানা দরকার। ইতিপূর্বে যে তিনটি ভৌগোলিক বিপ্লবের কথা বলেছি মোটামুটি সেই সময়টাকে তিন অধিকল্পে ভাগ করা হয়েছে—পেলিওজোইক (palaeozoic) বা পুরা-প্রাণ, মেসোজোইক (mesozoic) বা মধ্য-প্রাণ, এবং সিনোজোইক (cenozoic) বা নব-প্রাণ। অধিকল্প অবশ্য প্রাণীবিদদের সবচেয়ে প্রাথমিক ও বৃহৎ কাল-বিভাগ—ইংরেজীতে যাকে বলে era। আধুনিকতম বা নব-প্রাণ অধিকল্পকে ভূতত্ত্বের ভিত্তিতে আরও ছোট সাতটি অধিযুগে (epoch) ভাগ করা হয়—পেলিওসিন (palaeocene) থেকে সবচেয়ে সাম্প্রতিক প্লাইস্টোসিন (pleistocene) ও হলোসিন (holocene) পর্যন্ত। মোটামুটি এই দুটির সঙ্গেই শুরু প্রত্নবিদদের দুই যুগ (age)—পেলিওলিথিক (palaeolithic) ও নিওলিথিক (neolithic), অর্থাৎ পুরাপ্রস্তর ও নবপ্রস্তর যুগ (lith = পাথর) ; এ বইয়ে পরে আমরা এই দুটি নামই বেশী উল্লেখ করব।

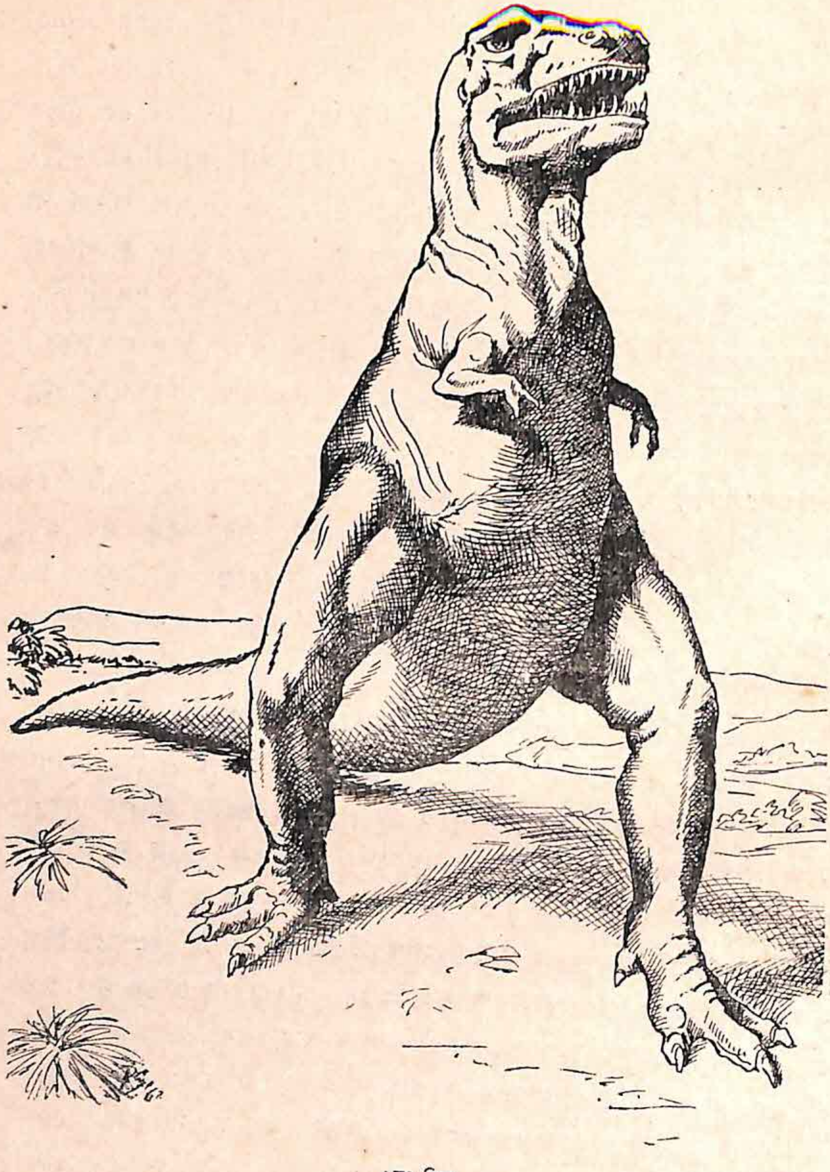
মোটামুটি বলা চলে পেলিওজোইক অধিকল্পের স্থান উপরোক্ত তিন ভৌগোলিক বিপ্লবের প্রথম ও দ্বিতীয়টির মধ্যে, মেসোজোইক ও



॥ ১নং চিত্র। পৃথিবীর কাল বিভাগ ও প্রাণীকুলের উদ্ভব ॥

সিনোজোইকের স্থান দ্বিতীয় ও তৃতীয়ের মধ্যে। পেলিওজোইকের আগেও দুটি অধিকল্প আছে—এজোইক (azoic) বা আরকিওজোইক (archaeozoic) এবং প্রোটেরোজোইক (proterozoic), দুটিতে মিলে প্রায় ৪০০ কোটি বছর। এর মধ্যে কোনও এক সময়ে সৃষ্টি হয়েছিল প্রাণ (কারও কারও অনুমান ৩০০ কোটি বছর আগে), কিন্তু তারিখটা সঠিক জানা নেই, কারণ সেই প্রাচীনতম প্রাণীদের ক্ষুদ্র অস্থিহীন কোমল দেহ কোনও ফসিল বা জীবাশ্ম রেখে যায় নি। এ পর্যন্ত প্রাচীনতম স্পষ্ট ও অক্ষত ফসিল যা পাওয়া গিয়েছে তার বয়স ৬০±২ কোটি বছর, যদিও রোডিসিয়া টাঙানীকার চুনা-পাথরে অস্পষ্ট সাক্ষ্য আছে ২৬০ কোটি বছর প্রাচীন শেওলা জাতীয় জীবের। এই কারণে প্রাক্-পেলিওজোইক প্রাণীদের ধারাবাহিক ইতিহাসও বিশেষ কিছু জানা নেই, কিন্তু এই অধিকল্পের শুরু অর্থাৎ মোটামুটি ৬০ কোটি বছর থেকে ফসিলের সাক্ষ্য অনেক পরিষ্কার। সেই সময় থেকে প্রায় ৩৫ কোটি বছর আগে পর্যন্ত পৃথিবীতে নানাবিধ জলজ উদ্ভিদ, মেরুদণ্ডহীন জন্তু এবং অবশেষে মেরুদণ্ডী মাছের প্রভুত্ব। জীবজগতে মেরুদণ্ডের আবির্ভাব এক বৈপ্লবিক ঘটনা, ঐ কাঠামোকে আশ্রয় করে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের প্রাণীদের উপর প্রকৃতির পরীক্ষা চলল।

স্থল তখনও রুক্ষ বন্ধ্যা পাথর, তার উপর রৌদ্র বৃষ্টির অবিরাম খেলা, মাটির চিহ্ন নেই কোথাও। মেসোজোইকের সূচনার অনেক আগেই কোনও কোনও সামুদ্রিক প্রাণী ডাঙায় উঠতে শিখল, এই উভচর থেকেই সম্পূর্ণ স্থলচর সরীসৃপদের উদ্ভব। এই অধিকল্পের প্রায় ১২ কোটি বছর ধরে সরীসৃপদেরই প্রায় একচ্ছত্র আধিপত্য, তার মধ্যে জলচর আকাশচরও ছিল অনেক। আজকের কুমির কচ্ছপ সাপ টিকটিকি এদেরই বংশধর, কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য সে কালের ডাইনোসর শ্রেণী। ডাইনোসর শুনলে আমাদের ডাইনী মনে পড়তে পারে, আসলে কথাটির অর্থ 'ভয়ংকর সরীসৃপ', এবং সত্যি তাদের এক এক জনের চেহারা বা আকৃতি অতি বড় দুঃস্বপ্নেও কল্পনা করা সহজ নয়। এদেরই বংশে জন্মেছে বৃহত্তম স্থলচর মাংসাশী প্রাণী টিরানোসরাস। কিন্তু ডাইনোসররা অনেকে আয়তনে বিশিষ্ট হলেও তাদের মগজটি হয়ে রইল যৎসামান্য, এবং নতুন পরিবেশে ক্ষুদ্রতর কিন্তু যোগ্যতর নতুন প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে সংগ্রামে এরাও এক দিন হেরে গেল। আজ এরা



২নং চিত্র
অতিকায় ডাইনোসর টিরানোসরাস, মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত কখনও প্রায় ৫০ ফুট, মাথাটি চার ফুট লম্বা।

সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হলেও নিজেদের অতিকায় কঙ্কাল ছাড়া আর কিছুই যে রেখে যায় নি তা নয় ; কোটি কোটি বছর পরে পৃথিবীতে এসে মানুষ ডাইনোসরের ডিম উদ্ধার করেছে মংগোলিয়াতে ও ফ্রান্সে। ১৯৬০ সালে দক্ষিণ ফ্রান্সে মঁপেলিয়ে অঞ্চলে ডাইনোসর-অণ্ড আবিষ্কৃত হয়েছে, তার আনুমানিক বয়স আট কোটি বছর। ১৯৬১-র নভেম্বরেও গোবি মরুতে কুড়িটি ডিম পাওয়া গিয়েছে।

এর পরের অধিকল্প সিনোজোইকে স্তন্যপায়ীদের রাজত্ব আর উদ্ভিদ জগতে ফুলগাছের, সাত কোটি বছর আগে আরম্ভ হয়ে তা এখনও চলেছে। আঁশ, খোলস বা মসৃণ ত্বকের পরিবর্তে গায়ে লোম নিয়ে নতুন শ্রেণীর প্রাণী এই স্তন্যপায়ীরা সিনোজোইকের আগেই দেখা দিয়েছিল। এই সন্ধিক্ষণে প্রকৃতি আর একটি যুগান্তকারী পরীক্ষা শুরু করলে প্রাণীর দেহে তাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করে, রক্ত গরম রাখার কৌশলটি দান করে। তা ছাড়া ডাইনোসরদের বিরাট উদরের পূর্তি ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠল, প্রথম স্তন্যপায়ীদের ক্ষীণ দেহ আর ক্ষুদ্র ক্ষুধাই হয়ে দাঁড়াল তাদের বড় সহায়। কিন্তু তার চেয়েও বড় সম্পদ ছিল মাথায়—হীনতম স্তন্যপায়ীর মস্তিষ্কও বৃহত্তম সরীসৃপের তুলনায় উন্নত। শুধু মানুষ নয়, মানুষের সবচেয়ে পরিচিত ও নিকটবর্তী জন্তুরাও এদেরই দলে। অবশ্য ডাইনোসররা ঠিক কি কারণে লোপ পেল সে সম্বন্ধে এখনও নানা মত।

বিগত ৫০-৬০ কোটি বছরের প্রাণীদের ইতিহাস ও উত্থান পতন সম্বন্ধে এত কথা আমরা জানতে পেরেছি ফসিলের সাহায্যে, সুতরাং এখানে ফসিল ও তার উৎপত্তি বিষয়ে দু কথা বলে নেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সব রকম মৃতদেহ থেকে ফসিল হয় না। খোলা জমিতে মরবে যে জন্তু হয়তো হায়েনা কি অন্য কোনও সর্বনাশা পশু তার হাড় পর্যন্ত গুঁড়িয়ে ফেলবে, তা ছাড়া আছে রোদ বৃষ্টি মাটির প্রভাব, এরা সবাই মিলে কয়েক বছরে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দেবে সেই দেহাবশেষ। এ সব উপদ্রব না থাকলেই দেহ অশ্মীভূত হওয়ার সুযোগ পায়। গোটা দুই উদাহরণ দিই। মধ্য এশিয়ায় পাওয়া গিয়েছে ম্যাস্টোডন নামক অতিকায় প্রাণীর এক প্রকাণ্ড 'কবরখানা'। ম্যাস্টোডন এ কালের হাতির এক অধুনালুপ্ত পূর্বপুরুষ (হাতির তুলনায় তাদের পা ছোট, দাঁত প্রকাণ্ড)। ঐ অঞ্চলে এক বৃহৎ হ্রদের ধারে বহু

শতাব্দী ধরে তারা নিশ্চিন্তে বাস করছিল, জলের কিনারে খাওয়ার উপযুক্ত গাছ পালার অভাব ছিল না। কিন্তু একদা হ্রদ শুকাতে আরম্ভ করল, সঙ্গে সঙ্গে ঘাস পাতাও সরে গেল ভিতরের দিকে ; অবশেষে পেটের দায়ে বেশী দূর ঢুকে পড়ার ফলে হুড়মুড় করে হাতির দল পড়ল কাদায়, আর উঠতে পারল না। সম্ভবত কয়েক হাজার হাতির জীবন্ত সমাধি হয়েছিল এখানে, অবশ্য সবচেয়ে পরে যারা মরেছিল তাদের দেহগুলিই পাওয়া গিয়েছে উপরের দিকে।

এরা যেমন মরেছে ক্ষুধার যন্ত্রণায় তেমনি তৃষ্ণার তাড়নায় মরেছিল আরও কয়েক দল জন্তু আমেরিকার ক্যালিফর্নিয়া প্রদেশে। এখানে গোরস্থান কাদা নয়, আগ্নেয়গিরির উদ্‌গীর্ণ শিলাজতু। আলকাতরার মত এই জিনিসটি আজ জমে কঠিন হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তখন সবে উপরটা জমেছে, ভিতরে নরম ; মাঝে মাঝে নিচু জায়গায় জল জমে তৈরি হয়েছে ছোটখাটো পুকুর। সেখানে তৃষ্ণা মেটাতে এক বীভৎস বিয়োগান্ত নাটকের প্রথম দৃশ্যে এল অতিকায় হাতি, স্লোথ্ আর বাইসন থেকে আরম্ভ করে ঘোড়া, হরিণ, শুয়োর, ক্ষুদ্র খরগোশ, ছুঁচো, এমন কি বাদুড় পর্যন্ত। শিলাজতু যখন ভিতরে টেনে নিয়ে বন্দী করলে এদের, ব্যর্থ আর্তনাদে আকাশ বিদীর্ণ হল, তখন তাই শুনে এদের জীবন্ত দেহ থেকে মাংস ছিঁড়ে খাওয়ার লোভে ছুটে এল সে কালের ভয়ংকর খড়্গদন্তী বাঘ (sabre-toothed tiger), যার মুখের সামনে ঝুলে থাকত প্রকাণ্ড দুটি দাঁত ; তাদের সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল নেকড়ে। কিন্তু প্রকৃতির ফাঁদ তাদেরও পা কামড়ে ধরল। তৃতীয় দৃশ্যে এদের খেতে উড়ে এল শকুনির দল। ধীরে ধীরে নিশ্চিন্ত মৃত্যুর গহ্বরে তলিয়ে গেল সকলে। আজও তারা থাকত সেখানেই যদি না বহু সহস্র বছর পরে বিজ্ঞানী এসে উদ্ধার করতেন এই অসংখ্য কঙ্কাল। এদের মধ্যে পাওয়া গিয়েছে অন্তত ৩০ জাতির বড় ও আরও অনেক বেশী ছোট স্তন্যপায়ী জন্তু। ৩০ রকম শিকারী পাখি এবং এ ছাড়া চল্লিশেরও বেশী অন্য জাতির প্রাণী। মাত্র ১৫ ফুট চওড়া, ২৫ ফুট লম্বা আর ৩৫ ফুট গভীর জায়গার মধ্যে ছিল সতেরটি হাতি। সে সময়ে ও অঞ্চলে যাদের বাস ছিল তারা সকলেই স্থান পেয়েছে ঐ বারোয়ারী কবরখানায়। একমাত্র ভালুক অত্যন্ত চতুর বলে তার সংখ্যা খুব কম। এই প্রাণীদের মধ্যে আজ কেউ কেউ আর

পৃথিবীতে নেই, কারও বা বাস এখন অনেক দূরে—কিন্তু সকলেরই নাম ঠিকানা রেখে দিয়েছে ফসিলের দলিল।

সরীসৃপদের বুদ্ধি অনেক কম তা আগেই বলেছি, তাই আশ্চর্য নয় যে এ ভাবে প্রায়ই দলে দলে আটকে মরেছে তারা। শুধু স্থলে নয় জলেও যে আকস্মিক দলীয় মৃত্যু ঘটতে পারে তারও অনেক প্রমাণ আছে। এ ছাড়া সে কালে আগ্নেয়গিরিগুলি অনেক বেশী তেজী ছিল, জলন্ত লাভা হঠাৎ তেড়ে এসে দগ্ধে মেরেছে পাল পাল স্থলের পশু, বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে মেরেছে সামুদ্রিক প্রাণী। অবশ্য শুধু দল বেঁধে নয়, বহু প্রাণী একলাও মরেছে এমন অবস্থায় যা ফসিল সংরক্ষণের সহায়ক।

কখনও কখনও বরফ রক্ষা করেছে মৃতদেহ। সাইবেরিয়ার নানা স্থানে বরফ-জমা জমিতে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে লোমশ গণ্ডার আর ম্যামথের সম্পূর্ণ অক্ষত দেহ—ঠিক যেমনটি ছিল হয়তো প্রায় ১৫,০০০ বছর আগে যে দিন তারা মরেছিল সম্ভবত নরম পলিমাটির কাদায় আটকে পড়ে। সে কালের



৩নং চিত্র
অরক্‌স।

এক প্রকাণ্ড বুনো ষাঁড়ের ফসিলও কিছু পাওয়া গিয়েছে সাইবেরিয়ায়—তার নাম অরক্‌স (aurochs), প্রাগৈতিহাসিক মানুষের আলোচনায় এদের কথা

পরে আবার বলব। ম্যামথের দেহ পাওয়া গিয়েছে সবচেয়ে উত্তরাঞ্চলে—তাতে মুখের দাঁত গায়ের চামড়া তো বটেই, প্রতিটি লোম এমন কি পেটের ভিতরে ঘাস পাতার পর্যন্ত কোনও পরিবর্তন হয়নি। গায়ের মাংস ছিল এত টাটকা যে কুলিরা তা খেতে আরম্ভ করে দিয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে। ১৭৯৯ সালে এমনি একটি ম্যামথের দাঁত খুলে এনে বিক্রি করা হল, তখন ধড়টি কুকুর আর নেকড়েতে খেয়েছিল এক বছরেরও বেশী কাল ধরে; সৌভাগ্য-বশত বিজ্ঞানীরা হাড়গুলি আর লোমঢাকা চামড়া কিছু উদ্ধার করতে পেরেছিলেন শেষ পর্যন্ত। এই সব প্রাণীদের কোনও কোনওটা হয়তো মরেছে ২০,০০০ বছর আগে। প্রায় ৬০ বছর আগে উত্তর সাইবেরিয়ায় একটি ম্যামথের দেহ পাওয়া গিয়েছিল আশ্চর্য স্বাভাবিক ভঙ্গিতে—খাড়া দেহ, একটি পা তোলা, মুখের ভিতর তাজা ঘাস পাতা। অ্যালাস্কায় বরফের নিচে আবিষ্কৃত হয়েছে ম্যামথ-দেহের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন খণ্ড—মনে হয় কোনও প্রবল প্রাকৃতিক বিপত্তির পরেই মুহূর্তে ভীষণ শীতের আক্রমণ ঘটেছিল। ১৯৬০ সালের এক খবরে প্রকাশ যে সাইবেরিয়াতে ১২,০০০ বছর প্রাচীন আর একটি ম্যামথের দেহ পাওয়া গিয়েছে, তার জায়গায় জায়গায় মাংস, ত্বক, ও লোম সম্পূর্ণ অক্ষত। (১৯৬১ সালের শেষে ক্যানাডার ওন্টারিও প্রদেশে ম্যাস্টোডনের হাড় আবিষ্কৃত হয়েছে, তার বয়স নাকি মাত্র ৮০০০ বছর।)

ম্যামথদের দেহ ছিল প্রায় ভারতীয় হাতির সমান, দাঁত প্রায় ২৩ ফুট লম্বা; সাইবেরিয়া থেকে তা নাকি এখনও প্রায়ই বিশ্বের বাজারে আসে, এ যুগের হাতির দাঁতের চেয়ে তার গুণ কম নয়। লেনিনগ্রাডের যাদুঘরে সাজানো আছে ম্যামথের চামড়া ও লোম, এবং একটি জানোয়ারের শুধু শুঁড়ের ডগাটি ছাড়া সম্পূর্ণ অক্ষত দেহ—ভাবতেও শিহরণ হয় যে এদেরই কোনওটাকে হয়তো একদা তাড়া করেছিল পুরাপ্রস্তর যুগের গুহাবাসী মানুষ। কঙ্কাল যতই সুসম্পূর্ণ হক, তার থেকে যে প্রাণীটিকে গড়ে তোলা হয় তার ছাল আর চুলের চেহারা অনেকাংশে কল্পিত, কিন্তু যখন সবই 'সশরীরে' বর্তমান তখন কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। অশ্মীভূত অস্থি-খণ্ডের তুলনায় এই ধরনের আবিষ্কারের দাম অনেক বেশী।

ফসিল সম্বন্ধে এখানে এ কথাটি মনে রাখা দরকার যে প্রাণীর বুদ্ধির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগ, কারণ সাধারণত যাদের বুদ্ধি বেশী তারা এমন মৃত্যু এড়িয়ে চলে যার থেকে ফসিল হওয়া সম্ভব। এই সত্যের গুরুত্ব বোঝা যাবে একটু পরেই যখন আমরা প্রাগৈতিহাসিক বানর ও মানুষের আলোচনা করব।

এ যাবৎ যে সব প্রাচীন জীবদের উল্লেখ করা হল সংক্ষেপে, তাদের তুলনায় মানুষ নিতান্তই শিশু, তার ইতিহাস সম্ভবত দশ লক্ষ বছরেরও কম। (বর্তমানে কেউ কেউ এই সীমা আরও কিছুটা পিছিয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী।) রূপক দিয়ে বলা যায় যে পৃথিবীর সৃষ্টি যদি ঘটে থাকে পয়লা বৈশাখ তো কয়েক মাস কেটে গেল প্রথম অজানা প্রাণীর আবির্ভাব হতে। মাঘ ফাল্‌গুনে শুধুমাত্র প্রাচীনতম মেরুদণ্ডহীন প্রাণীর আগমন, এবং স্তন্যপায়ীদের দেখা পেতে পেতে এসে গেল চৈত্রের তৃতীয় সপ্তাহ। মানুষের যখন জন্ম তখন নববর্ষের বাকি মাত্র দু ঘণ্টারও কম যার মধ্যে বড় জোর ৩৫ সেকেণ্ডকে বলা চলে সভ্য যুগ বা ঐতিহাসিক কাল। ভগ্নাংশ হিসাব করে বলা যায় পৃথিবীর ইতিহাসের এক-অষ্টমাংশ অধিকার করে আছে প্রাচীনতম প্রাণী ফসিলে যার সাক্ষ্য আছে, মেরুদণ্ডী প্রাণী অধিকার করে ১২ ভাগের এক ভাগ, স্তন্যপায়ীরা হয়তো ২৫ ভাগের এক ভাগ, মানুষ পাঁচ হাজারের এক ভাগ, আর মানুষের সভ্যতা ন লক্ষ ভাগের এক ভাগ !

৪। ক্রমবিকাশ: জীবাণু থেকে তিমি

এলেম আমি কোথা থেকে—এ প্রশ্ন মানুষকে অস্থির করেছে দূর অতীত কাল থেকে, হয়তো যখন থেকে খাওয়া থাকার ভাবনার বাইরে অন্য কিছু ভাবতে আরম্ভ করেছে সে। এর জবাব খুঁজতে সে কালের কবিরা নানা রকম কল্পনার জাল বুনেছে, দেশে দেশে পুরাণ কাহিনীতে থেকে গিয়েছে সেই সব বিচিত্র কথা। গ্রীষ্মের দেশ মিশরে সব দেবতার শ্রেষ্ঠ হল সূর্যদেব রা, তার চক্ষুতেজ থেকে সৃষ্টি প্রথম নর নারীর; উত্তর য়োরোপের বনাবৃত তুষার রাজ্যে এদের দেহবস্তু তৈরি হয়েছে দুটি শীতদেশীয় তরুর থেকে। ইহুদীদের ঈশ্বর পৃথিবীর চার দিক থেকে চার মুঠো ধুলো নিয়ে বানিয়েছিলেন আদম ও লিলিথকে। এক চৈনিক কথিকায় পান্ কু নামক এক জীবের দেহের পোকা থেকে মানুষ জাতির উদ্ভব। মধ্য আমেরিকার মায়া সৃষ্টিপুরাণে কথিত আছে দেবতারা মানুষ গড়তে প্রথমে পরীক্ষা করেছিল মাটি দিয়ে, পরে কাঠ দিয়ে; তারও পরে আদর্শ মানুষের উপাদানটি পাওয়া গিয়েছে মকাইর মধ্যে (যা সে দেশের প্রধান শস্য, অপরিহার্য প্রাণবস্তু)। কিন্তু, যেমন প্রায়ই দেখা যায়, এই প্রসঙ্গেও সবচেয়ে সুন্দর হল গ্রীসের পুরাকাহিনী। দেবতারা প্রথমে গড়েছিল এক দল সোনার মানুষ—তাদের কালে পৃথিবীতে ছিল চিরবসন্ত, বসুন্ধরা তার ফল ফসল উজাড় করে দিত প্রতিদানে কোনও পরিশ্রম দাবি না করে, নিরঙ্কুশ নিশ্চিন্ত জীবন এত দীর্ঘ ছিল যে প্রকৃত জ্ঞান লাভ সম্ভব হত তখন।

কিন্তু খেয়ালী দেবতারা হঠাৎ এদের ধ্বংস করে বানালে রূপার মানুষ—সেই সময়ে দেখা দিল শীত গ্রীষ্ম ইত্যাদি ঋতু, প্রকৃতি তখন আর অত সদয় নয়, মানুষকে বাসা বানাতে হল ; জ্ঞান অর্জনের আগেই এসে দাঁড়াত মৃত্যু। তার পর এরাও বিদায় নিল, এল কাঁসার মানুষ—তাদের দীর্ঘ কঠিন দেহ, হাতে ধাতুর হাতিয়ার ; কিন্তু আয়ু আরও কম—লড়াইয়ে প্রাণ যেত অল্প বয়সেই। সবশেষে এল এ যুগের এই হতভাগ্য জাতি, কপালে তার অন্তহীন শ্রমের অভিশাপ আঁকা; আর তাই লোহার তৈরি দেহ ; কিন্তু দেখতে দেখতে সেই লোহাও ক্ষয়ে যায়, মরণ আসে দ্রুত ; স্বর্ণযুগের জ্ঞান, রজতযুগের সারল্য, কাংস্যযুগের শক্তি কিছুই নেই এই বেচারাদের !* এই কাহিনী যতই রূপকথার মত শোনাক, মানুষের প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাসের সঙ্গে এর কিছু কিছু অপ্রত্যাশিত মিল চোখে পড়ে, যেমন বিভিন্ন ধাতু বা গৃহনির্মাণ বা যুদ্ধের ক্রমিক আবির্ভাবে (এ বইয়ের শেষের দিকে তা প্রকাশ পাবে)।

এই ধরনের কাহিনী নিয়েই জগতের জনসাধারণ বেশ নিশ্চিন্ত মনে সন্তুষ্ট ছিল এই সে দিন পর্যন্ত। অবশেষে ১৮৫৯ সালে এক আকস্মিক বিস্ফোরণের ফলে সর্বপ্রথম এই নির্বিবাদ স্থির শান্তিতে দারুণ আঘাত লাগল, বিশেষ করে পাশ্চাত্ত্য জগতে। এই বোমাটি আজ ডারউইনীয় ক্রমবিকাশতত্ত্ব বা অভিব্যক্তিবাদ (Theory of Evolution) নামে পরিচিত—প্রাকৃতিক নির্বাচনের পথে নতুন প্রাণীর সৃষ্টি ও বিকাশ কি করে ঘটে ডারউইন তা ব্যাখ্যা করলেন এক বইতে, যার সংক্ষিপ্ত নাম 'প্রজাতির উদ্ভব' (Origin of Species)। পরে মানুষকেও অবশ্য তিনি প্রকৃতির সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত করলেন না, বরং ক্রমবিকাশের পথে নর ও বানরের সম্পর্ক যে বেশ নিকট সে কথাই বললেন। শুনে সবাই প্রথমে হতভম্ব, কিন্তু দেখতে দেখতে সেই স্তব্ধতা ও আতঙ্ক কেটে গেল তীব্র প্রতিবাদে। দেশের নেতারা এমন কি পণ্ডিতরা পর্যন্ত ক্ষেপে উঠলেন, তাঁদের অবিশ্বাস জানাতে আরম্ভ করলেন যাকে বলে 'জ্বালাময়ী ভাষায়'।

* এখানে মনে পড়ে আমাদের চতুর্যুগ—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি ; এগুলিকেও কখনও কখনও স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ও লোহ যুগ বলা হয়। চতুর্যুগের ঐতিহ্য পারস্যেও ছিল, এবং সবস্তুত এ বিষয়ে তিন দেশ একই সূত্রের কাছে ঋণী।

এখানে মনে রাখতে হবে যে মাত্র ১০০ বছর আগেও য়োরোপে অনেকেরই মনে এই বিশ্বাস ছিল যে জগতের সব প্রাণীই হঠাৎ একই সময়ে এক সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছে এবং তার পরে আর যোগ বা বিয়োগ কিছুই হয় নি, আজ পর্যন্ত চলে এসেছে সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত। ইহুদী-খৃষ্টান পুরাণে বলে বর্তমান পৃথিবী সম্পূর্ণ হয়েছিল ছ দিনে। সপ্তদশ শতাব্দে এক সম্ভ্রান্ত খৃষ্টান ধর্মযাজক আশার (Archbishop Ussher) অনেক হিসাব করে বললেন যে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে খৃষ্টপূর্ব ৪০০৪ সালে, ২২ অকটোবর শনিবার সন্ধ্যা আটটায়। হয়তো তাঁর প্রমাণের মধ্যে ছিল শেক্সপিয়র রচিত As You Like It নাটকের একটি লাইন: 'The poor world is almost 6000 years old'. বাইবেলে আদমের বংশধরদের যে তালিকা আছে তাদের আয়ুর থেকে এই ধরনের হিসাব তৈরি হয়েছে। যাই হক, ক্রমে পৃথিবীর এই বয়স এমন বদ্ধ বিশ্বাসে পরিণত হল যে এর প্রতি সন্দেহ হয়ে দাঁড়িয়েছিল অধার্মিকতা।

আমাদের পুরাণে বরং আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে বেশী মিল দেখতে পাই:

স্থাবরং বিংশতের্লক্ষং জলজং নবলক্ষকম্।
কূর্ম্মাশ্চ নবলক্ষং চ দশলক্ষং চ পক্ষিণঃ॥
ত্রিংশলক্ষং পশূনাঞ্চ চতুর্লক্ষং চ বানরাঃ।
ততো মনুষ্যতাং প্রাপ্য ততঃ কর্ম্মাণি সাধয়েৎ॥

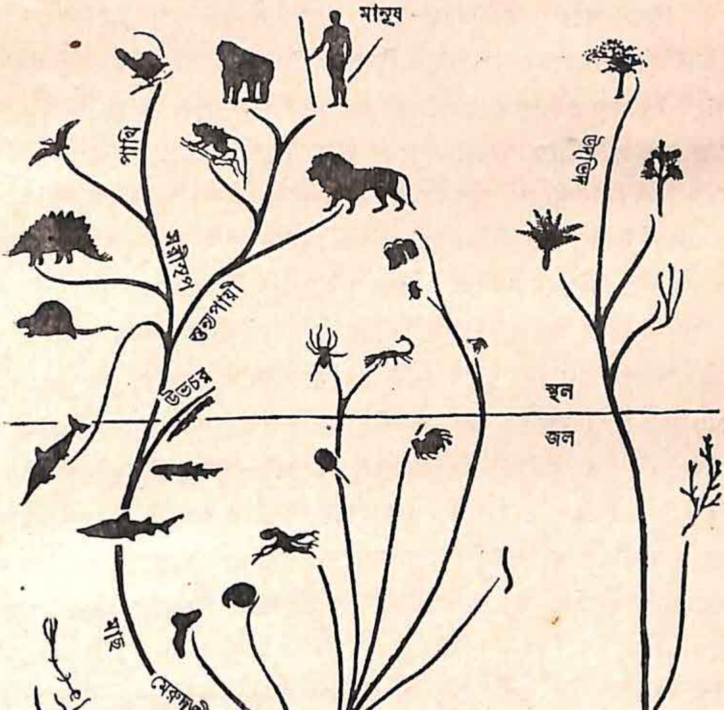
(বৃহৎ বিষ্ণুপুরাণ)

কত জন্ম পার হয়ে শ্রেষ্ঠ জন্ম মনুষ্যত্ব লাভ করতে হয় তার হিসাব। প্রাণীকুলের শ্রেণী বিভাগ লক্ষ্য করবার বিষয়—জীবাণু প্রমুখ অচেতন প্রাণীর থেকে আরম্ভ করে জলচর, সরীসৃপ, পাখি, পশু (স্তন্যপায়ী) এবং একেবারে শেষে বানর—ঠিক আধুনিক প্রাণীবিদ্যার যেমন বিন্যাস! শ্রেণীর মধ্যে বিভিন্ন প্রাণীর সংখ্যা খুব যথার্থ না হতে পারে কিন্তু সব যোগ করলে যা দাঁড়ায়, অর্থাৎ এ পর্যন্ত যত প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে তার অঙ্কটা (যা সঠিক ভাবে জানা নেই এবং সম্ভবত কখনও জানা সম্ভব নয়) হয়তো খুব আজগুবি নয়।

ভেবে দেখতে গেলে ক্রমবিকাশ ব্যাপারটা এতই বিস্ময়কর, জীবাণুর থেকে তিমির উদ্ভব আপাতদৃষ্টিতে এতই অকল্পনীয় যে তা যে কোনও দেশের

সৃষ্টিপুরাণেই স্থান পায় নি সেটা কিছু আশ্চর্য নয় ; প্রাচীন জিজ্ঞাসুদের মনে সবচেয়ে সহজে জেগেছে এক দৈব শিল্পীর ছবি, সব প্রাণীদের যে গড়েছে প্রায় একই সঙ্গে। বাইবেলে প্রথম দিনে গাছপালা দিয়ে সৃষ্টি শুরু, ষষ্ঠ দিনে মানুষ দিয়ে তা শেষ।

যাই হক, ক্রমবিকাশবিরোধী গোঁড়া বিশ্বাসের গোড়ায় য়োরোপে সবচেয়ে বড় ঘা মেরেছে ফসিলের আবিষ্কার। এক দিকে জলচর প্রাণীর



৪নং চিত্র : প্রাণীকুলের বংশবৃক্ষ।

ফসিল স্থলে বসে এক বিশ্রী সমস্যার সৃষ্টি করেছে, অন্য দিকে এমন সব

হাড়গোড় পাওয়া যাচ্ছে যা আজকের কোনও জন্তুর দেহে খাটে না। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইটালিতে খাল কাটতে কাটতে বার হল সামুদ্রিক শামুক জাতীয় বহু খোলস, বিখ্যাত শিল্পী-বিজ্ঞানী লেওনার্ডো দা ভিন্‌চি তার থেকে সিদ্ধান্ত করলেন জায়গাটি একদা ছিল সমুদ্রগর্ভে। তারও অনেক আগে এক গ্রীসীয় পণ্ডিত পাহাড়ের ঊর্ধ্ব দেশে ফসিল পেয়ে ঐ রকম কথাই বলেছিলেন—এঁর নাম জেনোফেনিস, জন্ম খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের শেষে। কিন্তু পরে তাঁরই দেশবাসী এবং আরও বেশী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত অ্যারিসটট্‌ল জানালেন ফসিলের উৎপত্তি ঐ পাথরেরই থেকে। পরবর্তী কালে এমন মতও শোনা গিয়েছে যে ফসিল মহাশূন্য থেকে উল্‌কার মত এসে পড়েছে পৃথিবীতে, অথবা তাদের বীজ উড়ে এসেছে তারার থেকে। আর ম্যামথ বা অন্যান্য লুপ্ত জন্তুর হাড়—ও সব হল দানবের কঙ্কাল।··· এ ধরনের কথা যাদের একটু আজগুবি মনে হল তারা ফসিলের প্রতি চোখ বন্ধ করে রইলেন মাত্র। কিন্তু ফসিলের নজির এত বাড়তে লাগল, এত জরুরী হয়ে উঠল তাদের নীরব প্রশ্ন যে শেষ পর্যন্ত ছাড়তে হল অপরিবর্তিত, অপরিবর্তনীয় সৃষ্টির ধারণা—মানতে হল ক্রমবিকাশ বা evolution। (বস্তুত এই শব্দটির গোড়াতে আছে ল্যাটিন ক্রিয়া evolvere, যার অর্থ 'ক্রমশ উন্‌মোচন করা'—অর্থাৎ উপযুক্ত শব্দটি কিন্তু তৈরি হয়ে গিয়েছিল তার অর্থ সম্পূর্ণ মেনে নেওয়ার আগেই। এই কারণে আমরা ক্রমবিকাশ শব্দটিই সাধারণত ব্যবহার করব, যদিও বাংলায় এই অর্থে অভিব্যক্ত, উৎক্রান্তি, উদ্‌বর্তন, বিবর্তন ইত্যাদি শব্দও ব্যবহার হয়েছে।)

ক্রমবিকাশবাদ এক দিনের বা সম্পূর্ণ এক জনের আবিষ্কার নয়; ডারউইনের আগে যাঁরা তাঁর পথ পরিষ্কার করেছেন, অথবা ফাঁক ভরেছেন, তাঁদের সঙ্গেও সংক্ষেপে পরিচয় করা দরকার। প্রথমে অবশ্য য়োরোপ-বাসীদের ধারণা ছিল যে এক প্রাথমিক সৃষ্টির পরে আর প্রাণীর উদ্ভব, পরিবর্তন বা লুপ্তি হয় নি, এবং সৃষ্টিকর্তা সূক্ষ্ম ধাপে ধাপে প্রাণীকুল গড়েছেন, সেই কারণে তাদের মধ্যে এত নিকট সম্পর্ক। সৃষ্টি মোটামুটি সাম্প্রতিক ঘটনা—খৃষ্টপূর্ব ৪০০৪ সাল সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যাংশে জনপ্রিয় হয়ে উঠলেও ওরই কাছাকাছি তারিখ আগেও চলতি ছিল। সৃষ্টি যে বহু দূর অতীতের

ঘটনা হতে পারে, অথবা তা যে চক্রবৎ ঘুরে আসতে পারে এমন 'প্রাচ্য' বা 'পেগান' ধারণা খৃষ্টানরা কখনও মানে নি।

সুইডেনের বিখ্যাত পণ্ডিত ও প্রাণীকুলের শ্রেণীবিভাগের প্রধান উদ্যোক্তা লিনিয়াস (১৭০৭-৭৮) প্রজাতির অপরিবর্তনীয়তা সম্বন্ধে কিছুটা সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন, যদিও জোর করে কিছু বলেন নি। তেমনি ফরাসী দ মেইয়ে (১৬৫৬-১৭৩৮) অনুমান করেছিলেন যে পৃথিবী আরও প্রাচীন—পাহাড়ের গায়ে ফসিল দেখে তাঁরও বিশ্বাস হয়েছিল যে কোনও দূর কালে সমুদ্র ছিল সেখানে। এঁরই দেশবাসী মোপেতুর্ত্যুই (১৬৯৮-১৭৫৯) বলেছিলেন যে এই বৈচিত্র্যময় প্রাণীজগত একই অভিন্ন স্থত্রের থেকে উদ্ভূত হয়ে থাকতে পারে। তেমনি প্রজাতির মধ্যে যে কিছুটা বিভেদ ঘটে থাকে সপ্তদশ শতাব্দীতেই তা মেনেছিলেন প্রকৃতি-বিজ্ঞানীরা, এবং এরই সুযোগ নিয়ে পশুপালনে কৃত্রিম নির্বাচনও ব্যবহার হয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেই। প্রাণীবিজ্ঞানের ইতিহাসে ফরাসী জীববিদ ব্যুফঁ (১৭০৭-৮৮) মস্ত বড় নাম। কোনও কোনও প্রাণী যে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে ফসিলের সাক্ষ্য থেকে তা তিনি মানলেন, প্রভূত তথ্য সংগ্রহ করলেন যাতে প্রাণীর থেকে প্রাণীর উদ্ভব প্রতীয়মান হয়, তবু শেষ পর্যন্ত ক্রমবিকাশ অস্বীকার করলেন। প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের প্রভাব যে কতখানি প্রবল হতে পারে তা এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে।

এর পরে চার্লস ডারউইনের পিতামহ ইরাস্‌মাস ডারউইন (১৭৩১-১৮০২) ও ফরাসী বিজ্ঞানী লামার্ক (১৭৪৪-১৮২৯) ক্রমবিকাশতত্ত্বের দিকে অনেকটা এগিয়ে এলেন। এই তত্ত্বের গোড়াতে দুটি মৌলিক বস্তু মানতে হয়—প্রজাতির পরিবর্তনে প্রজাতির সৃষ্টি, এবং এই পরিবর্তনের উপযুক্ত পৃথিবীর বয়স। ইরাস্‌মাস এই বয়স ধরলেন কয়েক লক্ষ বছর। লামার্কের নামের সঙ্গে জড়িত যে মতবাদ নিয়ে আজ পর্যন্ত বিতর্কের শেষ নেই তা হল এই যে প্রাণীরা জীবন কালে অভ্যাসের ফলে দৈহিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করে এবং সেগুলি তাদের সন্তানে বর্তায়; কথাটি সত্য না হলেও এর স্পষ্ট নির্দেশ পরিবর্তনের দিকে, এবং এই প্রথম ক্রমবিকাশের এক ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। লামার্কের মতে কোনও বিশেষ অবস্থায় পড়ে প্রাণীর কোনও অঙ্গ বেশী ব্যবহার হবে, কোনও অঙ্গ কম, সন্তান জন্মাবে সেই ব্যতিক্রম অনুসারে,

এমনি করে প্রজাতির চেহারা বদলাবে। (কথাটা একটু বদলে বুফঁ বললেন, অঙ্গের পরিবর্তন আসে ব্যবহারের পথে নয়, আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রত্যক্ষ প্রভাবে।) লামার্কের এও ধারণা ছিল যে যে সব প্রাণীকে আমরা বিলুপ্ত ভাবি তারা আসলে নতুন প্রাণীতে পরিণত হয়েছে।

পৃথিবীর ইতিহাসের সঙ্গে প্রাণের ইতিহাসের যোগ যে অন্তরঙ্গ তার ইঙ্গিত আমরা আগে পেয়েছি, সুতরাং ভূবিজ্ঞান ও প্রাণীবিজ্ঞানের মধ্যে সর্বদা সমন্বয় সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছে, একটা আর একটার চিন্তাধারাকে প্রভাবান্বিত করেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে প্রথম ক্ষেত্রে দেখা দিল বিপ্লববাদ, এবং তারই সূত্র ধরে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রগতিবাদ ; অর্থাৎ এই ধারণার উৎপত্তি যে, পৃথিবীর ইতিহাসে পর পর কয়েকটি বিপ্লব ঘটে গিয়েছে এবং তার ফাঁকে ফাঁকে নতুন করে উন্নত থেকে উন্নততর প্রাণীকুলের সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবীর গায়ে সবচেয়ে নিচের স্তরটি যে সবচেয়ে প্রাচীন এই জরুরী তথ্যটি ঘোষণা করলেন উইলিয়ম স্মিথ (১৭৬৯-১৮৩৯)। জারমেনির ভেরনের বললেন যে আদিম সর্বপ্লাবী মহাসাগর ক্রমশ সরে গিয়ে একের পর এক স্থলস্তর উদ্‌ঘাটন করেছে, সেখানে এক এক শ্রেণীর প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে যেমন বাইবেলে বলেছে সেইরকম (জল সরে কোথায় গেল তা কিন্তু বলা হল না)। বিখ্যাত ফরাসী ফসিল-বিজ্ঞানী ক্যুভিয়ে (১৭৬৯-১৮৩২) জানালেন বাইবেলে যে সৃষ্টির কথা লেখা আছে তার আগে তিনটি বিপ্লব এসে গিয়েছে, সব শেষেরটি নোয়া-র বিখ্যাত মহাপ্লাবন ; ফাঁকে ফাঁকে সৃষ্টি হয়েছে মাছ, সরীসৃপ, স্তন্যপায়ী পশু, মানুষ। বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও ধর্মমতের মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টির চেষ্টা এই সব তত্ত্ব। এর সুযোগ নিয়ে সনাতনপন্থীরা বললেন যে মানুষেরই আদর্শের দিকে সৃষ্টি ক্রমে এগিয়ে এসেছে, তারই জন্য সব আয়োজন (ধর্মযাজকদের যখন জিজ্ঞাসা করা হত মানুষের শত্রু উকুন বা বিছে কেন সৃষ্টি হয়েছে তখন তাঁরা খুব সন্তোষজনক জবাব দিতে পারেন নি)। অধুনালুপ্ত কোনও সরীসৃপের পায়ের ছাপের সঙ্গে মানুষের পায়ের সাদৃশ্য লক্ষ করে কেউ বা তার মধ্যে দেখলে 'আগামী কালের পদচিহ্ন'। এই ধরনের বিপ্লববাদ বা প্রগতিবাদ এখন গ্রাহ্য নয় বটে, কিন্তু ক্রমবিকাশের বর্তমান ধারণায় দুইয়েরই ছাপ আছে ; যথা আজ যে আমরা কয়েকটি ভৌগোলিক বিপ্লবের ইতিহাস জানি তা আগে

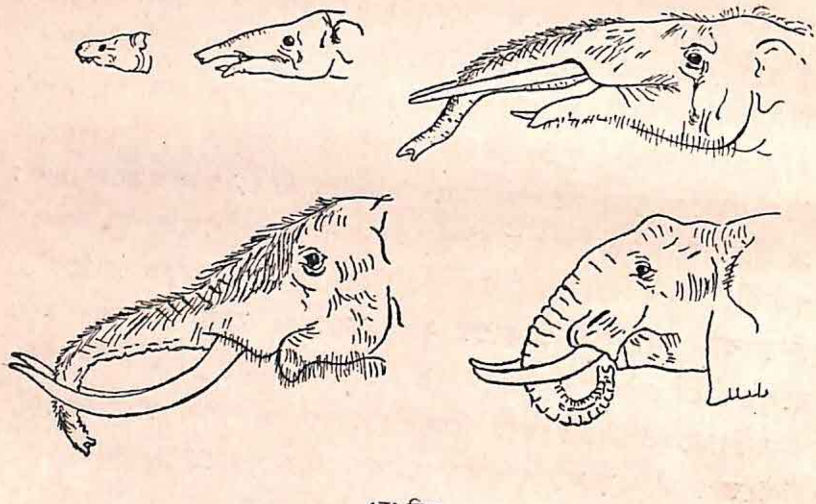
বলেছি, এগুলি প্রাণীকুলের মধ্যে মধ্যে সম্পূর্ণ দাঁড়ি না টানলেও প্রজাতির বিবর্তনে এদের প্রভাব অসামান্য।

এই ধরনের সীমিত ভৌগোলিক বিপ্লবের কথা প্রথমে বলেছিলেন জেম্‌স হাটন (১৭২৬-৯৭)। তিনি প্রচার করলেন যে পৃথিবীর অন্তর্গত তাপের প্রভাবে মাঝে মাঝে তার বহির্ভাগ ঠেলে উঠেছে, আবার নেমে এসেছে ভূমিক্ষয়ের ফলে, কিন্তু এতে প্রাণসূত্রে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটে নি কখনও ; মহাপ্লাবনও আসে নি কোনও দিন। হাটন সময়কে সীমামুক্ত করলেন, বহু দূর অতীতে ছড়িয়ে পড়ল মহাকাল, যেমন দেখা যায় প্রাচ্য দর্শনে। আশ্চর্য নয় যে তাঁকে অধার্মিকতার অভিযোগ দেওয়া হল, যদিও আজ তিনি ঐতিহাসিক ভূবিজ্ঞানের জন্মদাতা বলে মান্য। প্রগতিবাদের বিরুদ্ধ মতবাদটি যে গড়ে উঠেছে—যাতে বলে সবই ঘটেছে প্রাকৃতিক শক্তির ঘাত প্রতিঘাতে, ঐশ্বরিক কিছু ভাববার দরকার নেই—তার মধ্যেও হাটনের ছায়া রয়েছে।

সীমাহীন সময়ের পটে প্রাকৃতিক শক্তির খেলা—সৃষ্টির এই ছবিটি আবার নতুন করে তুলে ধরলেন চার্লস লায়াল (১৭৯৭-১৮৭৫), যার প্রভাবে গড়ে উঠেছিল তরুণ ডারউইনের মন। লায়াল বুঝেছিলেন বটে যে স্থানীয় অবস্থার বিপাকে কোনও প্রাণী ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, কিন্তু প্রাকৃতিক নির্বাচনের সৃষ্টিকারী দিকটা তাঁকেও এড়িয়ে গেল। আবিষ্কারের পরে সত্যকে সহজ মনে হয়, আগে অন্ধকারে হাতড়াতে হয় অনেক দিন ; যে জীবন-সংগ্রামের উপর ডারউইন এতখানি জোর দিয়েছেন তা অষ্টাদশ শতাব্দীতেই জানা ছিল ('বড় খায় ছোটকে, ছোট খায় আরও ছোটকে'), কিন্তু সৃষ্টির আড়ালে উদ্দেশ্যের ধারণা মানুষের মনকে এতখানি জুড়ে বসেছিল যে সংগ্রামের প্রভাব ধরা হয়েছে সামান্য বলে। এমন কি লামার্কবাদকেও বিকৃত করে বিজ্ঞানী, লেখক ও দার্শনিকরা উদ্দেশ্যবাদী বা উদ্যোগবাদী তত্ত্ব অনেক প্রচার করেছেন, আজও করছেন। আর একটি দৃষ্টান্ত—বহু কাল কৃত্রিম নির্বাচন ব্যবহার করেও এ কথাটা ধরা পড়ে নি যে প্রকৃতিও ঐ একই নীতি অনুসারে কাজ করে।

ডারউইনের (১৮০৯-৮২) প্রতিভা এইখানেই প্রতীয়মান। ক্রম-বিকাশের স্বপক্ষে যা জানা ছিল এবং নিজের চোখে যা দেখেছেন দক্ষিণ

আমেরিকায় ভ্রমণ কালে তার থেকে তিনি গড়ে তুললেন এক সুসংবদ্ধ থিওরি, এবং এর ব্যাখ্যা হিসাবে প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রকৃত মূল্য ধরা পড়ল তাঁর চোখে। আর একটি জিনিস ডারউইনকে বিশেষ প্রভাবান্বিত করেছিল, তা হল ম্যালথুস রচিত বিখ্যাত প্রবন্ধ যাতে দেখানো হয়েছে খাদকের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে খাদ্য তাল রাখতে পারে না, সুতরাং প্রতিযোগতা অনিবার্য। ডারউইনের অব্যবহিত আগে আরও জনকয়েক সবটাই দেখেছিলেন অস্পষ্ট, শুধু তাঁর দেশবাসী অ্যালফ্রেড ওআলেস (১৮২৩-১৯১৩) সমান গৌরবের অধিকারী। ১৮৫৮ সালে প্রশান্ত মহাসাগরের এক দ্বীপে জ্বরের ঘোরে হঠাৎ প্রাকৃতিক নির্বাচনের ধারণাটি স্পষ্ট খেলে যায় তাঁর মাথায়, এবং সেই বছরই এঁরা দু জনে একযোগে ক্রমবিকাশবাদ দাখিল করেন এক বৈজ্ঞানিক সমিতির কাছে। পরের বছর প্রকাশিত হল ডারউইনের বই। জীবজগতে পরিবর্তনের রহস্যটি সম্পূর্ণ নতুন রূপে দেখা দিল এবং ফলে প্রগতিবাদের গায়ে দারুণ আঘাত লাগল।



৫নং চিত্র
হাতির ক্রমবিকাশ।

প্রাকৃতিক নির্বাচন ও লামার্কবাদের মধ্যে পার্থক্য বোঝাতে উদাহরণ দিয়ে বলা যায় যে কোনও এক অবস্থায় যদি লম্বা লেজ বেশী কার্যকরী হয়

তা হলে লামার্কের মতানুসারে ব্যবহারের ফলে লেজ বড় হবে এবং তা সন্তানে বর্তাবে; পক্ষান্তরে প্রাকৃতিক নির্বাচন বলে যে যাদের লেজ অপেক্ষাকৃত বড় তারাই জীবন-সংগ্রামে জিতবে এবং ক্রমশ ক্ষুদ্রলাঙ্গুলাধিকারীরা নিশ্চিহ্ন হবে। কিন্তু প্রজাতির অন্তর্গত যে বিভেদের সুযোগ নিয়ে নির্বাচন কাজ করে তার কারণটা তখনও জানা ছিল না, সুতরাং বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে ডারউইনের ধারণাতেও শেষ পর্যন্ত কিছুটা অস্পষ্টতা থেকে গিয়েছে—কখনও বা লামার্কবাদও তিনি ব্যবহার করেছেন প্রাকৃতিক নির্বাচনের পাশাপাশি। "আদর্শের দিকে অগ্রগতি" কথাটা তিনিও লিখেছেন এক জায়গায়।

ডারউইন ভেবেছিলেন বাইরের অবস্থার প্রভাবে দেহের অন্তর্গত বীজকোষের পরিবর্তন হয়, কিন্তু প্রকৃত তত্ত্বটি প্রকাশ করেন অস্ট্রিয়াবাসী এক অখ্যাত সন্ন্যাসী, নাম গ্রেগর মেনডেল (১৮২২-৮৪)। বীজকোষের মধ্যে বিবিধ পৃথক বংশকণার অস্তিত্ব এবং তাদের অদল বদলে দেহবৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন তিনিই আবিষ্কার করলেন, কিন্তু যদিও এই আবিষ্কার প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬৫ সালে (ডারউইনের জীবনকালেই) তথাপি ৩৫ বছর তা অবজ্ঞার অন্ধকারে থেকে গেল। ওলন্দাজ বিজ্ঞানী হিউগো দ ভ্রিস (১৮৪৮-১৯৩৫) প্রস্তাব করলেন যে একমাত্র আকস্মিক বৃহৎ পরিবর্তনের পথেই ক্রমবিকাশ কাজ করে, এই ভাবেই হঠাৎ প্রজাতির উদ্ভব হয়েছে, ডারউইনের কল্পনা অনুযায়ী প্রায়-অদৃশ্য পদক্ষেপে নয়; পরে এই ধারণা যদিও ভুল প্রমাণিত হয়েছে তবু বংশকণার আকস্মিক পরিবর্তন বা মিউটেশন আজ অবিসংবাদিত সত্য, এবং ক্রমবিকাশের বর্তমান ধারণা এই দিয়েই সম্পূর্ণ হয়েছে।

প্রাকৃতিক নির্বাচন উপলব্ধি করবার পরে ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে সব প্রশ্ন যে মিটে গিয়েছে তা নয়; যে মানুষ আমাদের প্রধান আলোচ্য তার মন ও চেতনার ঐতিহাসিক বিকাশে এখনও অনেক রহস্য। যথা গানের ক্ষমতা বা সাধারণ সৌন্দর্যবোধ সে কেন লাভ করল আমরা জানি না—কোনও জীবন-সংগ্রামে তা তাকে সাহায্য করেছে তা ভাবতে পারি না। কিন্তু এই সূক্ষ্ম দিকগুলি ছেড়ে দিলে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে প্রাকৃতিক নির্বাচনের উজ্জ্বল আলোয় প্রাণী সৃষ্টির রহস্য প্রায় সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত হল।

তবে বহু শতাব্দীর বদ্ধ ধারণা সহজে মরে নি, নতুন বিশ্বাসের প্রতি চির দিন মানুষের স্বাভাবিক বিদ্বেষ ও সন্দেহ। পৃথিবী জ্যোতির্মণ্ডলের কেন্দ্র নয়, সে যে সূর্যকে পরিক্রমণ করে এটা মানতে যে কারণে কষ্ট হয়েছিল ঠিক সেই কারণেই মানুষকেও পৃথিবীর বিশেষ সৃষ্টি, অন্যান্য প্রাণীদের নিয়মের বাইরে বলে ভাবতে ইচ্ছা করে। সামান্য জীবাণুর থেকে অতিকায় তিমি বা হাতির বিকাশ ঘটেছে প্রাকৃতিক নির্বাচনের পথে তা বরং বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষও যে সেই পথের পথিক হতে পারে তা কল্পনার অতীত। তাও কিনা মানতে হবে যে ঐ নোংরা বানর-কুলে তার জন্ম। ইতর প্রাণীদের নিয়ম মানুষের জন্য হতে পারে না, মানুষের উদ্ভব অলৌকিক বা আকস্মিক এমন কথা বললেন অনেকে। তা ছাড়া বাইবেল বলেছে ঈশ্বর নিজের মূর্তিতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন।

যাঁরা এ ধরনের যুক্তি দিয়েছেন তাঁরা সবাই যে গোঁড়া ধর্মযাজক বা শিক্ষক সমাজের লোক তা নয়, এঁদের মধ্যে অনেক বিজ্ঞানীও ছিলেন—তবে তাঁরা ধর্মবিশ্বাস ও বিজ্ঞানের শিক্ষা আলাদা আলাদা বাক্সে ভরে রাখতে জানতেন। কিন্তু ডারউইনের পক্ষে যে কেউ ছিল না তাও নয়, তাঁর এক বিখ্যাত ভক্ত ছিলেন টি এইচ হাক্সলি (বর্তমান জীববিজ্ঞানী জুলিয়ান ও লেখক অল্ডাসের পিতামহ), নিজেকে তিনি বলতেন 'ডারউইনের বুলডগ'। একদা এক সভায় জনৈক বিশপ উঠে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন বানরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক পিতৃপক্ষের না মাতৃপক্ষের ; এ প্রশ্নের কোনও সোজা জবাব না দিয়ে হাক্সলি বললেন, "এক দিকে এক বেচারা নির্বোধ জন্তু যে নিচু হয়ে চলে আর আমাদের দেখে দাঁত কেলিয়ে আবোল তাবোল বকে, আর অন্য দিকে প্রভূত দক্ষতা ও সম্ভ্রমের অধিকারী মানুষ যে সেই অধিকার ব্যবহার করে সামান্য সত্যান্বেষীদের অপমান ও সর্বনাশ করতে—এ দুইয়ের মধ্যে কার বংশধর হতে চাই তা যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় তো কি যে বলব ঠিক জানি না।" এর চেয়ে আরও কটু অনেক কথার গোলাগুলি চলেছিল দেশজোড়া সেই বাক্‌যুদ্ধে, যার আখ্যা দেওয়া হয়েছিল 'বানর বনাম দেবদূত' বিতর্ক। ১৮৬৪ সালে ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ নেতা ও ভাবী প্রধান মন্ত্রী ডিজ্‌রেলি বললেন, "মানুষ উল্লুক না দেবদূত? আমি অন্তত দেবদূতের দলে।" যদিও প্রধানত ইংলণ্ডেই জমে উঠেছিল এ

বিতর্ক, অন্যান্য দেশও বাদ যায় নি। আমেরিকায় এক শিক্ষক তাঁর ছাত্রদেরকে ডারউইন-তত্ত্ব বুঝিয়েছিলেন বলে তাদের অভিভাবকরা ভীষণ ক্ষেপে তাঁর নামে মামলা করেছিলেন, দুষ্ট লোকেদের মুখে সেই শহর প্রসিদ্ধ হয়ে উঠল বানরপুরী নামে। মাত্র ১৯২৫ সালে এই মামলা উঠেছিল আদালতে।

এত তর্ক এত উত্তেজনার মধ্যে কিন্তু অনেকেই ভুলে গেল যে বানরকে নরের পিতামহ বলা হয় নি, জ্ঞাতির স্থান দেওয়া হয়েছে মাত্র। নর ও বানরের শাখাদুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন, যদিও পূর্বপুরুষ এক। (সম্পর্ক যাই হক, তা যে অত্যন্ত নিকট তা তাদের নামেই প্রতীয়মান।) এখানে বলা যেতে পারে যে প্রাণীদের ক্রমবিকাশের গতি সরল স্তম্ভের মত নয়, বরং বহুশাখাযুক্ত কোনও গাছের সঙ্গে তার তুলনা চলে। প্রধান কাণ্ডের গোড়ার কাছ থেকেই এ গাছের শাখা ছড়িয়ে পড়েছে চার দিকে—তাদের কারও প্রশাখা বেশী, কারও কম, কেউ আকাশের দিকে উঠতে উঠতে পথ হারিয়ে থেমেছে, কেউ মরেছে, কেউ বা আজও বেড়ে চলেছে। এমনি স্তন্যপায়ীদের শাখাটি বেশ বড়, গাছের প্রায় মাথার কাছে তার থেকে এক প্রশাখার উদ্গম হল, তার নাম প্রাইমেট (অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীভুক্ত) এর থেকে আবার যে সব ডাল বেরিয়ে গেল সেখানে আমাদের পরিচিত বিভিন্ন বানর ও বনমানুষের স্থান— আর তাদের জন্মের অনেক পরে প্রধান প্রাইমেট-প্রশাখার একেবারে শেষে মানুষের উৎপত্তি। গাছের এই ডালটিই আজ আকাশের সবচেয়ে কাছাকাছি।

সেই যে এক রকম খেলা আছে যাতে ছকের একেবারে নিচ থেকে ঘুঁটি চলতে শুরু করে উপর দিকে, ডাইনে বাঁয়ে অনেক অন্ধগলিতে গিয়ে পথ হারায়, কেউ বা অন্যকে পিছনে ফেলে উপর দিকে এগিয়ে যায়, কেউ বা অন্ধগলিতেই মারা পড়ে, শেষ পর্যন্ত এক জন হয়তো একেবারে লক্ষ্যে পৌঁছায়—মনে হয় ক্রমবিকাশের খেলা অনেকটা সেই রকম। এমনি করেই কোটি কোটি বছর ধরে প্রকৃতি পরীক্ষা চালিয়েছে, যেখানে বুঝেছে ভুল হয়েছে সেখানে কোনও মায়া না করে তা ত্যাগ করেছে, অন্য দিকে মন দিয়েছে। কোনও কোনও ভাবুক এমন কি বিজ্ঞানীও এর মধ্যে দেখেছেন এক সর্বাঙ্গসুন্দর আদর্শের দিকে অগ্রগতি, অন্যদের চোখে এই খেলা শুধু বস্তু-জগতের অবস্থা বিন্যাসের অনিবার্য ফল মাত্র !

৫। নর ও বানর

যে ডালটির শেষে মানুষ ফলেছে স্বভাবতই তার গোড়ার দিকে পৌঁছাতে যথাসম্ভব চেষ্টা করেছেন পণ্ডিতরা। এই যোগসূত্র অনুধাবন করা সহজ হয় নি, অনেক জায়গায়ই ফাঁক থেকে গিয়েছে, তার কিছু কিছু যুক্তিসম্মত অনুমান দিয়ে ভরে নিতে হয়েছে। ফাঁকের একটা বড় কারণ ফসিলের অভাব, বুদ্ধিমান প্রাণীরা যে সহজে ফসিল রেখে যায় না তা আমরা আগে দেখেছি। এই কারণে যদিও ঘোড়া বা হাতির ক্রমবিকাশ পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে আমাদের জানা আছে, গরিলা শিমপানজি বা ওরাং ওটাঙের ফসিল অত্যন্ত দুর্লভ। আর, ৭০,-৮০,০০০ বছরের বেশী পুরনো আদি মানুষের হাড় যা পাওয়া গিয়েছে তারও সবই হয়তো ধরানো যায় ছোটখাটো একটি মাত্র বাক্সে। আশ্চর্য নয় যে আদি মানুষের অন্বেষণে তার অস্ত্র উপকরণের উপরই আমাদের বেশী নির্ভর; বিগত হাজার পঁচিশেক বছর ছেড়ে দিলে, প্রতিটি নর বা বানরের হাড়ের তুলনায় মানুষের ব্যবহৃত পাথুরে হাতিয়ার পাওয়া গিয়েছে কয়েক লক্ষ।

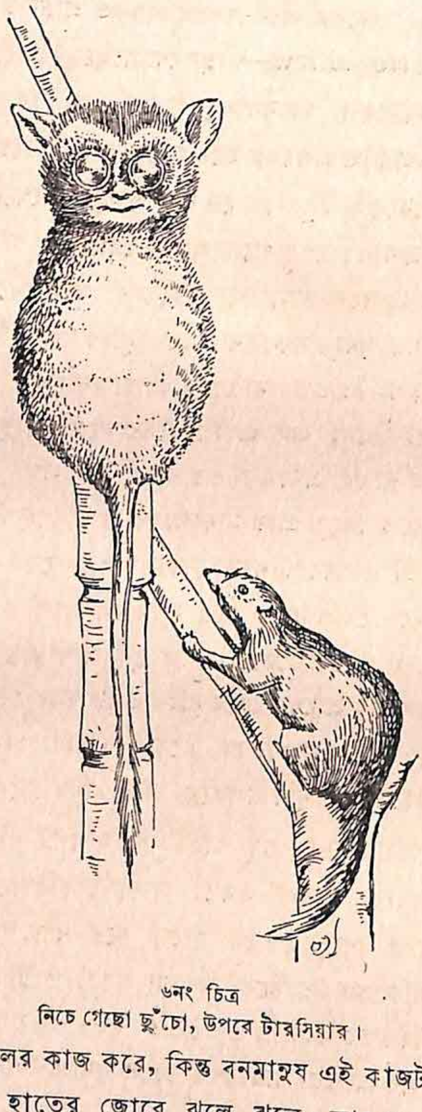
এই যোগসূত্রের ফাঁক বা missing link অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের কথা, কারণ বানরের জন্ম আর ক দিন; গোড়ার থেকে শুরু করতে হলে আরও পিছিয়ে যেতে হয় স্তন্যপায়ীদের প্রথম আবির্ভাবের দিনে, সাত কোটি বছরেরও আগে। স্তন্যপায়ীদের অনেক শ্রেণী, কিন্তু বংশাবলী তৈরির চেষ্টায় তাদের প্রায় সবাইকেই বাদ দিতে হয়েছে, কারণ মানুষের ক্রমবিকাশের প্রথম

দিকে তাদের স্থান দিতে গেলে কোনও না কোনও অসংগতি দেখা যায়, সব কিছু ঠিক খাপ খায় না। এই ধরনের বাধা যার সম্বন্ধে সবচেয়ে কম সে এক অতি ক্ষুদ্র নগণ্য প্রাণী, ইঁদুরের মত দেখতে অনেকটা, গাছে গাছে থাকে, পোকা মাকড় খায়। এদের এক বংশধর এখনও প্রাচ্য জগতে পাওয়া যায়, নাম গেছো ছুচো বা tree-shrew—মানুষ যে প্রাইমেট শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত একেও সেই দলেই ফেলা হয়েছে। এর মগজ খুবই ছোট, সে চার পায়ে ছুটে বেড়ায়, হয়তো সে কালের প্রকাণ্ড জন্তুদের ভয়ে গাছে আশ্রয় নিয়েছে কিংবা কোনও বৃক্ষচর সরীসৃপের থেকেই উদ্ভূত। সে যাই হক, এই গেছো জীবন থেকেই যে পরবর্তী কালে ক্রমবিকাশের পথে অনেক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এল তাতে সন্দেহ নেই—যেমন ডালকে ভাল করে ধরতে বা ডাল থেকে ডালে লাফাতে গিয়ে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অবাধ সঞ্চালন শক্তি, দৃষ্টির প্রাখর্য ও দূরত্ব অনুমানের ক্ষমতা ইত্যাদি বাড়ল, উন্নততর মস্তিষ্কের প্রয়োজন হল। এই কীটভুক্‌দের থেকে ক্রমে লেমুরের উদ্ভব, এই প্রাইমেটদের সঙ্গেও মানুষের বিশেষ কিছু সাদৃশ্য নেই, তখনও নাকই প্রধান ইন্দ্রিয় বলে মুখ লম্বা অনেকটা কুকুরের মত। বর্তমান জগতে লেমুর প্রায় মাদাগাসকার দ্বীপেই সীমাবদ্ধ।

লেমুরের পরবর্তী বংশধরের নাম টারসিয়ার, একে এখন পাওয়া যায় মালয় ফিলিপিন ইন্দোনেশিয়ায়। এর মুখমণ্ডল চ্যাপটা হয়ে বানরের ধাত এসে গিয়েছে, নাক বসে গিয়েছে, চোখ দুটি মাথার দু পাশ থেকে সরে সামনে এসেছে। অর্থাৎ ঘ্রাণের চেয়ে দৃষ্টির উপর তার বেশী নির্ভর। চোখ পাশাপাশি থাকাতে দৃষ্টিতে গভীরতা এসেছে (stereoscopic vision), অর্থাৎ কোন্‌টা আগে কোন্‌টা পিছনে তার বিচার সে করতে পারে, যা এক চোখে আমরা পারি না। শুধু তাই নয়, মাথাটি প্রায় সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে পিছন দিকে তাকাবার আশ্চর্য ক্ষমতা আছে টারসিয়ারের। হাত আর আঙুলের কুশলতাও বেড়েছে—সে হাতে ধরে খায়, হাত দিয়ে পরীক্ষা করে। এ সবই মস্তিষ্কের উন্নতিকে সাহায্য করে, তার ফলে আবার দৃষ্টি ও স্পর্শেন্দ্রিয়ের অধিকতর উন্নতির পথ তৈরি হয়। (ঘ্রাণের তুলনায় দৃষ্টি যাদের প্রখর সেই সব প্রাণীরা সাধারণত রাত্রে ঘুমায়, দিনে জাগে, মানুষের পূর্বপুরুষেরাও এই রাস্তায় এগিয়েছে।)

এর পরের ধাপ বানর। সব কিছু নেড়ে চেড়ে পরীক্ষা করবার এদের

যে অদম্য কৌতূহল তা উন্নততর হস্তকুশলতা ও মস্তিষ্কেরই পরিচায়ক। বানর থেকে উদ্ভব আমাদের নিকটতম জ্ঞাতির, যাদের উপযুক্ত বাংলা নাম বনমানুষ। বানর ডাল থেকে ডালে লাফ দেয় দেহ কাত করে, লম্বা লেজ



৬নং চিত্র
নিচে গেছো ছুঁচো, উপরে টারসিয়ার।

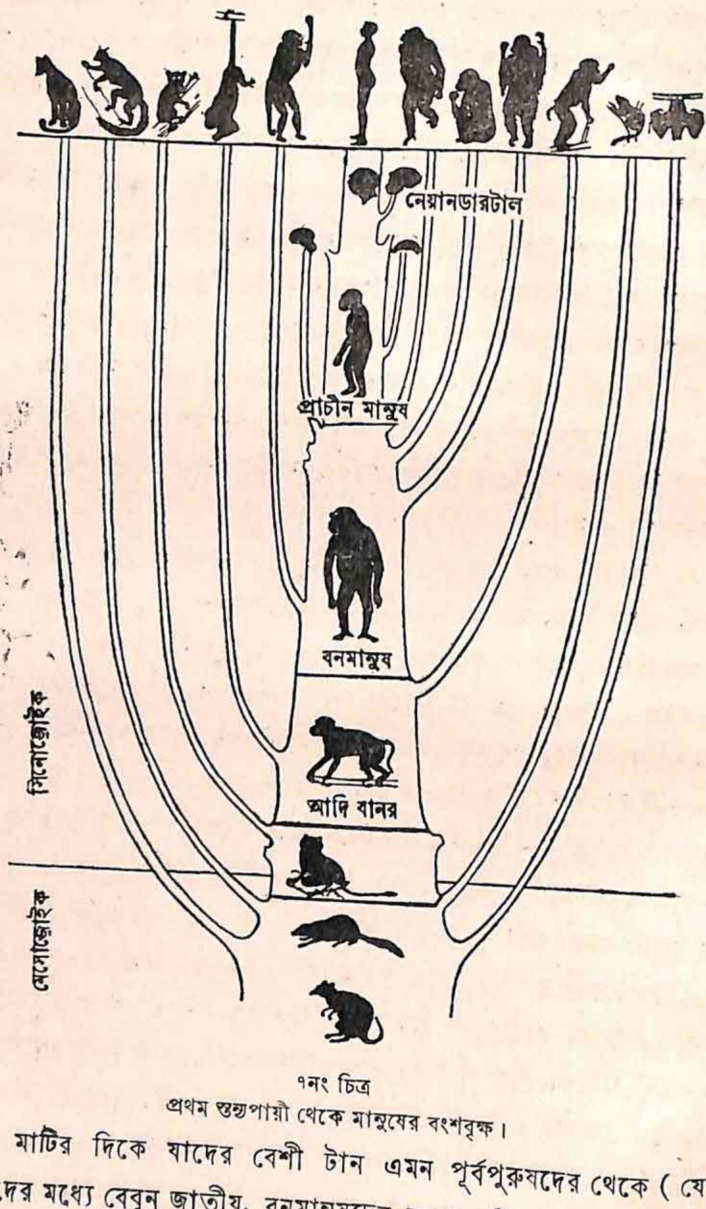
তখন অনেকটা হালের কাজ করে, কিন্তু বনমানুষ এই কাজটা সারে শরীরটা সোজা রেখে শুধু হাতের জোরে ঝুলে ঝুলে ; তার ফলে মাটিতে নেমেও প্রায় সোজা হয়ে দাঁড়াতে শিখল সে, অনাবশ্যক লেজটা খসে পড়ল, বুকের

ছাতি বাড়ল, হাত দিয়ে ধরবার ক্ষমতা এবং চোখ ও হাতের মধ্যে সহযোগিতা আরও উন্নত হল।

বনমানুষের এখন চার জাতি : গরিলা, শিমপানজি, ওরাং ওটাং ও গিবন। এর মধ্যে কে আমাদের সবচেয়ে নিকট আত্মীয়? বুদ্ধিতে গরিলা সবচেয়ে বড়, পক্ষান্তরে শিমপানজি আমাদেরই মত আমোদপ্রিয় ও 'সামাজিক'। পণ্ডিতরা বলেছেন যে গরিলা ও শিমপানজি যত না কাছাকাছি ওরাং ওটাং ও গিবনের, তার চেয়ে বেশী কাছাকাছি মানুষের; কিন্তু এমন মতও প্রকাশ করা হয়েছে যে সব মিলিয়ে মানুষের সঙ্গে সাদৃশ্য সবচেয়ে বেশী গিবনের। এরই বাংলা নাম যে উল্লুক তা জানলে অনেকে হয়তো এ মত সাধারণ ভাবে মানতে চাইবেন না, ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে সাদৃশ্য মানলেও। আসলে গিবন দু পায়ে হাটলেও মাটিতে সে নামে কদাচিৎ; কারও কারও মতে তার স্থান বনমানুষ ও এক শ্রেণীর বানরের মধ্যবর্তী। ওরাং গাছেই থাকে, গরিলা মাটির 'মানুষ', আর শিমপানজির স্বভাবটা মাঝামাঝি।

সে যাই হক, অধুনালুপ্ত বনমানুষের থেকেই যে মানুষের উদ্ভব তাতে সন্দেহ নেই, যদিও সেটা ঠিক কি ভাবে ঘটল তা নিয়ে পণ্ডিত মহলে আজও তর্ক চলেছে। অনেকে বলেন এর গোড়ায় আছে কোনও প্রাকৃতিক পরিবর্তন। আগে যে প্লাইস্টোসিন অধিযুগের কথা বলেছি নামান্তরে তাকে মহা তুষার যুগও বলা হয়, কারণ ঐ সময়ের মধ্যে (প্রায় দশ লক্ষ বছর) উত্তর দিক থেকে শীতের ছোট বড় আক্রমণ বার কয়েক পৃথিবীর হাড় কাঁপিয়ে দিয়েছে। এ যুগ আরম্ভ হওয়ার প্রায় দু কোটি বছর আগেই মায়োসিন অধিযুগের শেষাশেষি আবহাওয়া শুষ্ক ও শীতল হতে আরম্ভ করেছিল, বন বনানী ক্রমশ সরে যাচ্ছিল দক্ষিণে, সেই সঙ্গে যে যে অঞ্চলে বনমানুষদের বাস ছিল সেখানে তাদেরও হটতে হচ্ছিল। কিন্তু হিমালয় তখনও মাথা তুলছে, বাধা পড়ল অভিযানে। প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে শুরু হল নির্বাচনী পরীক্ষা, অবশেষে জয় হল যোগ্যতমের, অর্থাৎ গাছপালা ত্যাগ করে যে খোলা জায়গায় টিকতে পারে তার—বন বাদ দিয়ে বনমানুষ হল মানুষ। মানুষের সৃষ্টি হল মধ্য এশিয়ায়, হিমালয়ের উত্তরে—কিন্তু অন্যান্য আবাসস্থলে যেখানে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় নি সেখানে বনমানুষ

বনেই রইল, 'মানুষ' আর হল না কোনও দিন। অনেকে অবশ্য এই অনুমান মানেন না, মনে করেন মানুষের উদ্ভব হয়েছে আরও ধীরে, গাছের



৭নং চিত্র
প্রথম স্তন্যপায়ী থেকে মানুষের বংশবৃক্ষ।

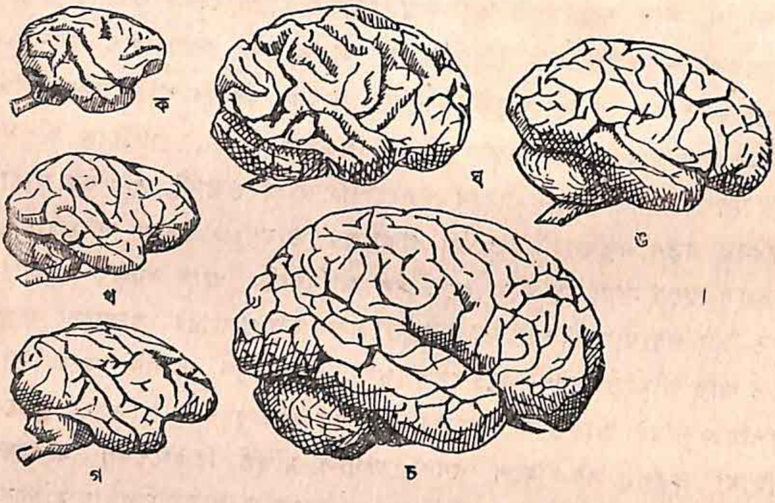
থেকে মাটির দিকে যাদের বেশী টান এমন পূর্বপুরুষদের থেকে (যেমন বানরদের মধ্যে বেবুন জাতীয়, বনমানুষদের মধ্যে গরিলা জাতীয়)। এই

ধারণা অনুসারে মানুষের জন্মস্থান আফ্রিকা কি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াও হতে পারে। কিন্তু এ প্রশ্ন আপাতত স্থগিত থাক, আদি মানব ও তাদের নিকটাত্মীয় অন্যান্য প্রাণীর আলোচনা শেষ করে এ প্রসঙ্গে আরও দু কথা বলা সম্ভব হবে।

আপাতত দেখা দরকার গাছ ছেড়ে মাটিতে নেমে আসবার ফলে প্রগতির পথে কি কি সুবিধা হল। ডাল ধরতে না হওয়ায় দুটি হাতই খালি হয়ে গেল, তাতে সম্ভব হল আক্রমণ বা আত্মরক্ষার অস্ত্র (পাথর বা লাঠি) বয়ে বেড়ানো, পরে সম্ভব হল সে অস্ত্র নিজের হাতে তৈরি করা। গাছের আশ্রয় ছেড়ে খোলা জমিতে বিপদের আশঙ্কা ও আত্মরক্ষার প্রয়োজন বেশী—দরকার হল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও রঙের পার্থক্য ধরবার শক্তি, বিচারবুদ্ধি, সদাজাগ্রত চেতনা, দ্রুত চিন্তার ক্ষমতা, শিকারে দক্ষতা, গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন। এর ফলে ভাবের আদান প্রদান ও সহযোগিতা অবশ্যম্ভাবী, তার জন্য আবার দরকার নতুন নতুন বুদ্ধি ও তা প্রকাশের ভাষা। একান্ত ফলমূলাহারী অভ্যাস ছেড়ে মানুষকে ক্রমে হতে হল আমিষাশী, প্রায় সর্বভুক্। আগে দাঁত ছিল প্রধান অস্ত্র, যখন কাটা ছেঁড়া সম্ভব হল পাথরের সাহায্যে তখন দাঁত আর কামড়ের পেশী হয়ে গেল ছোট, ফলে মুখ চ্যাপটা হয়ে তার পাশবিক ভাবটা আরও কমে গেল। এ সব সংস্কার আবার একে অন্যকে সাহায্য করল, সব মিলে রসদ যোগাল মস্তিষ্ক বিকাশের। মস্তিষ্কের অভিব্যক্তিতে বানরের তুলনায় বনমানুষের এবং বনমানুষের তুলনায় মানুষের পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্ট। প্রগতির পথে এই যে কেন্দ্রিক ও প্রধান উন্নতি তার জন্য দরকার হল প্রলম্বিত শৈশব কাল, অর্থাৎ যে সময়ে শিখবার ক্ষমতা সবচেয়ে বেশী। শৈশব বাড়ল, তার ফলে মায়ের সঙ্গে শিশুর বেশী দিন কাটে—তার থেকে পারিবারিক বন্ধন, ঘর বাঁধবার আকাঙ্ক্ষা, স্ত্রী পুরুষের কাজ ভাগাভাগি ইত্যাদি যা যা বিশেষত্ব বর্তমান মানুষ-সমাজের তার অনেক কিছুর ক্ষীণ সূচনা।

ক্রমবিকাশের ইতিহাসে প্রকৃতির যুগান্তকারী নতুন উদ্ভাবন এর আগে আমরা দেখেছি মেরুদণ্ডের সৃষ্টিতে, উষ্ণ রক্তের ব্যবস্থায়—এই পর্যায়ে সবচেয়ে বড় বিপ্লবের শুরু মস্তিষ্কের বহুমুখী উন্নতি দিয়ে। মগজের ওজন বা মোট পরিমাণ তো বাড়লই, কিন্তু সেটাই চূড়ান্ত কথা নয়—সে দিক থেকে

মানুষের উপরে আছে তিনটি প্রাণী : তিমির মগজ ৬০০০ গ্র্যাম, হাতির ৫০০০, এমন কি শুশুকের পর্যন্ত ১৮০০, যেখানে মানুষের বড় জোর ১৪০০। কিন্তু দেহের ওজনের অনুপাতে যদি মগজ মাপা যায় তবে মানুষের উৎকর্ষ অনেক বেশী প্রতীয়মান—এমন কি নিকট আত্মীয় গরিলার তুলনায়ও সে প্রায় দশ গুণ শ্রেষ্ঠ। তা ছাড়া মগজের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন কাজ, যে অংশ বিবিধ চিন্তাধারার সমন্বয় করে যার ফলে ভাবের যুক্তিপূর্ণ অনুধাবন সম্ভব, অথবা যার জোরে মাথায় খেলতে পারে বস্তুসম্পর্কহীন নিছক ভাবের



৮নং চিত্র
মস্তিষ্কের ক্রমবিকাশ ; ক, স্পাইডার বানর ; খ, ব্যাবুন ; গ, অ্যাজাইল গিবন ; ঘ, শিমপানজি ; ঙ, ওরাং ওটাং ; চ, আধুনিক মানুষ।

খেলা (যেমন অঙ্কশাস্ত্র), তা মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বর্ধিত। অন্যান্য প্রাণীরা কোটি কেটি বছর ধরে নানা দৈহিক বিশেষত্ব অর্জন করেছে ক্রমবিকাশের পরীক্ষায়, কিন্তু এই বিকাশনী শক্তি মানুষের মধ্যে হঠাৎ দেহ ছেড়ে মনকে আশ্রয় করল। তাই যদিও অবস্থা বিপর্যয়ে ডাইনোসরের অতিকায় দেহ তারই শত্রু হয়ে তাকে ধ্বংসের পথে নিয়ে গেল, বা কচ্ছপের ভারী বর্ম প্রগতির পথে একই জায়গায় বেঁধে রাখল তাকে, মানুষ কিন্তু বিরুদ্ধ অবস্থায়ও টিঁকে থাকল তার নিজস্ব উদ্‌ভাবনের জোরে—প্রকৃতির সাহায্যে নয়, বরং তাকে জয় করে ; নিজের তৈরি অস্ত্র দিয়ে দাঁত আর নখকে সে

অতিক্রম করল, জামা কাপড় বানিয়ে গায়ের লোমের অভাব মোচন করল। জীবন-সংগ্রামে প্রকৃতি বরাবর তাদেরই কৃপা করেছে যারা বিভিন্ন অবস্থা আয়ত্ত করে তার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে। বানর যে শুধু দুই পাশে নয় উপরেও যেতে পারে অর্থাৎ গাছে চড়তে পারে, মানুষ যে একাধারে ফলাহারী ও মাংসাহারী তা এই ক্ষমতারই বিকাশ। আধুনিক যুদ্ধবিজ্ঞানও নতুন করে এই সত্যই প্রমাণিত করেছে—কিছু দিন আগেও ব্রহ্মাস্ত্র ছিল ভারী ট্যাংক ও যুদ্ধ-জাহাজ, কিন্তু আজ তারা হেরে যাচ্ছে দ্রুতগামী আকাশপোত ও রকেটের কাছে। ডাইনোসরের দেহ আর মানুষের বুদ্ধির মধ্যে অনেকটা সেই সম্পর্ক।

মানুষের আলোচনায় বনমানুষকে ছেড়ে আমরা অনেকটা এগিয়ে এসেছি, এ বার কিছুটা পিছিয়ে যাওয়া দরকার। যে বনমানুষদের আমরা জানি তারা আমাদের এত নিকট হলেও সাক্ষাৎ পূর্বপুরুষ যে নয় জীববিজ্ঞানীরা তা বোঝেন এই দেখে যে তারা এবং তাদের আগে বানর এক এক বিষয়ে এত বেশী বিশেষত্ব বা জটিলতা অর্জন করেছে যা আবার মানুষের মধ্যে দেখা যায় না। খুলির কোনও কোনও অংশে, যেমন চোয়ালের হাড়ে, এই বিশেষত্ব লক্ষ করা যায়—এ সব অংশে বরং মানুষে আর বনমানুদের পূর্বপুরুষে বেশী সাদৃশ্য। এদের কথা পরের অধ্যায়ে বলব, আপাতত শুধু বোঝা দরকার যে মানুষের সাক্ষাৎ জন্মদাতা হতে হলে গরিলা ইত্যাদির কিছুটা পিছিয়ে যেতে হয় ক্রমবিকাশের পথে। মানুষ ও আধুনিক বনমানুষ যে এক আদি শাখার ভিন্ন প্রশাখা এই তার প্রমাণ।

নতুন অবস্থায় পড়ে মানুষের পূর্বপুরুষরা যা যা বিসর্জন দিয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল প্রখর ঘ্রাণশক্তি, দেহের লোম, লেজ, পা দিয়ে ধরবার ক্ষমতা ; বানরের হাত পা দুইই আঁকড়ায়। মানুষের হাত অনেকাংশে অপরিবর্তিত আছে। কিন্তু দেহের ভার পায়ের ভিতরের দিকে পড়তে পড়তে পাতাটি ক্রমশ সোজা হয়ে গিয়েছে। এখনও বেশী ক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না আমরা, ঘোড়া যেমন পারে। মানুষের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের অনেক কিছুর জন্য দায়ী তার খাড়া দেহ, যেমন এরই ফলে তার হাতদুটি মুক্ত হল, তখন হাত থেকে সম্ভব হল হাতিয়ার, আর যন্ত্র বিনা সে কোনও দিনই এমনটি হতে পারত না—ক্রমবিকাশের ধারা চলত সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে।

সে যাই হক, মানুষের প্রতিটি হাড়ের তুল্য আর একটি হাড় পাওয়া যাবে বনমানুষের দেহে ; রক্ত সঞ্চালনের প্রক্রিয়া ও মাংসপেশীও তাদের অনুরূপ ; মগজের মাপ কিছুটা আলাদা হলেও দুইই বেশ বড় এবং তাদের একই কুণ্ডলীকৃত গড়ন। বাইরের চেহারায় দেখতে পাই যে মানুষেরই মত বনমানুষও লাঙ্গুল বিসর্জন দিয়েছে, বুড়ো আঙুল অন্যান্য আঙুলের বিপরীত বলে তাদের মধ্যে যোগাযোগ সম্ভব হয়েছে—হাত দিয়ে সে ধরতে পারে ; স্ত্রীদের দুটি মাত্র স্তন, মাসিক ঋতু-বিবর্তন। বনমানুষের তুলনায় মানুষ-দেহের যেটুকু পার্থক্য তা মাত্রাগত মাত্র, তাতে নতুন কোনও গুণের ইঙ্গিত নেই, তা মৌলিক নয় ; যেমন, মগজের যে অংশ চিন্তাধারার সমন্বয় স্থাপন করে তা মানুষের বড়, তার ছেদক দন্ত বা কুকুর-দাঁত ছোট, চিবুক ও বুড়ো আঙুল বড়, পা বেশী সোজা, গায়ের লোম পরিমাণে কম, দৈর্ঘ্যে ছোট।

আকৃতির পরে প্রকৃতিতেও বনমানুষের সঙ্গে আমাদের সাদৃশ্য লক্ষ করতে বনে যাবার দরকার করে না, চিড়িয়াখানাই যথেষ্ট। সেখানে এদের অঙ্গভঙ্গি ও সামাজিক ব্যবহার দেখে আমরা অবাক হই, মুগ্ধ হই খেলা বা সন্তানবাৎসল্য লক্ষ করে। ওরাং মাতা যখন ছেলেকে কোলে বসিয়ে দোল দেয়, মাথায় হাত বুলায়, চুমো খায়, তখন যেমন মানুষ-মায়ের কথাই মনে পড়ে, তেমনি আবার শিমপানজির খাঁচার সামনে হয়তো হঠাৎ কোনও পরিচিত লোকের মুখ ভেসে ওঠে। বনমানুষের সঙ্গে মানুষের সাদৃশ্য বিশেষ ভাবে লক্ষ করা যায় যারা বুদ্ধিতে খাটো বা হাবা তাদের অথবা শিশুদের দেখে—কারণ মানুষের মধ্যে এরা ক্রমবিকাশের পথে কয়েক পা পিছনে।

সদ্যোজাত শিশুকে দেখতে যে এক এক সময়ে প্রায় অমানুষিক মনে হয় এবং বানর-বাচ্চার সঙ্গে তার প্রভেদ যে খুব স্পষ্ট নয় তার কারণ বুঝতে হলে জানা দরকার প্রকৃতির আর একটি আশ্চর্য নিয়ম। এর ফলে প্রতি প্রাণীকে মাতৃগর্ভে তার সম্পূর্ণ ইতিহাসের ভিতর দিয়ে এসে ভূমিষ্ঠ হতে হয়—অতীত এমনই আঁকড়ে আছে সকলকে। মানুষকেও মাত্র ন মাসে সেরে ফেলতে হয় ১০০ বা ২০০ কোটি বৎসরব্যাপী ধীর অভিব্যক্তির পুনরাবৃত্তি ; এ যেন এক প্রকাণ্ড ইতিহাসের বইয়ের সংক্ষিপ্ত সংস্করণটা বারে বারে ঝালিয়ে নেওয়া। সেই আদিম সাগরের জীবাণুর মত একটি কোষ

থেকে আরম্ভ করে মাছ সরীসৃপ বানর সদৃশ আকৃতির ভিতর দিয়ে ভ্রূণ এসে পৌঁছায় শিশুতে, ভূমিষ্ঠ হয়ে সেও হামাগুড়ি দিয়ে স্মরণ করায় চতুষ্পদ পিতামহদের। আশ্চর্য নয় যে তার পা তখনও বানরের মত ভিতর দিকে ভাঁজ করা, তার বুড়ো আঙুল তখনও চঞ্চল কি যেন ধরবার আগ্রহে··· গাছের ডালই বুঝি! আশ্চর্য এই যে ক্রমবিকাশের স্বপক্ষে এমন প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য সত্ত্বেও অনেকে তাতে বিশ্বাস করেন নি। এবং এও সত্য যে এত শক্ত বনিয়াদের উপর যে মতবাদ গড়ে উঠেছে, শুধু একটি বিরুদ্ধ প্রমাণের আবিষ্কারে তা তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়ত। আজও যদি কোনও কয়লার খনিতে কেউ পায় পুরামানবের একটি মাত্র দাঁত তবে ঠিক তাই ঘটবে। কিন্তু শুধু মানুষেরই নয়, আর কোনও প্রাণীরও এমন কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় নি যা ক্রমবিকাশের কাঠামোতে তার স্থান থেকে তাকে বিচ্যুত করতে পারে। সেই চিহ্ন যদি থাকত তবে আজ পর্যন্ত কি তার একটিও উদ্‌ঘাটিত হত না?

দ্বিতীয় খণ্ড

গুহার মানুষ

পুরাপ্রস্তর যুগ

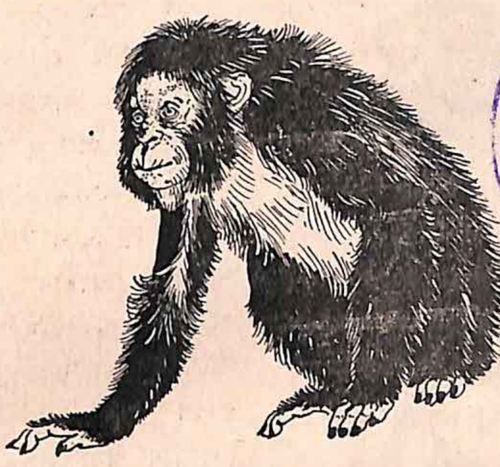
"Once, Man entirely free, alone and wild,
Was blest as free—for he was Nature's child."

Wordsworth

৬। প্রায় মানুষ ও প্রায় বানর

মানুষের মত বনমানুষ আর বনমানুষের মত মানুষ এই দুইয়ের মধ্যে যোগ-সূত্রটি অসম্পূর্ণ হলেও তার কিছুটা অনুধাবন সম্ভব, রহস্যময় কয়েকটি প্রাণীর ফসিল যা পাওয়া গিয়েছে তার সাহায্যে। (সাধারণত এদের নামকরণ হয় গ্রীসীয় বা ল্যাটিন শব্দের থেকে ; গ্রীসীয় ভাষায় পিথেকোস শব্দের অর্থ বনমানুষ, আনথ্রোপোস শব্দের অর্থ মানুষ—এর কোন্‌টি নামের শেষে আছে তা দেখে সাধারণত বোঝা যায় প্রাণীটি বনমানুষ না মানুষ।) অধুনালুপ্ত বনমানুষদের হাড় যা মিলেছে তার অধিকাংশই শুধু মাত্র দাঁত বা চোয়াল, খুলি বা অন্য হাড় খুবই কম। প্রাচীনতমদের মধ্যে প্রথমে উল্লেখযোগ্য প্যারাপিথেকাস, বিড়ালের মত ক্ষুদ্র তার দেহ। তার পরে দেখা দিয়েছিল প্রোপ্লায়োপিথেকাস এশিয়া য়োরোপ আফ্রিকার উষ্ণ বনে বনে, সম্ভবত মানুষ ও আধুনিক বনমানুষদের এক আদি পিতামহ সে ; তার সঙ্গে গিবনের সাদৃশ্য দেখা যায় কিছু, এই জন্তুটির সে জন্ম দিয়ে থাকতে পারে প্লায়ো-পিথেকাসের পথে, যাকে পাওয়া গিয়েছে য়োরোপে। গিবনেরই মত বৃক্ষচর ওরাং হয়তো সিবাপিথেকাসের বংশধর। প্রোকনসাল ছিল শিম্পানজির থেকে ছোট আফ্রিকাবাসী বনমানুষ ; সে যে অল্প সময় সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারত তার প্রমাণ আছে পা আর গোড়ালির হাড়ে ; অনেকের ধারণা প্রোকনসাল শিম্পানজির পূর্বপুরুষ, কিন্তু মানুষের সাক্ষাৎ প্রপিতামহ হওয়ার গুণাবলীও তার আছে। তেমনি মানুষের বংশাবলীতে ড্রায়োপিথেকাসের

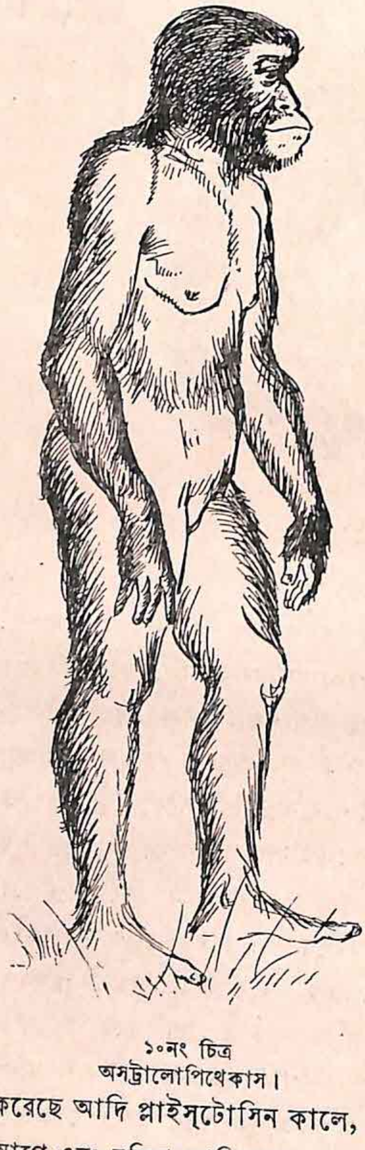
স্থান নিয়েও তর্ক চলছে; ছোটখাটো শিমপানজির মত দেখতে এই প্রাণীটির চোয়াল ও দাঁতের চেহারা হল ঠিক যেমনটি আশা করা যায় মানুষ ও বনমানুষের পূর্বপুরুষের থেকে—এমন কি কোনও কোনও বিষয়ে সে নাকি



৯নং চিত্র
প্রোকনসাল, মানুষের সম্ভাব্য পূর্বপুরুষ।

মানুষেরই বেশী কাছাকাছি। এক মতানুসারে ড্রায়োপিথেকাসের তিন বিভিন্ন প্রজাতির থেকে যথাক্রমে মানুষ, শিমপানজি ও গরিলার উদ্ভব: অসট্রিয়ায় প্রাপ্ত ডারউইনি প্রজাতির থেকে মানুষ, জারমেনির জারমেনিকাস থেকে শিমপানজি, ও ফ্রান্স ও ভারতে প্রাপ্ত পান্‌জাবিকাস থেকে গরিলা। উত্তর ভারতের শিবালিক পর্বতে বিবিধ বানর বনমানুষের চোয়াল পাওয়া গিয়েছে; এদের অন্যতম সিবাপিথেকাসের নাম করেছি উপরে, এই অঞ্চলেই রামাপিথেকাস নামক এক ব্যক্তিকেও কেউ কেউ মানুষের সাক্ষাৎ পূর্বপুরুষের মধ্যে ধরেন (এই নাম দুটি শুনে মনে হয় যেন ভারতীয় শব্দ থেকে নেওয়া হয়েছে)। যাই হক, এই সব প্রাণীদের সঙ্গে আমাদের সঠিক সম্পর্কটা ধরতে না পারলেও এদের ফসিল থেকে অন্তত এটুকু বোঝা যায় যে বৃক্ষচর ভূমিচর প্রাইমেটদের বিভাগটা ঘটেছিল সম্ভবত আড়াই কোটি বছর আগে। মায়োসিন ও প্লায়োসিন কালে য়োরোপ ও এশিয়ার প্রধান পর্বতমালাগুলি যখন প্রথম মাথা তুলছিল তখন জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কি করে এই বিভাগটা ঘটে থাকতে পারে তা একটু আগেই বলেছি। (সম্প্রতি এক ইংরেজ

নৃতত্ত্ববিদ কি এই অভিনব প্রস্তাব পেশ করেছেন যে মানুষের উদ্ভব হয়েছে বৃক্ষচর নয় জলচর বনমানুষের থেকে। আর এক আধুনিক তত্ত্ব অনুসারে আমাদের সাক্ষাৎ পূর্বপুরুষ বনমানুষ নয়, বানর।)



১০নং চিত্র
অসট্রালোপিথেকাস।

এর পরে যে প্রাণীটিকে সবচেয়ে বেশী চোখে পড়ে সে অনেক হাল আমলের বাসিন্দা, তার আগে প্রায় দু কোটি বছর রহস্যের কুয়াশায় ঢাকা, ফসিল বিশেষ কিছু মেলে নি। মানুষের অনেকটা কাছাকাছি এগিয়ে এসেছে সে, নাম অসট্রালোপিথেকাস বা 'দক্ষিণী বনমানুষ', কারণ ধাম দক্ষিণ আফ্রিকা (ল্যাটিন অসট্রালিস=দক্ষিণী)। সব রকমে সে বনমানুষের মত হলেও কোমর ও তার নিচে উরু এবং পায়ের হাড় তার মানুষের মত, অর্থাৎ তার মুখটি বানরের মত ছিল বটে, কিন্তু একেবারে সোজা হয়ে হাটত সে। এ কালের বনমানুষের তুলনায় তার কুকুর-দাঁত মানুষেরই মত অনেকটা ছোট, মগজ গরিলার চেয়ে কিছু বড়। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে মানুষ সৃষ্টির পথে প্রকৃতি আগে গড়েছে খাড়া দেহ, তার পরে সম্পূর্ণ মগজ। এরা বাস করেছে আদি প্লাইসটোসিন কালে, জন্ম নিয়েছে সম্ভবত দশ লক্ষ বছরেরও আগে এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় হয়তো ছ লক্ষ বছর কি আরও অল্প কাল

আগে পর্যন্ত বেঁচে ছিল। গরিলার মেধা গড়ে ৫৫০ সিসি (প্রায় ২০ ফোঁটা জলে এক সিসি), অসট্রালোপিথেকাসের ৬০০ সিসি, আর একালীন মানুষের ১৩৫০ ; নিঃসন্দেহে মানুষ বলে চেনা যায় এমন প্রাণীদের মধ্যে আপাতত প্রথম স্থান অধিকার করে আছে পিথেকান্‌থ্রপাস, তার মেধার সঙ্গেও অসট্রালোপিথেকাসের প্রায় ৪০০ সিসির পার্থক্য ; এর পূরণ অনেকখানি সময়সাপেক্ষ। অধিকাংশ পণ্ডিত তাকে বলেন প্রায়-মানুষ বা হোমিনিড—যারা বরাবর খাড়া হয়ে হাঁটে অথচ অস্ত্র বানাতে পারে না তাদের এই নাম, এইখানে বনমানুষের শাখাটি মানুষের থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছে।

অসট্রালোপিথেকাসের প্রথম খুলি আবিষ্কৃত হয় ১৯২৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার টং (Taung) নামক জায়গায় এক চুনাপাথরের খাদ ভাঙতে ভাঙতে, এবং তার পর আরও ফসিল পাওয়া গিয়েছে আফ্রিকাতেই। তৃতীয়টির আবিষ্কর্তা এক স্কুলের ছেলে ; একদা এক টিলার উপর দিয়ে যেতে যেতে সে দেখে মাটির নিচ থেকে উঁকি দিচ্ছে এক খুলি। জিনিসটির মূল্য অবশ্য সে জানত না, তবু কি মনে করে দাঁতগুলি ঠুকে ঠুকে আলগা করে পকেটে ভরে নিয়ে এল। ভাগ্যক্রমে খুলিটি শেষ পর্যন্ত ক্রুম নামক এক বিশেষজ্ঞের হাতে পৌঁছাল ; ছেলেটির সাহায্যে তিনি আরও খণ্ড উদ্ধার করলেন। এই খুলিগুলি সব ঠিক এক মানুষের না বলে বরং বলা উচিত এক গোত্রীয় মানুষের, এই গোত্রটির নাম দেওয়া হয়েছে অসট্রালো-পিথেসিনি, এবং ডকটর ক্রুম তৃতীয় ব্যক্তিটির আখ্যা দিয়েছেন প্যারানথ্রপাস, অর্থাৎ আমাদের খুব 'নিকট জন'।

কি ছিল এই আধা-মানুষদের চেহারা ও জীবনযাত্রা ? নৃতত্ত্ববিদদের অনুমান অনেকটা এই রকম : লোমশ দেহ, সরু কপাল, কপালের নিচের হাড় সামনে এত এগিয়ে এসেছে যে চক্ষু কোটরগত—সবসুদ্ধ সুপুরুষ তাকে মোটেই বলা যায় না। বন্য পূর্বপুরুষদের জংলী আস্তানা থেকে অনেক দূরে পাহাড়ের গায়ে গুহা গহ্বরে তার বাস, খাদ্য বিষয়ে রুচি প্রায় আমাদেরই মত, অর্থাৎ আমিষ নিরামিষ দুইই চলে, কখনও ফল মূল কখনও খরগোশ কি ঐ ধরনের ছোট জন্তু ধরে সে খায়। সম্ভবত দল বেঁধে হরিণ শিকারেও বার হত তারা গাছের ডাল ভেঙে নিয়ে, কিন্তু কোনও রকম

অস্ত্র বানিয়ে নিতে জানত না বোধ হয়। অসট্রালোপিথেকাসের ফসিলের সঙ্গে ব্যাবুনের খুলি অনেক পাওয়া গিয়েছে এবং সেগুলিকে দেখে মনে হয় যেন উপর থেকে ঘা মেরে ফাটানো হয়েছে; আততায়ী হয়তো অসট্রালোপিথেকাস, এবং হয়তো ব্যাবুনেরই হাড় সে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছে এমন কথা বলা হয়েছে। কখনও কখনও নিজেদের মাথাও তারা ফাটিয়েছে মনে হয়, তবে মৃত্যুর আগে না পরে (ঘিলু বার করে খেতে?) তা বলা কঠিন। তা ছাড়া, দক্ষিণ আফ্রিকার কোথাও কোথাও এক রকম ছোট খণ্ডিত নুড়ি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়: মানুষের পূর্ববর্তী কোনও প্রাণীশ্রেণীর কাজ হতে পারে তা (আবার প্রকৃতির কাজও হতে পারে), এর কিছু কিছু পাওয়া গিয়েছে অসট্রালোপিথেকাসের ফসিলের কাছাকাছি। কেউ কেউ, যেমন ওকলি, মনে করেন যে সে অস্ত্র বানাতে জানত, এবং সুতরাং সম্পূর্ণ মানুষ নামেরই অধিকারী। দক্ষিণ আফ্রিকার বিশেষজ্ঞ ব্রুম ও ডার্ট এমন কি এও বিশ্বাস করেন সে কথা বলত ও আগুন ব্যবহার করত।

ডকটর নেপিয়ার বলেন অসট্রালোপিথেকাস ও প্যারানথ্রপাস অসট্রালোপিথেসিনি গোত্রের দুই ভাগ বা গণ; প্রথমটি ওজনে হালকা, দ্রুতগামী, মাংসভুক্, দ্বিতীয়টি ভারী দেহ নিয়ে শিমপানজির মত পা টেনে টেনে চলত এবং প্রধানত নিরামিষ আহার করত; এদের হাত এত মোটা যে তা দিয়ে হাতিয়ার তৈরি সম্ভব ছিল না।

সম্প্রতি ইংরেজ নৃতত্ত্ববিদ ডকটর লীকি অসট্রালোপিথেকাস দলের আর এক ব্যক্তির খোঁজ পেয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার বাইরে যাকে প্রাচীনতম যন্ত্রশিল্পী বলে দাবি করা হয়েছে। পূর্ব আফ্রিকার সাবেক নাম জ্রিন্জ, তার থেকে এর পোশাকী নাম জ্রিন্জানথ্রপাস, আর প্রকাণ্ড দাঁতের থেকে ডাকনাম দাঁড়িয়েছে 'বাদামভাঙা মানুষ'। ১৯৫৯ সালের ১৭ই জুলাই তারিখে টাঙানীকার ওলুডুভাই নামক জায়গায় লীকির স্ত্রী প্রায় সম্পূর্ণ একটি খুলি দেখতে পান, তার মালিক ১৬-১৮ বছরের এক বালক, প্রাথমিক অনুমান অনুসারে ছ লক্ষ বছর আগে প্লাইস্টোসিনের গোড়ার দিকে নাকি তার বাস ছিল এ জগতে। কাছাকাছি পাওয়া গিয়েছে হাতে তৈরি হাতিয়ার আর নানা প্রাণীর হাড়—পাখি, উভচর, সাপ ও সরীসৃপ, ইঁদুর শ্রেণীর জন্তু, হরিণ ও অধুনালুপ্ত দুই রকম শুয়োর; সুতরাং বাদামভাঙা

মানুষকে প্রায় সর্বভুক্ বলা চলে, শুধু বাদামে তার আশ মিটত না মোটেই। লীকি বলেন এখানে এক দল জ্রিন্জানথ্রপাসের বাস ছিল, তারা অস্ত্র বানিয়েছে আর ঐ সব জন্তুদের শিকার করে খেয়েছে।

লীকি অত্যন্ত উদ্যোগী পুরুষ; পুরনো ঘাঁটিতে তিনি ইতিমধ্যে আর একটি খুলির অংশ আবিষ্কার করেছেন, এবং কাছাকাছি অন্য এক জায়গায় পেয়েছেন আরও হাড়—কিছু জ্রিন্জানথ্রপাসের, কিছু অন্যান্য জানোয়ারের যার কোনও কোনওটা হয়তো ইতিপূর্বে জানা ছিল না; কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য এক খণ্ড হাড় যার এক মাথা ঘষার ফলে মসৃণ হয়ে গিয়েছে, লীকি বলেন চামড়ার বস্তু তৈরিতে ব্যবহৃত এ এক যন্ত্র! তা যদি সত্যি হয় তবে এই সাধারণ ধারণাটি বাতিল করে দিতে হবে যে মানুষ হাড়ের হাতিয়ার বানিয়েছে বহু লক্ষ বছর পরে। ১৯৬১ সালের ফেব্রুআরিতে লীকি আবার 'আদিতম মানুষ' আবিষ্কারের এক দাবি জানিয়েছেন; ১২ বছরের এক বালিকার ও এক বয়স্ক ব্যক্তির হাড় তিনি পেয়েছেন ঐ ওলডুভাই অঞ্চলেই, এরা নাকি জ্রিন্জানথ্রপাসের চেয়েও অনেক প্রাচীন। তিনি বলেন বালিকাটিকে খুন করা হয়েছিল এবং তার হাড়ের আকৃতি বেশ বড়, তা দেখে মনে হয় তার জাত জ্রিন্জানথ্রপাসের থেকে বিভিন্ন।*

* ১৯৬১ সালে ক্যালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এভার্নডেন ও কার্টিস দাবি করেছেন যে জ্রিন্জানথ্রপাস আরও অনেক প্রাচীন কালের লোক; পটাসিয়াম-আরগন পদ্ধতি ব্যবহার করে এঁরা এর বয়স পেয়েছেন ১৬-১৯ লক্ষ বছর, গড়ে ১৭·৯ লক্ষ বছর। তাতে প্লাইস্টোসিনের শুরু ১০ লক্ষ থেকে অন্তত ২০ লক্ষ বছর আগে পর্যন্ত পিছিয়ে দিতে হয়—মানুষের ক্রমবিকাশকে জায়গা দিতে এই বাড়তি সময়টুকু পেলে অনেক নৃতত্ত্ববিদ খুশীই হবেন। কিন্তু হাইডেলবেগ থেকে গেন্টনের ও লিপ্‌পোল্ট উক্ত বয়স সম্বন্ধে আপত্তি জানিয়েছেন, তাঁদের গবেষণা অনুসারে জ্রিন্জানথ্রপাস আরও আধুনিক। এ সম্বন্ধে অনতিবিলম্বে আরও নতুন খবর আশা করা যেতে পারে। আবিষ্কর্তা লীকি ঐ মার্কিন বিজ্ঞানীদেরই সমর্থন করেছেন। তাঁর মতে প্লাইস্টোসিনের আরম্ভ ২৫ লক্ষ বছর আগে এবং মানুষের শাখাটি আলাদা হয়ে গিয়েছে পূর্ববর্তী প্লায়োসিন অধিযুগে।

অসট্রালোপিথেকাসের পরে যাদের দেখি তাদের নিঃসন্দেহে মানুষ আখ্যাই দেওয়া হয়ে থাকে, কম পক্ষে পাঁচ লক্ষ আর বেশী হলে দশ লক্ষ বছর আগে তাদের আবির্ভাব। মানুষ বলতে এখানে অবশ্য আজকের মানুষ নয়—আয়তনে প্রায় সমান হয়ে উঠলেও মস্তিষ্কে তারা অনেক খাটো। এ যাবৎ যাদের কথা বলা হয়েছে তারা যদি হয় মানুষরূপী বনমানুষ (man-like ape) তো এ বার যারা এল তারা বনমানুষরূপী মানুষ (ape-man)। বস্তুত এদের মধ্যে প্রাচীনতম এক জনের নাম দেওয়া হয়েছে ঠিক ঐ অর্থটির তর্জমা করে—পিথেকানথ্রপাস।

এখানে প্রাণীজগতে বৈজ্ঞানিক নামকরণ ও নামের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে দু কথা বলে নেওয়া দরকার। জীবজগতে জীবাণুর থেকে আরম্ভ করে উদ্ভিদ ও পশু কুলের প্রত্যেক প্রাণীর সম্পূর্ণ নামে দুটি করে অংশ, প্রথমটি নির্দেশ করে গণ (genus), দ্বিতীয়টি প্রজাতি (species)। প্রজাতি বোঝায় একটি মাত্র বিশেষ প্রাণীকে, গণ আরও ব্যাপক ও সাধারণ, একাধিক সম্পর্কিত প্রজাতির গোষ্ঠী। যেমন বেড়াল ও সিংহের, অথবা কুকুর ও নেকড়ের এক গণ কিন্তু ভিন্ন প্রজাতি। গণের আগে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর আরও কয়েকটি ধাপ আছে, যেমন প্রজাতির মধ্যে আছে সংকীর্ণতর উপপ্রজাতি (sub-species), জাতি (race) বা প্রকার (variety)। বর্তমান মানুষ অনেক জাতিতে বিভক্ত, কিন্তু তারা সবাই একটি প্রজাতির অন্তর্গত—এই মানুষের সম্পূর্ণ নাম হোমো সেপিয়েন্স (homo sapiens); হোমো = মানুষ, সেপিয়েন্স = যে ভাবতে জানে: এক কথায় বুদ্ধিমান মানুষ (নামটি দিয়েছিলেন সুইডেনের বিখ্যাত প্রাণীবিজ্ঞানী ফন লিনে)। এই ধরনের নামকরণের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক নামেরও সাদৃশ্য আছে, যেমন নিবারণ চক্রবর্তীর প্রথম নামটি বিশেষ, দ্বিতীয়টি বংশগত; অবশ্য বৈজ্ঞানিক আখ্যাতে সাধারণ নামটি আগে বসে।

আজ সব মানুষের নাম এক হলেও এর আগে তার ভিন্ন প্রজাতি দেখা দিয়েছে, যেমন ভবিষ্যতেও আজকের কোনও জাতি নতুন প্রজাতিতে পরিণত হতে পারে। পুরামানব সম্বন্ধে এ যাবৎ নৃতত্ত্ববিদদের যেন ঝোক ছিল

নতুন কোনও ফসিল পাওয়া গেলেই তাকে একটি নতুন মানুষের নাম দেওয়া ; কিন্তু সম্প্রতি অনেকে চাচ্ছেন হোমো সেপিয়েন্‌সের আগে শুধু আর একটি প্রজাতি খাড়া করে তার মধ্যে পিথেকানথ্রপাস ও তার কাছাকাছি মানুষ সিনানথ্রপাসকে ফেলতে। এই প্রজাতির নাম দেওয়া হয়েছে হোমো ইরেক্‌টাস (homo erectus)—যে মানুষ খাড়া হয়ে দাঁড়ায়। আবার এক দল তিনটি উপগণে মানুষকে ভাগ করেন—প্রথমটিতে পিথেকানথ্রপাস ও সিনানথ্রপাসের স্থান, তৃতীয়টিতে আধুনিক মানুষের, মাঝখানে নেয়ানডারটাল মানব যার কথা বলব পরের অধ্যায়ে। আসলে পুরা-মানবের বৈজ্ঞানিক ভাগ বিভাগ সম্বন্ধে প্রায় প্রত্যেক পণ্ডিতেরই আলাদা মত আছে।

পিথেকানথ্রপাসকে প্রথমে যবদ্বীপে পাওয়া গিয়েছিল, সেই কারণে সে জাভা মানুষ নামেই সাধারণের কাছে বেশী পরিচিত। পাঁচ লক্ষ থেকে দু লক্ষ বছর আগে পর্যন্ত সে বেঁচে ছিল। এর পরেই চীনে প্রাপ্ত সিনানথ্রপাস বা চীন মানবকে (ল্যাটিন সিনেন্‌সিস = চৈনিক) চেনা দরকার। আফ্রিকার মানুষরূপী বনমানুষদের পরেই একেবারে এশিয়ার পূর্ব প্রান্তে বনমানুষী মানুষের আবির্ভাব খুবই আশ্চর্যজনক। এমন হতে পারে যে মানুষের সেই প্রত্যুষ কালে এক বিরাট অভিযান মহাদেশ অতিক্রম করে চলে এসেছিল। আবার এও সম্ভব যে এই অঞ্চলেই এদের জন্মদাতাকে পাওয়া যাবে এক দিন।

পুরাতত্ত্ব আজ নানা ক্ষেত্রে অ-বিশেষজ্ঞের আবিষ্কারে সমৃদ্ধ, ১৮৯১ সালে জাভা মানুষের আবিষ্কারও এই গোত্রের। দুবোআ নামে এক তরুণ ওলন্দাজ চিকিৎসকের মাথায় কি করে ছাত্রাবস্থায়ই এই ধারণা ঢুকেছিল যে সম্ভবত আদি মানবের ফসিল পাওয়া যাবে ইন্দোনেশিয়া অঞ্চলে। এই উদ্যোগে সরকারী সাহায্য পেতে অসমর্থ হয়ে অবশেষে চাকরি ত্যাগ করে সেনাদলে যোগ দিয়ে তিনি চলে এলেন সে দেশে। অবসর সময়টা ফসিলের খোঁজে কাটিয়ে কয়েক বছর পরে শেষে সত্যিই তিনি পেলেন এই প্রায় প্রাচীনতম মানুষের খুলি, দাঁত আর উরুর হাড়—যবদ্বীপের ত্রিনিল নামে এক ক্ষুদ্র গ্রামে। তার পর ঐ দ্বীপেই আরও কিছু হাড় পাওয়া গিয়েছে

এই জাতের মানুষের—একটি চোয়াল, কিছু খুলির খণ্ড, এক শিশুর খুলি; এর অনেকগুলি ডুবোআই আবিষ্কার করেছেন ১৮৯৭ সাল পর্যন্ত। অনেক বছর পরে, ১৯৩৭ সালে, মধ্য জাভায় আরও কয়েকটি মানুষের দেহাবশেষ পাওয়া গিয়েছে। পিথেকানথ্রপাসের সব চিহ্নই মধ্য প্লাইস্‌টোসিন কালের (সাড়ে পাঁচ থেকে দু লক্ষ বছর আগে)। এদেরও খুলিতে বন-মানুষের ছাপ, উরু প্রায় মানুষেরই মত সোজা।

সামান্য কয়েক টুকরো হাড়ের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ অজানা প্রাণীর আকৃতি ও প্রকৃতি গড়ে তুলবার যে বিজ্ঞান পণ্ডিতরা আজ আয়ত্ত করেছেন তার চাতুর্য ও দক্ষতা রহস্য-রোমাঞ্চ সিরিজের বড় বড় গোয়েন্দাদেরও হার মানায়। এর মধ্যে অনেকটা অবশ্য অনুমান, কিন্তু সে অনুমান যুক্তিপূর্ণ, এবং অঙ্গশাস্ত্রে যুক্তির উপর নির্ভর খুব বেশী। এর ফলে হয়তো শুধু খুলি পরীক্ষা করে বলা চলে মেরুদণ্ডের উপর মাথাটা কি ভাবে বসানো ছিল, অর্থাৎ প্রাণীটি চলত সামনে ঝুঁকে না এ যুগের মানুষের মত সোজা হয়ে; পায়ের এক খণ্ড হাড় থেকে বোঝা যায় চলার ধরনটা কেমন ছিল, সামান্য একটি দাঁত বলে দেয় খাদ্য কি ছিল। ভুল যে হয় না তা নয়—কুখ্যাত পিল্‌টডাউন জালিয়াতির কথা একটু পরেই বলব—কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরের আবিষ্কার আশ্চর্য ভাবে সমর্থন করেছে আগের অনুমানকে। এ যেন এক ভাঙা বাড়ির দু এক খণ্ড দেয়াল থেকে সম্পূর্ণ গৃহটির চেহারা আবার গড়ে তোলা (রূপকটি আক্ষরিক ভাবে সত্য, প্রত্নবিদরা প্রায়ই তা করে থাকেন—প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত সার আর্থার এভান্‌স কর্তৃক ক্রীটে সাড়ে তিন হাজার বছরেরও বেশী প্রাচীন রাজপ্রাসাদের পুনর্গঠন)। মানুষের তুলনায় অন্যান্য প্রাগৈতিহাসিক ফসিলের বয়স তো আরও বেশী—কোটি কোটি বছর; এই আশ্চর্য অস্থিবিজ্ঞান গড়ে না উঠলে সেই প্রাণীরা চির দিনই আমাদের 'কল্পনার অতীত' থেকে যেত। অবশ্য বিশেষজ্ঞরা সকলে একবাক্যে ডুবোআর আবিষ্কার মেনে নেন নি—এক দল যখন প্রমাণ করছিলেন কেন এই প্রাণীটি বানর হতে পারে না, আর এক দল দেখাচ্ছিলেন কেন সে মানুষ হতে পারে না।

পিথেকানথ্রপাসের দাঁতের আকৃতি থেকে বোঝা যায় যে তাদের প্রধান ব্যবহার ছিল বাদাম বা অন্যান্য কঠিন ফল ভাঙতে। তার দেহের

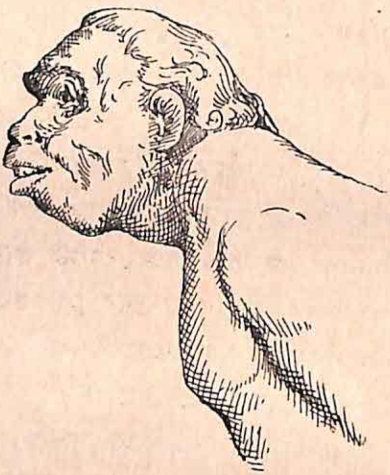
ভঙ্গি ও চলার ধরন বোধ হয় ছিল প্রায় আমাদেরই মত, হাঁটা সম্পূর্ণ খাড়া (সে জন্য এর পুরো নাম পিথেকানথ্রপাস ইরেকটাস), যদিও ঘাড় সামনের দিকে এগিয়ে ছিল কিছুটা। বুদ্ধিতে যে সে একালীন মানুষের খাটো তার প্রমাণ তার মস্তিষ্ক-আধারের মাপ—৮৬০-৯৪০ সিসি ; আজকের জগতে নিকৃষ্ট জাতির মানুষেরও মগজের মাপ ১২০০ সিসি, সুতরাং বলা যেতে পারে যে বুদ্ধিতে জাভা মানব সবচেয়ে উন্নত বনমানুষ (গরিলা) আর বর্তমান জগতের সবচেয়ে অনুন্নত মানুষের (অসট্রেলিয়ার আদিবাসী) মধ্যে অর্ধেক পথ অতিক্রম করেছে। এ দিক থেকে যদি সে হয় আধা-মানুষ, আধুনিক বুদ্ধিমান মানুষদের তুলনায় প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ তার মগজের আয়তন।* 'মাথায় খাটো' তাকে দেহের উচ্চতার থেকেও বলা চলে, যদিও অনুন্নত হলেও দেহ দুর্বল নয় মোটেই, বেশ গাঁট্টাগোট্টা। ঘন জংলী ভুরু, ঢালু কপাল, ছুঁচালো মুখ, ভীষণ মোটা ঘাড়। বানর বা বনমানুষের তুলনায় সামাজিক জীবন সম্ভবত আরও বিকশিত এদের মধ্যে। মগজের যে অংশ উচ্চারণ ক্ষমতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তার বৃদ্ধির থেকে মনে হয় মনের কথা বোঝাবার কিছু একটা ভাষা বোধ হয় এদের ছিল। এখানে ভাষা বলতে বুঝতে হবে অল্প কয়েকটি রুক্ষ মৌলিক শব্দ, যাদের অর্থ কোনও এক বিশেষ সম্প্রদায় মেনে নিয়েছে।

কথিত ভাষার নিশ্চয় এমনি করেই শুরু, এর অনেক পরে এসেছে লিখিত ভাষা ; ভাবতে অবাক লাগে যে যত দিন ধরে মানুষের হাতেখড়ি হয়েছে তার এক শো গুণেরও বেশী কাল সে শুধু কথা বলেছে। প্রথম যখন কথা ফুটল তার মুখে তখন কি সে বলতে চেয়েছে কে জানে! নিতান্ত অকুলান সেই প্রাথমিক ভাষার মত তার বক্তব্যও তখন ছিল রুক্ষ ও সীমাবদ্ধ —আহার, প্রজনন, শিকার, শত্রু বা প্রাকৃতিক বিপর্যয় সম্বন্ধে আবেগ উদ্বেগ। কিন্তু অন্যতর উচ্চতর কোনও ভাবনার ছায়া তাদের মনে কখনও পড়ে নি এমন কথা কে বলতে পারে জোর করে? আগ্নেয় গিরির দেশ

* এখানে বলা দরকার যে পিথেকানথ্রপাসের মগজের বৃহত্তম মাপ আধুনিক মানুষের সীমার বাইরে নয়—এ কালের য়োরোপীয়দের মধ্যেও এমন বুদ্ধিমান ব্যক্তি পাওয়া গিয়েছে যার মেধা মাত্র ৮৭৫ সিসি; মাত্র ১০০০ সিসি মেধার অধিকারী ছিলেন বিখ্যাত লেখক আনাতোল ফ্রাঁস।

জাভা, সে কালে এগুলি যখন সগর্জনে জ্বলন্ত লাভা উদ্গীরণ করেছে তখন পশু দলের সঙ্গে এরাও হয়তো দিক বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে পালিয়েছে, কিন্তু ঐ আশ্চর্য দৃশ্যের মুখোমুখি হয়ে শুধুমাত্র নির্বোধ আতঙ্কই হয়তো অধিকার করে নি মনের সবখানি, হয়তো পাশাপাশি দেখা দিয়েছে বিস্ময়ের অঙ্কুর, প্রাথমিক জিজ্ঞাসা।

পূর্ব এশিয়ার বিস্তীর্ণ বন্য পরিবেশে এই আদি মানবরা শিকার খুঁজে বেড়াত, প্রত্যহ মুখোমুখি পড়ত বাঘ গণ্ডার হাতি ওরাং গিবন ইত্যাদি



১১নং চিত্র
পিথেকানথ্রপাস।



১২নং চিত্র
সিনানথ্রপাস।

পশুর। পিথেকানথ্রপাসের হাড়ের সঙ্গে হাতে-গড়া হাতিয়ার এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নি, তবে চীন-মালয় এলাকায় কুপিয়ে কাটবার যে নানা রকম পাথর (chopper) পাওয়া যায় তা এই জাতীয় মানুষের কাজ হয়ে থাকতে পারে। কারও কারও স্থির বিশ্বাস যে এরা অস্ত্র বানাতে জানত।

১৯৩৯ সালে এক ব্যক্তির খুলি ও চোয়াল আবিষ্কৃত হয়েছে যে সাধারণ জাভা মানবের তুলনায় অনেকটা জোয়ান মনে হয়, সে জন্য তার নাম দেওয়া হয়েছে পিথেকানথ্রপাস রোবাস্টাস (robustus)।

জাভা মানবের চীনা ভাই সিনানথ্রপাস, পুরো নাম সিনানথ্রপাস পেকিনেন্সিস, ওরফে চীনা মানব, ওরফে পিকিং মানব। জাভা মানবের জন্মকালের কিছু পরে এসেছে সে, অনেকটা তারই মার্জিত সংস্করণ—সেই কারণে বিজ্ঞানীরা অনেকে সম্প্রতি তাকে বলছেন পিথেকানথ্রপাস পেকিনেন্সিস। আগের তুলনায় এর দাঁত একটু ছোট, মাথাটি আরও কিছুটা মানুষোচিত, কারণ খুলি বেশী গোল, কপাল আরও উন্নত ; তার মানে অবশ্য বৃহত্তর মগজ—মাপ দাঁড়িয়েছে গড়ে ১০৭৫ সিসি, অর্থাৎ জাভা মানবের তুলনায় ২০% বেশী ; এদের মধ্যে সবচেয়ে মেধাবী ব্যক্তির খুলির মাপ (১৩০০ সিসি) অসট্রেলিয়ার আদিবাসীদের চেয়ে বড়, আফ্রিকার বুশম্যানদের সমান, এবং অনেক 'সভ্য' মানুষকেও হার মানায়। সবচেয়ে ছোটটি ৮৫০ সিসি। জাভা মানবের তুলনায় এদের হাড় অনেক বেশী সংগ্রহ করতে পেরেছেন পুরাবিদরা, তার ফলে স্ত্রী পুরুষ, শিশু ও বয়স্কের মধ্যে কিছুটা ভাগাভাগিও সম্ভব হয়েছে।

প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের এক চমৎকার দৃষ্টান্ত এই পিকিং মানবের আবিষ্কার। কি করে ধীরে ধীরে এই অস্থি-সম্পদ গড়ে উঠল, সামান্য ইঙ্গিত থেকে সম্পূর্ণ মানুষটি মূর্তি পেল তার কাহিনীতে দেখা যায় এ কাজে কতখানি অধ্যবসায় সহযোগিতা সংগতির প্রয়োজন, দেখা যায় বিভিন্ন বিজ্ঞান-শাখার বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের উৎসাহ উদ্যম একত্র করেও কত বাধা বিপত্তি আশা হতাশার মধ্য দিয়ে অল্পে অল্পে পুরস্কার মেলে।

পিকিং মানব যে ঐ নামটি পেয়েছে তার কারণ পিকিং শহরের ৩৭ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে এক পাহাড়ের গুহায় তার প্রথম চিহ্ন পাওয়া গিয়েছিল, এবং আজ পর্যন্ত ঐ স্থানটিই তাদের প্রধান ঘাঁটি। এই পাহাড়ের নাম শোকোতিয়েন (Choukoutien)—চৈনিক ভাষায় 'মুরগী-হাড়ের পাহাড়'। সেখানে নানা রকম প্রাচীন হাড়গোড় পাওয়া যায়

শুনে ১৯১৪ সালে প্রথম উপস্থিত হলেন সুইডেনের ভূতত্ত্ববিদ অ্যানডারসন, পরীক্ষা করে খুব আশান্বিত হয়ে ফিরে গেলেন। ১৯২১ সালে তিনি আবার এলেন দু জন সহকর্মীকে নিয়ে, এ বার সহজেই গুহার ভিতরে আবিষ্কৃত হল অধুনালুপ্ত গণ্ডার, হায়েনা ও ভালুকের কয়েকটি ফসিল। তখন এরা ভাল করে খুঁড়তে আরম্ভ করলেন, প্রথমে পাওয়া গেল কিছু কিছু স্ফটিকশিলার (quartz) খণ্ড, তাদের চোখা ধার দেখে মনে হয় যেন মানুষের হাতে ভাঙা ; "আমার মনে হয় আমাদের কোনও পূর্বপুরুষের দেহ রয়েছে এখানে," বললেন অ্যানডারসন। সুইডেনের যুবরাজ (এখন তিনি রাজা ষষ্ঠ গুস্টাভ) চৈনিক প্রত্নতত্ত্বে উৎসাহী ছিলেন, তিনি এলেন চীনে, দেখে শুনে খুব উদ্যোগী হলেন। আমেরিকার রকেফেলার প্রতিষ্ঠান আর্থিক সাহায্য দিতে সম্মত হল, চৈনিক কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা পাওয়া গেল। এত উৎসাহ আয়োজন গড়ে উঠল শুধু কয়েক খণ্ড সন্দেহজনক পাথর আর এক খণ্ড সন্দেহজনক দাঁতকে আশ্রয় করে। বিস্তারিত খনন আরম্ভ হল ১৯২৭ সালে, তখন গৃহযুদ্ধ চলছে চীনে। ছ মাস খোঁড়ার পর আর একটি মাত্র দাঁত পাওয়া গেল, কিন্তু সেটি যে মানুষ জাতীয় প্রাণীর তা প্রমাণ করা সম্ভব হল এ বার, ঐ সামান্য সাক্ষী থেকে জন্ম নিল নতুন মানুষ সিনানথ্রপাস ; নামকরণ করলেন পিকিং মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক ডেভিডসন ব্ল্যাক। পরবর্তী ১২ বছরে চল্লিশেরও বেশী বিভিন্ন চীন মানবের চিহ্ন মিলল—খুলির খণ্ড, মেরুদণ্ড বা অঙ্গের হাড়, দাঁত। এগুলি সমর্থন করলে ঐ একটি মাত্র দাঁতের সাক্ষ্যকে, আবার প্রমাণ হল অঙ্গশাস্ত্রের আশ্চর্য ক্ষমতা। তার পর এই কষ্টার্জিত সম্পদ রাতারাতি নিখোঁজ হয়ে গেল !

জাপান যখন গত যুদ্ধে যোগ দিতে উদ্যত সেই সন্ধিক্ষণে ফসিলগুলি বাক্সবন্দী করে মার্কিন নৌসেনার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল আমেরিকায় পাঠাবার জন্য, কিন্তু জাহাজ-ঘাটে পৌঁছাবার আগেই যুদ্ধ লেগে গেল, তার পর থেকে তাদের আর কোনও হদিশ মেলে নি এ পর্যন্ত। কেউ বলে বাক্স-গুলি জাহাজে তোলা হয়েছিল, কিন্তু জাপানীরা জাহাজ দখল করে জঞ্জাল মনে করে তা জলে ফেলে দিয়েছে, কেউ বলে হাড়গুলি চীনাদের হাতে পড়েছে, তারা তা গুঁড়িয়ে 'ওষুধ' বানিয়েছে ; এমনও হতে পারে যে এখনও

কোনও গুদামে বন্ধ অবস্থায় পড়ে আছে ঐ সিন্ধুক। যাই হক, সৌভাগ্য বশত ফসিলগুলির ছাঁচ তৈরি করা ছিল, তা ছাড়া হ্বাইডেনরাইখ নামক প্রসিদ্ধ নৃতত্ববিদ খুব বিশদ বর্ণনা রেখে গিয়েছেন। এবং শোকোতিয়েনের সম্পদ এখনও ফুরিয়ে যায় নি, সম্প্রতি চীন থেকে পাই ওএন চুং নামক এক কর্মী জানিয়েছেন যে আরও পাঁচটি প্রায় সম্পূর্ণ খুলি, চৌদ্দটি চোয়াল, ও ১৫২টি দাঁত পাওয়া গিয়েছে পিকিং মানবের।

এই মানুষরা দুটি আশ্চর্য কীর্তির প্রমাণ রেখে গিয়েছে তাদের গুহাগৃহে। মানুষের হাতে হাতিয়ার সৃষ্টি ও আগুনের ব্যবহার এখানেই প্রথম স্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান। হাতিয়ার বলতে বুঝতে হবে মৌলিক যন্ত্র বা অস্ত্র যা হাতে বহন করা চলে। মানুষের প্রাথমিক যন্ত্র তৈরি হয়েছে পাথর বা গাছের ডাল অল্প কিছু অদল বদল করে, এবং তা নিশ্চয় অস্ত্র হিসাবেও ব্যবহার হয়েছে। (যান্ত্রিক কুশলতা প্রথম পুরুষদের মধ্যে বেশী সহজে গড়ে উঠেছে স্ত্রীলোকের তুলনায়, কারণ এদের হাত প্রায়ই আটকা থাকত শিশুর তদারকে।) আক্রমণকারী বা শিকারের পশুকে বধ করা, মাংস কাটা বা কোপানো, মাটি খুঁড়ে কোনও সুস্বাদু মূল উদ্ধার করা ইত্যাদির চেয়ে সূক্ষ্মতর উদ্দেশ্য কিছু ছিল না এ সব প্রাথমিক উপকরণের। কিন্তু এই সামান্য সূচনারই পরিণতি আজকের জটিল যন্ত্র-যুগ। যান্ত্রিক অস্ত্র দিয়ে অন্যান্য প্রাণীকে জয় করে মানুষ আজ পৃথিবীতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, যান্ত্রিক উপকরণে বিরুদ্ধ প্রকৃতিকে হার মানিয়ে সে নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করেছে, এই যন্ত্র সে আজও বানিয়ে চলেছে। মস্তিষ্কের যে বিশেষ বিকাশ মানুষের একচেটিয়া সম্পদ যন্ত্র তার ফল। যার থেকে মানুষের আজ এত ক্ষমতা ও প্রগতি পৃথিবীতে, যা আবার কালই তাকে মুছে ফেলতে পারে পৃথিবী থেকে, সেই যন্ত্রের প্রথম সৃষ্টি নিশ্চয় স্মরণীয় ঘটনা মানুষের ইতিহাসে।

একটা কথা মনে রাখতে হবে যে হাতিয়ারের ব্যবহার ও তার সৃষ্টির মধ্যে বহু কালের ফাঁক। গেছো পূর্বপুরুষদের হাত ডাল ধরতেই সবচেয়ে বেশী ব্যস্ত ছিল, মাটিতে সেই অভ্যাসের বশে সম্ভবত ডালকেই প্রথম মানুষ অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করছে, যেমন বানর ও বনমানুষ এখনও করে। তার পরে ভুক্তাবশিষ্ট সুবিধামত এক খণ্ড হাড়, বা তার চেয়েও কঠিন পাথরের উপকারিতা সে বুঝেছে। কিন্তু একদা তার মনে হল এদের আকৃতি কিছুটা

বদলে নিলে কাজের অনেক সুবিধা হয়, তখন গোল পাথরকে ঘা মেরে ভেঙে সে তাতে আনলে প্রখরতা। কোনও আকস্মিক ঘটনাও বুদ্ধি খুলে দিয়ে থাকতে পারে, হয়তো ভোঁতা পাথরে হরিণের ছাল ছাড়াবার বৃথা চেষ্টা করে বিরক্ত হয়ে সে ছুঁড়ে ফেললে তা, টুকরো হয়ে ভেঙে পাথরের ধারালো মুখ প্রকাশিত হল। যে করেই ঘটে থাকুক এই আবিষ্কার, সে দিন থেকে মানুষ অস্ত্র-ব্যবহারক নয়, অস্ত্র-স্রষ্টা। সে দিন থেকে এ বিদ্যায় সে ক্রমশ পারদর্শী হয়ে উঠেছে, অবশ্য প্রথম দিকে অতি ধীরে। পিকিং মানবের পাথুরে হাতিয়ার অত্যন্ত রুক্ষ ও অসমান, প্রধানত স্ফটিকশিলা বা অন্য কোনও কঠিন পাথরের তৈরি।

তেমনি আগুন জ্বালতে শিখবার অনেক আগেই নিশ্চয় তার সঙ্গে মানুষের পরিচয় হয়েছিল। আকাশের বিদ্যুৎ যখন সগর্জনে বজ্রবাণ নিক্ষেপ করেছে, আগ্নেয়গিরি লাল জিহ্বা তুলেছে আকাশের গায়ে, কিংবা শুকনো বনে আগুন লেগে যখন সে দাবানল মড় মড় করে তেড়ে এসেছে বাতাসের বেগে, তখন নিশ্চয় ভয়ে পালিয়েছে মানুষ। কিন্তু এক দিন পালাতে পালাতেও সে থেমেছে, ভেবেছে, যুক্তিশক্তি ব্যবহার করেছে, তার পর হয়তো একদা গাছের ডাল বাড়িয়ে জ্বলন্ত লাভার থেকে আগুন ধরিয়ে নিয়ে নিজের কাজে লাগিয়েছে। আগুন জ্বালতে শিখবার আগে এমনি প্রকৃতির দানবকে সে সযত্নে বাঁচিয়ে রেখেছে দিবারাত্র, যেমন আজও অনেক প্রাচীন সম্প্রদায় লালন করে পবিত্র শিখা। তারপর এক দিন হয়তো কেউ পাথরে পাথরে ঠুকে যন্ত্র বানাচ্ছে, এক ফুলকি লাফিয়ে পড়ে শুকনো ঘাসে আগুন ধরালে, মানুষের মাথায় হঠাৎ জ্বলে উঠল আগুন সৃষ্টির বুদ্ধি—চির কালের মত তার হাতে বন্দী হল ঐ ভয়ংকর দানব। কাঠে কাঠে ঘষার গরমেও (যেমন ডালের মুখ ঘষে বর্শা বানাতে গিয়ে) মানুষের হাতে প্রথম আগুন জ্বলে উঠে থাকতে পারে ; হয়তো এরই থেকে উৎপত্তি বিবিধ কৌশলের যা আজও অনেক প্রাচীন জাতি ব্যবহার করে থাকে ; এক লাঠির সরু ফাটলে আর একটি কাঠি কেউ বার কয়েক ঘন ঘন টানাটানি করে, কেউ বা এক খণ্ড কাঠের গর্তে আর একটি কাঠি দু হাতের পাতার মধ্যে সজোরে ঘোরায় তুরপুনের মত। মহাভারতে এই যন্ত্রের উল্লেখ আছে (বনপর্ব, ৫৭ অধ্যায়) ; যে দণ্ড দিয়ে মন্থন করে আগুন জ্বালা হত তার নাম মন্থ আর নিচের কাঠ অরণি। এই

ঘষার কৌশল ছাড়া, চকমকি পাথরের (flint) স্ফুলিঙ্গই বহু সহস্র বছর ধরে আগুন জ্বালবার একমাত্র উপায় ছিল মানুষের হাতে।

এই যে কাঠের মধ্যে লুকিয়ে আছে আগুন এই প্রসঙ্গে একটি মজার গল্প বলা যেতে পারে এখানে। গল্পটি নিউ জ্বিল্যাণ্ড ও হাওয়াই দ্বীপাঞ্চলের প্রাচীন কিংবদন্তী থেকে গড়ে উঠেছে, পাওয়া যায় মাওরি পলিনেশীয় লোক-সাহিত্যে। নায়ক মা-উই তার ছোট বেলায় দেখত যে আগুনের অভাবে দ্বীপবাসীদের বড় কষ্ট—তারা কাঁচা মাছ ও মূল খেয়ে বাঁচে, শীতে কাঁপে ঠক ঠক করে। সুতরাং এক দিন সে নেমে এল পাতালে, সেখানে ছিল তার ঠাকুরমার ঠাকুরমা মা-হুইয়া, তার সঙ্গে দেখা করে আগুন চাইলে। মা-হুইয়া খুশী হয়ে তাকে তার হাতের একটি জলন্ত নখ খুলে দিলে, তাই নিয়ে মা-উই মর্ত্যে এল, কিন্তু নদী পার হতে গিয়ে নখটি জলে পড়ে গেল। অগত্যা তাকে ফিরে যেতে হল পাতালে, মা-হুইয়া আবার একটি নখ দিলে, কিন্তু সেটিও পথে একই ভাবে নষ্ট হল। এমনি করে একে একে সবগুলি নখ দেওয়ার পর যখন শুধু পায়ের নখ একটি মাত্র বাকি তখন বুড়ী রেগে অগ্নিমূর্তি হয়ে মাটিতে ছুঁড়ে ফেললে তা। দেখতে দেখতে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল সব, দুজনে দৌড়ে উঠে এল পৃথিবীতে, কিন্তু সেখানেও মাটি জ্বলন্ত, জল ফুটন্ত, বন বনানী খেয়ে চলেছে দাবানলে। ছুটতে ছুটতে মা-উই বৃষ্টির মন্ত্র উচ্চারণ করলে বারে বারে—তাতে পৃথিবী বাঁচল বটে, কিন্তু সব আগুন নিভে গিয়ে একেবারে সর্বনাশ হবার উপক্রম ; বিপদ বুঝতে পেরে বুড়ী তাড়াতাড়ি শেষ শিখাগুলি সংগ্রহ করে গাছের বাকলের ফাঁকে তাদের লুকিয়ে রাখলে—বৃষ্টি সেখানে ঢুকতে পারল না। সে দিন থেকে গাছের গা ঘষে এই আগুনকে বার করতে হয়।

এ জগতে মানুষের ভাগ্য যে অতি নির্দয়, এবং অগ্নির দান হাতে পেয়ে সেই দুর্বহ ক্লেশ যে অনেকাংশে উপশম হয়েছে, মানুষের শক্তি বহু গুণ বেড়েছে, এই রকম ইঙ্গিত মেলে নানা দেশের পুরাণে। সাধারণত কোনও দেবতার বর এই দান, যদিও গ্রীসীয় দেবতারা মোটেই মর্ত্যে আগুন পাঠাবার পক্ষপাতী ছিল না—যক্ষ প্রমিথিউস কেমন তা চুরি করে এনে দিয়েছিল মানুষকে এবং সেজন্য কি নিদারুণ শাস্তি হয়েছিল তার তা অনেকেরই জানা আছে। চীনের এক পুরাকাহিনীতে দেখা যায় সৃষ্টির

আদি পুং-শক্তি থেকে অগ্নির (এবং পরে সূর্যের), আদি স্ত্রী-শক্তি থেকে জলের (ও চাঁদের) উদ্ভব।

যাই হক, আগুন আবিষ্কারের পরে দুটি ক্ষেত্রে এর উপকারিতা বুঝতে গুহাবাসী মানুষের দেরি হয় নি—শীত নিবারণে ও মাংস পাকে। পিকিং মানবের গুহায় তার ব্যবহৃত হাতিয়ারের আশেপাশে নানা জায়গায় পোড়া মাটির সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে সেই সেই জায়গায় সে আগুন জ্বেলে বসেছে। আগুনে যখন মাংস ঝলসানো হচ্ছে তখন হয়তো গুহার মুখে বসে তারা পরস্পরকে বলেছে কে কি শিকার করেছে তার গল্প—বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ এলিয়ট স্মিথের মতে পিকিং মানব কথা বলতে পারত। গায়ে জামা নেই, রাতের ঠাণ্ডায় আগুনের তাপ মন্দ লাগছে না। তা ছাড়া হিংস্র জন্তুকে তা দূরে রাখে গুহার মুখ থেকে (যেমন আজও রাখে শিকারীর তাঁবুর সামনে); সেই পশুরা এক দিন এই গুহারই অধিবাসী ছিল, অন্ধকারে বসে তারা ব্যর্থ রাগে লক্ষ করে এই নতুন আগন্তুককে।

বহু সহস্র বছর কাঁচা মাংস খাওয়ার পর যে দিন মানুষ প্রথম রান্না মাংসের গুণ বুঝলে সে দিন নিশ্চয় আগুনের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার মন ভরে উঠেছিল। এই আবিষ্কারটি কেমন করে ঘটল তাও কল্পনার বিষয়; এমন হতে পারে যে বনের পশু যখন দাবানলে মরেছে তখন সেই পোড়া মাংস খেয়ে খুব ভাল লেগেছে তার; কিংবা হয়তো শীতের দিনে আগুনের ধারে বসে খেতে খেতে এক খণ্ড কাঁচা মাংস পড়ল তাতে, সেটিকে উদ্ধার করে মুখে দিয়ে পাওয়া গেল এক নতুন স্বাদ, আরও কয়েক বার পরীক্ষার পর আর সন্দেহ রইল না—জন্ম নিল পাকশিল্প! নিজের হাতে আগুন জ্বালবার কৌশল তখনও মানুষের জানা না হয়ে থাকলে এই সুস্বাদু মাংসের তাগিদই তাকে সে দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে কিছুটা। অবশ্য এ সম্বন্ধে জোর করে বলা যায় না, এই ধরনের আবিষ্কার আকস্মিক বলেই মনে হয়। এও জোর করে বলা যায় না যে পিকিং মানবই প্রথম আগুন জ্বেলেছে; তবে আগুন তারা এতই ব্যবহার করেছে যে গুহায় কোথাও কোথাও ছাইয়ের স্তূপ সাত মিটার উঁচু।

পাকশিল্পের সূচনার থেকেই সম্ভবত মানুষ প্রধানত মাংসাশী হয়ে উঠেছে, নিরামিষ ভোজ্যের খোঁজ ছেড়ে শিকারের পিছনে ছুটেছে বেশী। আহারে ও

হজমে সময় কম লেগেছে বলে অবসরও বেড়েছে। কিন্তু কাঁচার বদলে পোড়া মাংস খেতে আরম্ভ করে মানুষের শুধু যে স্বভাব বদলাল তাই নয়, সে নিজেই বদলাতে আরম্ভ করল। নরম খাদ্য চিবাতে হয় কম, ফলে নীচের চোয়াল ছোট হল। ঠিক এই পরিণতিই ঘটে থাকতে পারে যন্ত্র ব্যবহারের থেকেও যখন ছোট ছোট টুকরো করে মাংস কাটা সম্ভব হল, দন্তপাটির কাজ কমল। এংগেল্‌স বলেছেন মাংস খেতে না শিখলে মানুষ কখনও 'সম্পূর্ণ' হত না। কিসের থেকে কি হয়—কোথায় দৈবক্রমে আগুনের আবিষ্কার বা পাথর ভেঙে অস্ত্র তৈরি, আর কোথায় মানুষের চেহারা! এমনি সূক্ষ্ম আকস্মিক সূত্র ধরেই ক্রমবিকাশ কাজ করে। তেমনি মানুষের মস্তিষ্কের এতখানি উন্নতি সম্ভব হয়েছে তার হাত দুটির বিবিধ নিপুণ ব্যবহার থেকে, এবং হাত অবশ্য খালি হয়েছে দু পায়ে দাঁড়াতে শিখে। জাভা মানবের পরে মগজ অনেক দ্রুত বেড়েছে পূর্ববর্তী বনমানুষদের তুলনায়।

পিকিং মানবের ঐ সব খোলা চুলার আশেপাশে ঝলসানো হাড়গোড় বহু পড়ে আছে, তার থেকে তার রসনা-রুচির অনেক পরিচয় মেলে। হরিণ-মাংস ছিল প্রধান খাদ্য, কিন্তু গণ্ডার, মহিষ, উট, ঘোড়া ইত্যাদি প্রায় ৭০ রকম বিভিন্ন প্রাণীও সে শিকার করেছে—কি অস্ত্রে বা কৌশলে বড় জন্তুগুলিকে ঘায়েল করেছে তা কল্পনার বিষয়। এও জানা যায় যে সম্ভবত নিজের জাতভাইদের খেতে তার আপত্তি ছিল না। এই ক্যানিবাল-বৃত্তির স্বপক্ষে যা প্রমাণ তা যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি ভয়াবহ। কতগুলি ফাটা খুলির চেহারা দেখে সন্দেহ থাকে না যে মাথাগুলি ফেটেছে খুনীর আঘাতে, এবং পরে সেই খুলিকে খোলা হয়েছে যেন ভিতরের বস্তুটি বার করবার সুবিধা অনুসারে। কোনও কোনও জানোয়ারের মগজ আজ পাশ্চাত্ত্য দেশে লোভনীয় খাদ্য, চীনের আদিমানব তিন লক্ষাধিক বছর আগেই এর সূচনা করেছে হয়তো। আর অপেক্ষাকৃত অসভ্য অঞ্চলে আজও তো নরখাদক-বৃত্তি অনেকে ছাড়তে পারে নি। কারও কারও মতে অধিকাংশ মানুষই পেটের জ্বালায় নর-মাংস খেতে পারে।

খুলির হাড় ও তার সঙ্গে অল্প কিছু লম্বা হাড় গুহাতে এমন ভাবে বিক্ষিপ্ত যে তাও স্বাভাবিক মৃত্যুর নির্দেশ দেয় না। লম্বা হাড়গুলি সোজাসুজি চেরা, যেন মজ্জা বার করে খাওয়া হয়েছে, কিন্তু খুলির তুলনায়

এদের সংখ্যা অনেক কম। তা কেন হল ? পরবর্তী কালের অন্যান্য মানুষের সমাজে মুণ্ড নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠানের ইঙ্গিত আমরা পাব, কিন্তু সিনানথ্রপাসের দুর্বল মস্তিষ্কে এ ধরনের জটিল চিন্তা খেলেছে বলে মনে হয় না। এক ফরাসী বিশেষজ্ঞ এমন কথাও বলেছেন যে আসলে এ গুহায় বাস করত কোনও উন্নত জাতি (আজকের উন্নত মানুষ হোমো সেপিয়েন্স ?) যারা আগুন জ্বালত, হাতিয়ার বানাত। এরা মাঝে মাঝে শত্রুর খোঁজে বাইরে হানা দিয়ে শুধু তাদের মুণ্ড নিয়ে ঘরে ফিরত। তা যদি হয় তো এও খুব আশ্চর্য যে হাজার হাজার বছর সেখানে বাস করেও তারা নিজেদের হাড়গোড় কিছু রেখে গেল না গুহার মেঝেতে। তিন লক্ষ বছরের পর্দা তুলে আজ যদি এক বার তাকানো যেত ঐ গুহার মধ্যে তা হলে এ রহস্যের কি মীমাংসা দেখা যেত কে জানে !

পিকিং মানবের চুলার আশে পাশে পাথুরে হাতিয়ার ছাড়াও নানা প্রাণীর ভুক্তাবশিষ্ট হাড় পাওয়া যায়, এগুলিও সে অস্ত্র হিসাবে কাজে লাগিয়েছে হয়তো, যদিও তাদের গায়ে হাতের কাজের লক্ষণ দেখা যায় না। (হাড়ের কাজ আরও লক্ষাধিক বছর পরে নেয়ানডারটাল মানুষের কালে সূচিত হয়েছে বলে সাধারণত ধরা হয়।) গুহার নিচেই প্রান্তর ও উপত্যকা, শিকারের অভাব নেই, আগুন জ্বালবার কাঠও প্রচুর, এই আদর্শ গৃহ সে কালের মানুষ নিয়মিত ব্যবহার করেছে কয়েক শতাব্দ। কাছেই নদীর ধার থেকে পাথর সংগ্রহ করে এনে অস্ত্র বানাত এরা, এই সংগ্রহের কিছু অক্ষত পাথরও জমা আছে এক জায়গায়। কিন্তু এরা যে শুধু মাংস খেয়েই থাকে নি তার প্রমাণ স্বরূপ পাওয়া গিয়েছে এক রকম 'বেরি'র ফাটানো বীজ বা বাদাম।

খাদ্য ও বাস-ব্যবস্থার আপেক্ষিক সুবিধা সত্ত্বেও এরা বেশী দিন বাঁচত না—এই গুহার চল্লিশটি অধিবাসীর মধ্যে মাত্র এক জনের বয়স ৫০ থেকে ৬০, ১৫ জনের চৌদ্দরও কম। এদের জীবন যে ছিল বিপদসংকুল তার প্রমাণ পাওয়া যায় সবগুলি খুলিতেই, ভোঁতা অথবা চোখা অস্ত্র জনিত ক্ষতের চিহ্নে।

যেমন খুলির মাপে তেমন চেহারার বৈশিষ্ট্যেও এই গুহাবাসীদের মধ্যে অনেকটা পার্থক্য দেখা যায় ; তবু এরা যে একই জাতি ছিল তাতে সন্দেহ

নেই। হ্বাইডেনরাইখ পিকিং মানবের মধ্যে বারোটি মংগোলীয় বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছিলেন এবং তার থেকে ইঙ্গিত করেছেন যে আধুনিক চৈনিকদের পূর্বপুরুষ তখনই সে দেশে আবির্ভূত হয়েছে; কিন্তু এই প্রমাণ যে নির্ভরযোগ্য নয় তা দেখিয়েছেন অন্যান্য বিশেষজ্ঞরা।

পিকিং মানবের জগতটি আমরা অনেকটা এই রকম অনুমান করতে পারি। আবহাওয়া নাতিশীত, বৃষ্টিপাত যথেষ্ট, তার মধ্যে পাহাড়ের গায়ে গুহায় এক দল খাটো লোকের বাস। দিন কাটে আহারের ব্যবস্থায়, কাছেই নদীতে যে হরিণ জল খেতে আসে বোধ হয় তারই উপর বেশী নজর। প্রধান অস্ত্র সম্ভবত লাঠি ও পাথর—পাথর ভেঙে এরা কোপাবার, চাঁছবার, কাটবার উপযুক্ত করে নিয়েছে। মাংস ছাড়াও এরা (মেয়েরা সম্ভবত) সংগ্রহ করে 'বেরি', বাদাম, বুনো ঘাসের দানা। কখনও মানুষের মাংস পড়ে পাতে—বিজিত শত্রু, এমন কি কোনও রুগ্ন আত্মীয় কিংবা কচি শিশুর হয়তো (ফসিলের ৪৫% শিশুর হাড়)। গুহার মুখে আগুন জেলে এরা মাংস পোড়ায়, রাত্রি কালে এই আগুনই প্রধান ভরসা শত্রুর বিরুদ্ধে। শুধু পিকিং অঞ্চলেই নয়, উত্তর চীন থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত সম্ভবত ঘুরে বেড়িয়েছে সিনানথ্রপাস। ঐ সব অঞ্চলের ঘনিষ্ঠ ব্রহ্মদেশ ও ভারতেও কি তার পা পড়ে নি?

প্রাথমিক মানুষদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে প্রসিদ্ধ জাভা মানব ও চীন মানব, তার কারণ তাদের সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু জানি, এবং তার আবার কারণ যে তাদেরই ফসিল এ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশী পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু সে কালে এরাই যে পৃথিবীর একমাত্র অধিবাসী ছিল তা নয়। বিশেষ করে আধুনিক গবেষণার ফলে আরও অনেক পুরামানবের খোঁজ মিলেছে—শুধু এশিয়ায় নয় আফ্রিকাতেও।

এদের মধ্যে দুটি এশিয়াবাসীকে ঘিরে এক রোমাঞ্চকর মত প্রস্তাবিত হয়েছিল, তদনুসারে একেবারে প্রথমে মানুষ ছিল দানবের মত অতিকায়। কি করে এক বিখ্যাত বিজ্ঞানীর মনে এই দানবিক মানুষের মূর্তি গড়ে উঠেছিল সে কাহিনী সংক্ষেপে বলা যেতে পারে।

চীন দেশে আবহমান কাল থেকে 'ড্র্যাগনের অস্থি' ব্যবহার হয় ওষুধ

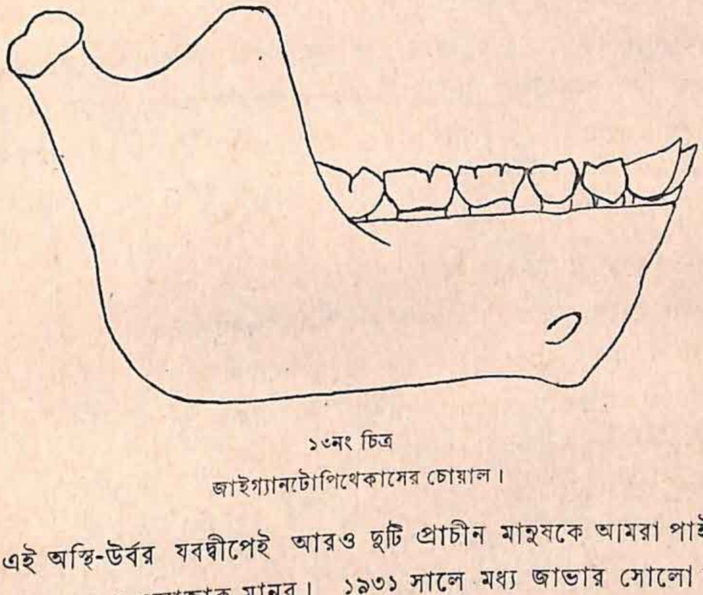
বানাতে, এতে সারে না এমন রোগ নেই, সুতরাং এর সংগ্রহ ও বিক্রি মস্ত বড় ব্যবসা সেখানে। এই ড্র্যাগনাস্থি আর কিছুই নয়, নানা রকমের মিশ্র ফসিল। আশ্চর্য নয় যে বিদেশী প্রত্নবিদরা সে দেশের দাওয়াইখানায় ঘুরে ঘুরে বেড়ান হাড়ের খোঁজে ; হং কং শহরের এমনি এক দোকানে ওলন্দাজ ভূতত্ত্ববিদ ফন কোএনিগ্‌সহ্বাল্‌ড এক মানুষোপম প্রাইমেটের কয়েকটি প্রকাণ্ড দাঁত আবিষ্কার করেন ; একটি মাড়ির দাঁত গোড়ার কাছে প্রায় ছ গুণ বড় মানুষের দাঁতের তুলনায়, গরিলার দু গুণ।

এই অনুসন্ধানী ব্যক্তিটিই আবার ১৯৪১ সালে পিথেকানথ্রপাসের দেশ যবদ্বীপের মধ্য অঞ্চলে সংগিরন জেলার আদি প্লাইস্‌টোসিন মাটিতে দুটি প্রকাণ্ড চোয়াল পান নিচের পাটির। এর আখ্যা দেওয়া হল মেগানথ্রপাস, অর্থাৎ বিরাট মানুষ। মানুষের মত প্রাণীদের মধ্যে এই ব্যক্তিই প্রাচীনতম এমন দাবি করা হয়েছে।

যাদের দন্তপাটি এত বড় তাদের দেহও সেই তদনুপাতে বৃহৎ তা ধরে নিয়ে দানবিক মানুষ কল্পনা করলেন সেই হ্বাইডেনরাইখ যিনি চীন মানব সম্বন্ধে এত কাজ করেছেন ; এঁর মতানুসারে চীন ও জাভার দানবদের থেকে ক্রমবিকাশের পথে উদ্ভূত হয়েছে ক্ষুদ্র মানুষ পিথেকানথ্রপাস ইরেকটাস, আর এদের মাঝপথে আছে পিথেকানথ্রপাস রোবাস্‌টাস। তিনি লিখলেন যে জাভার দানব যে কোনও গরিলার চেয়ে বড়, আর চীনের দানব সেই অনুপাতে জাভা দানবের চেয়ে বড়—অর্থাৎ প্রায় দেড় গুণ এবং পুরুষ গরিলার দু গুণ ; মানবের বংশাবলী অতীতে অনুধাবন করতে গেলে এই সব দানবে পৌঁছাতে হয়।

এই দানবিক মানবের চিত্রটি খুবই চিত্তাকর্ষক সন্দেহ নেই, কিন্তু নৃতত্ত্ব ও অস্থিশাস্ত্রে পণ্ডিত বিশেষজ্ঞরা দেখিয়েছেন যে প্রকাণ্ড দাঁত বা ভারী চোয়ালের মালিককেও যে অতিকায় হতে হবে এমন কোনও কথা নেই, সুতরাং দানবিকতার (gigantism) যুক্তি খাটে না। ইতিমধ্যে এও প্রমাণ হয়েছে যে চীন দানব মানুষ মোটেই নয়, এক বৃহদাকার বনমানুষ—ঠিক তারই তর্জমা করে তার নাম দেওয়া হয়েছে জাইগ্যানটোপিথেকাস। প্রচণ্ড শক্তিধারী এই মাংসাশী দানব জন্তু জানোয়ার শিকার করে গুহায় নিয়ে আসত মাংস। সম্প্রতি চৈনিক প্রত্নবিদ পাই ওএন-চুং দক্ষিণ চীনে কোআংসি প্রদেশে

চুনাপাথরের গুহায় এই প্রাণীটির দাঁত পেয়েছেন পঞ্চাশেরও বেশী ; তাঁর গবেষণার থেকেও প্রমাণিত হয়েছে যে এরা মধ্য প্লাইস্টোসিনের প্রাণী, অর্থাৎ পিথেকানথ্রপাসের সমকালীন। ইনি ১৯৫৭ সালে ঐখানেই একটি চোয়াল পেয়েছেন প্রায় সব দাঁত সমেত, তাতে সন্দেহ থাকে না যে প্রাণাটি বনমানুষ, যদিও উন্নত ধরনের, এবং মানুষের সম্পর্কহীন। মেগানথ্রপাস সম্ভবত পিথেকানথ্রপাস জাতীয় প্রাণীর এক বিশেষ সংস্করণ, কিংবা আফ্রিকাবাসী অসট্রালোপিথেকাসেরও নিকটাত্মীয় হতে পারে। ১৯৫২ সালে জাভার ঐ একই এলাকায় তার আরও একটি চোয়াল মিলেছে ; চোয়ালগুলি অতিকায়, প্রায় পূর্ণাঙ্গ পুরুষ গরিলার সমান।



১৩নং চিত্র

জাইগ্যানটোপিথেকাসের চোয়াল।

এই অস্থি-উর্বর যবদ্বীপেই আরও দুটি প্রাচীন মানুষকে আমরা পাই— সোলো মানব ও ওআজাক মানব। ১৯৩১ সালে মধ্য জাভার সোলো নদী অঞ্চলে এগারোটি খুলি পাওয়া গিয়েছিল, এগুলি অতিমাত্রায় মোটা এবং মগজের মাপ গড়ে ১১০০ সিসি। জাভা মানবের সঙ্গে এদের সাদৃশ্যের থেকে অনেকে মনে করেন এরা তার থেকে উদ্ভূত, অন্য দিকে এদের মিল আছে নেয়ানডারটাল মানুষের সঙ্গে (এই প্রসিদ্ধ পুরামানবের পূর্ণ কাহিনী আছে পরবর্তী অধ্যায়ে)। সোলো মানবের ফসিলের সঙ্গে পাওয়া গিয়েছে হাড়ের তৈরি কয়েকটি সুন্দর হাতিয়ার, হরিণ-শিঙের এক কুড়াল, এক

কাঁটাদার বর্শা-ফলক এবং রুক্ষ পাথুরে অস্ত্র, মনে হয় সে বাস করেছে পুরাপ্রস্তর যুগের সাম্প্রতিক অংশে, যদিও তার আগেই তার উৎপত্তি হয়েছে হয়তো। এই খুলিগুলির মুখাংশ ও নিম্ন মাড়ি পাওয়া যায় নি, তার থেকে মনে হয় নিচের দিক ভেঙে মগজটি বার করা হয়েছে—অর্থাৎ চীন মানবের মত সেও ছিল নরখাদক।

যে ত্রিনিল গ্রামে দুবোআ পিথেকানথ্রপাসকে আবিষ্কার করেছিলেন তারই ৬০ মাইল দক্ষিণ-পুবে ওআজাক নামক জায়গায় তিনি আরও এক মানুষের দুটি খুলি পান। এই আবিষ্কার ১৮৮৯-৯০ সালে পিথেকানথ্রপাসের আগে ঘটে থাকলেও কোনও কারণে দুবোআ খবরটি প্রকাশ করেন নি ১৯২০ সাল পর্যন্ত। খুলি দুটির মেধার মাপ ১৫৫০ ও ১৬৫০ সিসি, অর্থাৎ আধুনিক মানুষের চেয়ে বেশ বড়, পক্ষান্তরে খুলির আকৃতির সঙ্গে আশ্চর্য মিল অসট্রেলীয় আদিবাসীদের (যাদের মগজ এ কালের মানুষের মধ্যে প্রায় ক্ষুদ্রতম)। এমন ধারণা প্রকাশ করা হয়েছে যে জাভা মানব থেকে সোলো মানব ও ওআজাক মানবের পথে অসট্রেলিয়ার আদিবাসীর উদ্ভব।

এ দিকে আফ্রিকার অ্যালজিরিয়াতে ১৯৫৪ সালে দুটি নিম্ন পাটির চোয়াল মেলে, তার থেকে জন্ম নিল অ্যাটল্যানথ্রপাস। এর হাড়ের সঙ্গে জাভা ও চীন মানবের খুব নিকট সাদৃশ্য হলেও কিছুটা পার্থক্য আছে। যাই হক, আফ্রিকায় যে পিথেকানথ্রপাস জাতীয় মানুষের অস্তিত্ব ছিল এই তার প্রথম প্রমাণ, আবিষ্কারটির গুরুত্ব সেইখানে। এই মানুষের বয়স ধরা হয়েছে প্রায় পাঁচ লক্ষ বছর। চোয়ালের সঙ্গে পাওয়া গিয়েছে বহু লুপ্ত প্রাণীর হাড় এবং নানা রকম পাথরের (কোআর্টজাইট, চুনাপাথর, চকমকি) রুক্ষ হাতিয়ার, সেগুলির গঠনে মানুষের হাত আছে।

আফ্রিকার প্রাচীন মানুষদের মধ্যে এখনও সবচেয়ে প্রসিদ্ধ রোডিসীয় মানব। ১৯৫১ সালে উত্তর আফ্রিকায় খনিতে কাজ করতে করতে মজুররা হঠাৎ আবিষ্কার করে এক স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ কঙ্কাল, কিন্তু উপযুক্ত যত্নের অভাবে তার অনেক অংশই নষ্ট হয়ে যায়। যা বেঁচেছে তা পরীক্ষা করে জানা গিয়েছে যে মহিলাটি সুকণ্ঠ ছিলেন, যদিও অবশ্য গানের সুর কখনও ভাঁজে নি সেই গলা; দেহ ছিল দীর্ঘ ও শক্তিশালী, ঘাড় মোটা, নাক গরিলার

মত চ্যাপটা, ভ্রূর নিচে চোখ কোটরগত, মেধা ১৩০০ সিসি, দাঁতের চেহারা প্রায় আমাদেরই মতই; এবং এ যুগের লোকের মত এরও দাঁতে ছিল ক্ষয় রোগ বা ক্যারিস, যদিও অনেকের ধারণা এটি সভ্য যুগের রোগ। এই ৪০,০০০ বছর প্রাচীন মহিলাটির রক্ত হয়তো বর্তমান নিগ্রোদের মধ্যে প্রবাহিত। পক্ষান্তরে এর চেহারায় নেয়ানডারটাল ও সোলো মানবের নানা বৈশিষ্ট্যও দেখা যায়। ১৯৫৩ সালে প্রায় ১৫০০ মাইল দূরে দক্ষিণ আফ্রিকায় রোডিসীয় মানবের আর একটি খুলি পাওয়া গিয়েছে, এবং তার সঙ্গে মানুষটির ব্যবহৃত কিছু হাতিয়ারও। এর মধ্যেও নেয়ানডারটাল-সোলো-আধুনিক মানবের মিশ্র ধারা দেখা যায়—হয়তো সংমিশ্রণের পরিচায়ক তা।

আধুনিক চিহ্ন আরও কয়েকটি পুরামানবের মধ্যে দেখা যায়, যথা য়োরোপের সোআন্‌সকুম মানব ও ফঁতেশভাদ মানব, আফ্রিকার কানাম মানব ও কানজেরা মানব। আমাদের সঙ্গে এদের সম্ভব সম্পর্কের উল্লেখ করব পরে, খাঁটি মানুষের আলোচনার আরম্ভে। আপাতত বলা চলে যে এশিয়া ও আফ্রিকাবাসীদের সমতুল্য পৌরাণিক মানব য়োরোপে পাওয়া যায় নি, এ[illegible]র এক প্রসিদ্ধ সাক্ষী যে ছিল পিল্‌টডাউন মানব সেও সম্প্রতি হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছে; সেই রহস্যময় কাহিনীর বর্ণনা আছে দুই অধ্যায় পরে।

এই অধ্যায়ে প্রথম মানুষদের যে চিত্রটি আমরা পেলাম আজকের সভ্য পাঠকের চোখে তা খুব মনোরম না হলেও মনে রাখতে হবে যে এদের সব রকম পাশবিকতার আড়াল থেকে নিঃসন্দেহে মনুষ্যত্বও উঁকি দেয়। তা দেখা যায় বিশেষ করে এদের অনুসন্ধিৎসা ও পরীক্ষাপ্রিয়তার মধ্যে। এরই ফলে আগুনের আবিষ্কার, হাতিয়ারের সৃষ্টি—যথাক্রমে রসায়ন ও পদার্থ-বিদ্যার ক্ষীণ সূত্রপাত। খাদ্যের অন্বেষণে এরা যে মনে রেখেছে কোন্ মূলটি বিষাক্ত, কোন্ জন্তুটি আহার্য বা তার দেহের কোন্ অংশ সবচেয়ে সুস্বাদু, কে কোন্ ঋতুতে সুলভ, এ সবের মধ্যেও আজ আমরা যাকে বলি বিজ্ঞান তার বিভিন্ন শাখার বীজ নিহিত।

কিন্তু আদিমানবের এই স্বল্প বিবরণে আমাদের মন মানে না, কৌতূহল বাড়ে মাত্র। কোটি কোটি বছর আগেকার প্রাণীদের সম্বন্ধে আমরা যতটা জানি তার তুলনায় এই জ্ঞান নিতান্তই সামান্য। কোথায় কবে মানুষের

জন্ম এই গুরুতর প্রশ্নটিই এখনও অমীমাংসিত, যদিও এ সম্বন্ধে জল্পনা কল্পনার অভাব হয় নি ; এশিয়া আফ্রিকা দুই মহাদেশেই প্রাথমিক মানুষদের পাওয়া গিয়েছে। হিমালয়ের উত্তরে মধ্য এশিয়ার বন সরে যাবার ফলে মানুষের পূর্বপুরুষ গাছ থেকে নেমে এসে মনুষ্যত্ব লাভ করল এই মতের কথা আগে বলেছি। আর যাঁদের ধারণা দক্ষিণ এশিয়ায় কি আফ্রিকায় মানুষের জন্ম তাঁরা বলেন অত আকস্মিক ভাবে মানুষের উদ্ভব হয় নি, বানর বা বন-মানুষের যা যা আদি জন্মস্থান সে সব জায়গাতেই মানুষের জন্ম সম্ভব। আফ্রিকা যে শুধু গরিলা শিমপানজিদের এত কালের ধাত্রী তাই নয়, মানুষের আরও নিকট আত্মীয় অসট্রালোপিথেকাসের ঘাঁটি সেই মহাদেশ—আফ্রিকার পক্ষে ছিলেন স্বয়ং ডারউইন। অপর পক্ষে হিমালয়ের পাদদেশে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের শিবালিক পর্বতের মায়োসিন স্তরে (অর্থাৎ প্লাইস্টোসিনের আগের অধিযুগের শেষ ভাগে) এমন বনমানুষের ফসিল পাওয়া গিয়েছে যারা একাধারে এ কালের বনমানুষ ও মানুষের পূর্ব-পুরুষ হবার যোগ্য—যেমন ড্রায়োপিথেকাস ('গেছো বনমানুষ') যার নাম করেছি আগে। আদিমানবের কোনও ফসিল এ পর্যন্ত ভারতে পাওয়া যায় নি, এশিয়ার পূর্বাঞ্চলে দেখা গিয়েছে তারা, ভূতত্ত্বের ও ফসিলের সাক্ষ্য থেকে মনে হয় যে প্লাইস্টোসিনের আগে ভারতে এক প্রবল প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফলে ঐ প্রাচীন বনমানুষদের খাওয়া থাকার অবস্থা উত্তরাঞ্চলে কঠিন হয়ে উঠল, তারা সরে গেল দক্ষিণ-পূর্ব দিক লক্ষ করে। এই বৈপ্লবিক অভিযানের ফলেই মানুষের জন্ম এমন কথা বলেন অনেকে ; আশ্চর্য নয় যে আমাদের প্রাচীনতম পূর্বপুরুষের অন্যতম জাভা মানবকে এই দিকেই পাওয়া গিয়েছে। এঁদের মতে অনুরূপ প্রাকৃতিক বিপ্লবের ফলে প্রায় সেই সময়েই চীনে পিকিং মানবের জন্ম। সুতরাং মানুষের জন্মক্ষেত্র হিসাবে আফ্রিকার তুলনায় এশিয়ার দাবি নগণ্য নয় ; এশিয়ার মধ্যে আবার হিমালয়ের নিচে এত রকম বানরের ধাত্রী ভারতের দাবি আরও একটু জোরালো। এখানে বলা যেতে পারে যে অসট্রেলিয়া বা দক্ষিণ আমেরিকা মানুষের জন্মস্থান এমন অদ্ভুত প্রস্তাবও করা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে হিমালয়ের 'তুষার-মানব' ইয়েতির কথা মনে জাগে। লাংগুর, ভালুক এমন কি পাহাড়ী ছাগলের সঙ্গে তাকে সনাক্ত করা হয়ে থাকলেও

যারা তাকে আমাদের নিকটবর্তী ভাবে তাদের মনে আশা মরে যায় নি এখনও। ইয়েতি কি গরিলার নিকটাত্মীয় কোনও বনমানুষ? না কি অনেক পরবর্তী কালের সৃষ্টি আমাদেরই কাছাকাছি কোনও প্রায়-মানুষ যে খাঁটি মানুষের আবির্ভাবের পরে তার তাড়নায় পালিয়ে এসে হিমালয়ে আত্মরক্ষা করতে পেরেছে! কিন্তু বানর, নর বা মধ্যবর্তী missing link যাই সে হক, তার রহস্য সম্পূর্ণ ভেদ হয়ে গেলে কি আমাদের মনে একটুখানি আপসোস থেকে যাবে না? যাদুঘরে তার দেহ সাজিয়ে, তাকে যথোপযুক্ত দাঁত-ভাঙা ল্যাটিন নাম দিয়ে বিজ্ঞানীরা সন্তুষ্ট হতে পারেন, কিন্তু এই স্পষ্টতাধর্মী যন্ত্রসভ্যতার দিনেও যারা রোমান্সের সন্ধান করে তারা কি দীর্ঘশ্বাস ফেলবে না? সেই কোথায় হাজার হাজার ফুট উঁচুতে হিমালয়ের কোলে মানুষের কোলাহল আর শহর থেকে অনেক দূরে বাস করছে বোধ হয় মানুষেরই মত এক প্রাণী, যেখানে হীনতর প্রাণী এমন কি কীট পতঙ্গও বেশী নেই···তুষার-প্রান্তরে খালি পায়ে সে চলেছে কত হাজার, হয়তো কত লক্ষ বছর ধরে কে জানে! মানুষের প্রতি তার বৈরিতা না অভিমান, না শুধু ঔদাসীন্য?···কুয়াশায় ঢাকা তার দেহের মত না হয় কিছুটা অস্পষ্টই থাকত তার পরিচিতি।

৭। ব্যর্থ মানব নেয়ানডারটাল

সিনোজ্রোয়িক অধিকল্পের সাত কোটি বছর ধরে যদি হয় স্তন্যপায়ীদের প্রাধান্য তো এর শেষ প্রায় দশ লক্ষ বছর মানুষের যুগ। এই সময়ের কাছাকাছি প্লাইস্টোসিনের শুরু, তাকে যে সাধারণ ভাবে মহা তুষার যুগও বলা হয় তা আগে বলেছি। আসলে তুষার যুগ একটি নয়, এই সময়ের মধ্যে চার বার উত্তরী হিম নেমে এসে দক্ষিণে তাড়িয়ে নিয়েছে বন বনানী পশু পাখি, চার বার আবার সরে গিয়েছে উত্তরে। এই সব যুগের বিভিন্ন নামও আছে, কিন্তু আমরা তার মধ্যে যাব না। বর্তমানে চতুর্থ তুষার যুগ থেকে মুক্তি পেয়ে পৃথিবী ক্রমশ উষ্ণতর হয়ে উঠছে। (সোভিয়েট বিজ্ঞানী গ্রোমোভ বলেন তুষার যুগ এসেছে মাত্র এক বার।) বরফের এই ওঠা নামার কারণ খুব স্পষ্ট নয়, পৃথিবীর জলে স্থলে যে বৈপ্লবিক উত্থান পতন ঘটেছে কয়েক কোটি বছর পরে পরে (যার কথা আগে বলেছি) তারই মত এর হেতুও রহস্যে আবৃত। (বহু প্রাচীন কালেও পৃথিবী বরফের কবলে পড়েছে, যথা প্রায় ২৫ কোটি বছর আগে এক বার।)

প্রথম তুষার যুগের ঠিক কবে শুরু তা জানা নেই (দশ লক্ষ থেকে ছ লক্ষ বছরের মধ্যে), তবে তা শেষ হয়েছে ৫৬০,০০০ বছর আগে। মানুষের সম্ভাব্য পিতামহ অসট্রালোপিথেকাস আফ্রিকায় আবির্ভূত হয়েছে তার আগেই। প্রথম যে প্রাণীটিকে নিঃসন্দেহে মানুষ বলা চলে তার উদ্ভব কবে কোথায় তা আমরা জানি না, যেমন জানি না তার চেহারা। জাভা মানব

ও চীন মানবকে পাওয়া গেল প্রথম ও দ্বিতীয় তুষার যুগের মধ্যে যে এক লক্ষ বছরের ফাঁক তার ভিতরে। এর মধ্যে যদি কোনও ঐতিহাসিক অভিযান ঘটে থাকে সমগ্র এশিয়ার বুকের উপর দিয়ে তো তার কোনও চিহ্ন আজও পাওয়া যায় নি। ৪০,০০০ বছর পরে দ্বিতীয় তুষার যুগ বিদায় নিল, এল পৃথিবীর দীর্ঘতম উষ্ণ যুগ (দু লক্ষ বছর)। এতটা সময়ের মধ্যে তেমন স্পষ্ট আর কোনও নতুন মানুষের ফসিল পাওয়া যায় নি, যদিও আফ্রিকা এশিয়া য়োরোপ এই তিন মহাদেশেই নিজের অস্তিত্বের প্রচুর প্রমাণ মানুষ রেখে গিয়েছে (অসট্রেলিয়া ও আমেরিকায় কিন্তু নয়) নানা জাতীয় পাথুরে অস্ত্রে উপকরণে। য়োরোপের সর্বত্র, দক্ষিণ আফ্রিকায়, ভারতে এবং আরও অনেক জায়গায় ছড়িয়ে আছে এ সব। কাঠ এবং হাড়ের উপকরণও সম্ভবত ব্যবহার করেছে সে দিনের মানুষ, কিন্তু কাল তার কোনও চিহ্ন রাখে নি আজ।

প্রাথমিক মানুষের পাথুরে হাতিয়ার বিশ্বের যাদুঘরগুলিতে আজ রাখবার জায়গা হয় না, পৃথিবীর কোনও কোনও অঞ্চলে এ ধরনের জিনিস এখনও ঝুড়ি ঝুড়ি সংগ্রহ করা চলে। কিন্তু তার অর্থ এমন নয় যে সে কালে মানুষ সংখ্যায় খুব বেশী ছিল। বিখ্যাত প্রত্নবিদ গর্ডন চাইল্ড বরং এর বিপরীত ধারণা প্রকাশ করে লিখেছেন যে একটি লোক দিনে যদি দু তিনটি হাতিয়ারও বানায় তো দু লক্ষ বছরে তার সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে অনেক। দ্বিতীয়ত, প্রথম দু লক্ষ বছর কালের মানুষের দেহাবশেষ যা পাওয়া গিয়েছে তা সংখ্যায় সামান্য। তাঁর মতে আদি থেকে মধ্য প্লাইস্টোসিন যুগে মানুষ সম্ভবত বর্তমান কালের বনমানুষদের মতই সংখ্যাল্প ছিল। প্রসঙ্গত এখানে বলা যেতে পারে যে পুরাপ্রস্তর যুগ মাত্র হাজার দশেক বছর আগে শেষ হয়ে থাকলেও এর তৃতীয় ও শেষ ভাগের মোট জনসংখ্যা অনুমান করা হয়েছে মাত্র আধ থেকে এক কোটি।

এ বার এ কাহিনীতে এক নতুন ব্যক্তির পালা শুরু যে আমাদের চোখে অনেক বেশী স্পষ্ট, প্রথম প্রত্যুষের কুয়াশা কাটিয়ে মানুষ যেন এখন আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। আফ্রিকা ও এশিয়ার পরে এ বার প্রধান রঙ্গভূমি য়োরোপে, পুরামানবদের মধ্যে এর মত ইতিহাস-প্রসিদ্ধ আর কেউ নয়, এর কথা আমরা প্রায় সকলেই শুনেছি—১৮৫৬ সালে জার্মেনির ড্যুস্‌লডর্ফ শহরের অদূরে নেয়ানডার উপত্যকায় প্রাপ্ত এক ফসিলের থেকে এর নাম

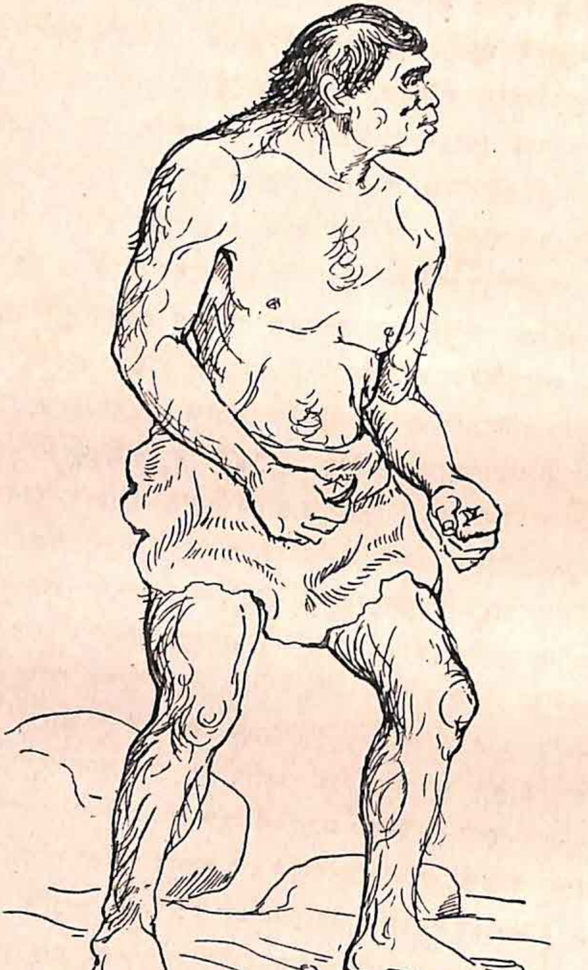
দেওয়া হয়েছে নেয়ানডারটাল (Neanderthal) মানব (যদিও আসলে প্রথম নেয়ানডারটাল খুলি পাওয়া যায় আট বছর আগে জিব্রল্‌টারে)। এক ছোট গুহা পরিষ্কার করতে করতে কুলিরা একে আবিষ্কার করে : আজকের দিনে হলে সঙ্গে সঙ্গে বিশেষজ্ঞরা সেখানে গিয়ে হাজির হতেন, হাড়ের গায়ে হাত ছোঁয়াবার আগে তাদের অসংখ্য ছবি তুলতেন মাটি সরিয়ে সরিয়ে বিভিন্ন স্তরে ; প্রতিটি ধূলিকণা তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করা হত এক টুকরো দাঁতের খোঁজে, পাথর বা হাড়ের তৈরি অস্ত্র, সরঞ্জামের আশায়, যা কিছু পাওয়া গেল তার সম্পূর্ণ তালিকা তৈরি হত সযত্নে। কিন্তু তখনকার দিনে প্রত্নতত্ত্বের এত সম্ভ্রম ছিল না ; সাধারণ লোকও এত সজাগ ছিল না—কঙ্কালটি ভেঙে ফেলা হল, কিছু হারিয়ে গেল। সৌভাগ্যক্রমে এক স্থানীয় চিকিৎসকের নজর পড়েছিল সে দিকে, হাড়গুলি সংগ্রহ করে তিনি নিয়ে গেলেন এক মিউজিয়ামে। আবিষ্কারের খবর তুমুল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলে। কঙ্কালটি কোনও প্রাচীন মানুষের যে হতে পারে তা অনেকেই স্বীকার করলে না, তাদের মতে ওগুলি কোনও রোগবিকৃত আধুনিক মানুষেরই হাড়। পরে য়োরোপেরই অনেক জায়গায় আরও বহু কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে, বিশেষত ফ্রান্সের দরদইন্ অঞ্চলের গুহা গহ্বরে। সবচেয়ে বেশী পাওয়া গিয়েছে তৃতীয় ও চতুর্থ তুষার যুগের মধ্যে, এরই মধ্যে সম্ভবত নেয়ানডারটাল মানুষের উৎপত্তি ও পূর্ণ বিকাশ —অর্থাৎ প্রায় দেড় লক্ষ বছর আগের থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী এক লক্ষ বছর কি তার ও কিছু বেশী কাল ধরে। পুরাপ্রস্তর যুগের আদি অংশের তুলনায় এই মধ্য ভাগে য়োরোপে কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে অন্তত পাঁচ গুণ বেশী, যদিও প্রথম অংশই পাঁচ গুণ বড়। মানুষ যে বেড়ে চলেছে, প্রকৃতির বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও পৃথিবীতে তার স্থান করে নিচ্ছে, এ যেন তারই ইঙ্গিত। কিন্তু মানুষের মিছিল যদিও ক্রমশ স্ফীততর হয়ে চলল, নেয়ানডারটাল মানুষকে হার মানতে হল শেষ পর্যন্ত। চতুর্থ তুষার যুগের চূড়ান্ত কালে হঠাৎ একদা সে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল এ জগত থেকে, এল আধুনিক মানুষ, খাঁটি মানুষ—কিন্তু সে কথা পরে।*

* অনেকের বিশ্বাস যে নেয়ানডারটাল মানুষ মেরুর শীতের উপযোগী এক বিশেষ প্রজাতি, এবং ঐ হিমাবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে তারা মরে গেল ; কিন্তু ফসিলের সাক্ষ্য অন্য রূপ।

এখানে বলে রাখা দরকার নেয়ানডারটাল মানুষ গোটা বারো
সম্পর্কিত জাতির নাম। বাসকাল বা বাসস্থানও সংকীর্ণ নয়—প্রধানত
য়োরোপের লোক হলেও আফ্রিকা বা এশিয়াতেও এদের পাওয়া গিয়েছে
(রোডিসীয় ও সোলো মানবের কথা আগে বলেছি), সম্ভবত সেখান থেকেই
এরা য়োরোপে ছড়িয়ে পড়েছে, যেমন হয়তো একদা আরও প্রাচীন
মানুষের পূর্বপুরুষেরা গিয়েছিল উলটো পথে। আজ পর্যন্ত সবশুদ্ধ এক
শোরও বেশী নেয়ানডারটাল মানুষের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এদের
তিরোধান ও চরম প্রগতির তারিখ যেমন স্পষ্ট, প্রথম আবির্ভাবের দিন
তার তুলনায় অনেকটা রহস্যাবৃত ; উপরোক্ত তারিখের থেকে তা অনেক বেশী
সাম্প্রতিক এমন মত দেখা যায় কোনও কোনও কেতাবে। পক্ষান্তরে
১৯০৭ সালে জার্মেনিরই হাইডেলবের্গ শহরের কাছে এক বালি-কূপে
পাওয়া গিয়েছে সব দাঁত সমেত এক ভারী চোয়াল যার বয়স হয়তো ছ লক্ষ
বছরেরও বেশী (আদি প্লাইস্‌টোসিন)। এই ব্যক্তির থুংনি ছিল না,
যদিও দাঁত প্রায় মানবিক ; অনেক প্রত্নবিদ একে আদি নেয়ানডারটাল
শ্রেণীতেই ফেলেন, যদিও কেউ কেউ একে সম্পূর্ণ নতুন প্রজাতির নাম
দিয়েছিলেন (হোমো হাইডেলবেরজেন্‌সিস), এবং এখন কেউ বা একে
হোমো ইরেক্‌টাস অর্থাৎ জাভা ও পিকিং মানবের দলে ফেলতে চান।

এই বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিভাগে নেয়ানডারটাল মানুষের স্থান কোথায়,
অর্থাৎ তার ল্যাটিন নামটা কি এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে তাকে 'হোমো'
গণনামটি দিতে কারও আপত্তি নেই, অর্থাৎ সে যে মানুষ সেই দাবি সে
করতে পারে—তা বলে আজকের মানুষের সঙ্গে এক পংক্তিতে তার আসন
নয় ; অধিকাংশ পণ্ডিত এখনও তাকে এক সম্পূর্ণ পৃথক প্রজাতির স্থান
দিয়ে থাকেন (হোমো নেয়ানডারটালেন্‌সিস) ; কিন্তু সম্প্রতি কেউ কেউ
তার বড় মগজের খাতিরে তাকে হোমো সেপিয়েন্‌স-এরই এক উপপ্রজাতি
বলে ধরেছেন, এবং আধুনিক মানুষের সঙ্গে চেহারার পার্থক্যটা বজায়
রাখতে এ যুগের লোককে আরও একটা উপাধিতে ভূষিত করে তার
নাম করেছেন হোমো সেপিয়েন্‌স সেপিয়েন্‌স। আগেই বলেছি যে এঁদের
মতে এ যাবৎ যত মানুষের চিহ্ন মিলেছে তারা আসলে মাত্র দুটি প্রজাতির
অন্তর্গত—হোমো ইরেক্‌টাস ও হোমো সেপিয়েন্‌স।

নাম যাই হক, এরা দেখতে কেমন ছিল, কি করত, কি ভাবত, কি শিখেছিল, প্রগতির পথে কতখানি এগিয়েছিল সে বিষয়েই আমাদের



১৪নং চিত্র
নেয়ানডারটাল মানব।

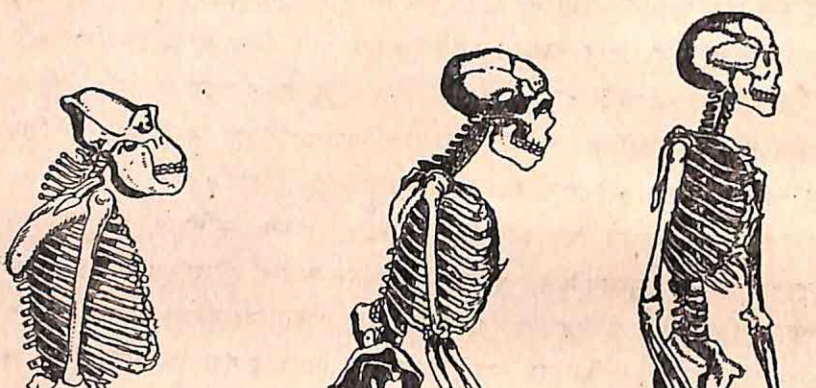
ঔৎসুক্য বেশী। নেয়ানডারটাল মানুষের সঙ্গে আমাদের জাতিগত সম্পর্ক যত নিকটই হক আসলে চেহারায় ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গে তার এতই বিশেষত্ব

ছিল যে একটি মাত্র দাঁত থেকে তাকে চেনা যায়। সেই কারণে সে ঠিক আমাদের সাক্ষাৎ পিতৃপুরুষ নয়, হয়তো মনুষ্য শাখার এক প্রশাখা, প্রকৃতির এক পরীক্ষা যা প্রতিযোগিতায় টি কতে পারল না। সবচেয়ে বিশেষত্ব দেখা যায় তার মাথার আকৃতিতে ; নিচু লম্বা তালু, তার পিছনটা চওড়া—এবং সবচেয়ে আশ্চর্য, খুলির মাপ আধুনিক মানুষের তুলনায় বড়, গড়ে ১৪৫০ সিসি : এক মধ্যবয়সী ব্যক্তির মাপ দাঁড়িয়েছে ১৬২৫ সিসি। তার মানে কি তার বুদ্ধি বেশী ছিল আমাদের চেয়ে ? এর উত্তরে মনে রাখা দরকার যে মস্তিষ্ক অতি জটিল বস্তু, তার যেমন একটা পরিমাণের দিক আছে তেমনি একটা গুণের দিকও আছে ; তার কতগুলি অংশ দৃষ্টি শ্রুতি স্পর্শ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়-বোধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, আবার কোনও অংশের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের ক্ষমতা বা বিচারবুদ্ধি। সুতরাং শুধু খুলির মাপ একমাত্র মাপকাঠি নয় বুদ্ধির। এমন অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে যে নেয়ানডারটাল খুলি এমন এমন অংশে টোল খাওয়া যেগুলি বিচারবুদ্ধির সঙ্গে জড়িত, সুতরাং মানুষটির চেতনা বা সংজ্ঞা প্রখর হলেও জ্ঞান খুব উঁচু দরের ছিল না—যার ফলে তার ব্যবহার সম্ভবত ছিল আনেকটা সাময়িক খেয়ালের বশবর্তী, খুব ভেবে চিন্তে কিছু করত না সে। কোনও কোনও পণ্ডিত কিন্তু তার এই অক্ষমতা স্বীকার করতে রাজী নন, তাঁরা বলেন যে মাথার চেহারার সঙ্গে বুদ্ধির কোনও সম্পর্ক নেই এবং নেয়ানডারটালদের বুদ্ধি আমাদের চেয়ে কোনও অংশে হীন ছিল না। মেধার পরিমাণ সম্পর্কে আর একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন কেউ যা আমাদের আত্মসম্মানের প্রতি আরও ক্ষতিকর : মগজের মাপে যে পুরামানবদের অনেকে আধুনিকদের হার মানায় তা আমরা আগেও দেখেছি, তার থেকে মনে হয় যেন ক্রমবিকাশের পথে মানুষের মগজ বাড়ে নি, বরং কমে এসেছে, এবং প্রকৃতি বর্তমান মাপে এসে থেমেছে হাজার পঞ্চাশেক বছর আগে, নেয়ানডারটালদের আধিপত্যের শেষে।

মানুষটির খুলির আকৃতির থেকে আরও তথ্য জানা গিয়েছে। বাক্-কেন্দ্রের বৃদ্ধি দেখে মনে হয় কোনও এক ধরনের প্রাথমিক ভাষা তার মুখে ফুটেছিল, যদিও বক্তব্যের মধ্যে বৈচিত্র্য বিশেষ কিছু ছিল না।

মস্তিষ্কের ডান দিকের তুলনায় বাঁ দিকটার বৃদ্ধি বেশী, তার মানে আমাদের মত ডান হাত দিয়েই সে বেশী কাজ করত।

মাথার বাইরেটা দেখলে ভক্তির পরিবর্তে ভয়ই জাগে। ঢালু কপাল, সামনে প্রসারিত প্রকাণ্ড হাড়ের নিচে চোখদুটি প্রায় ঢাকা পড়েছে, থুৎনি নামে মাত্র, পশুর মত বড় বড় দাঁত (যদিও তার তুলনায় আমাদেরই কুকুর-দাঁত বরং বনমানুষের বেশী কাছাকাছি), মাথাটা সামনের দিকে



১৫নং চিত্র

তিন কঙ্কাল ; ক, গরিলা ; খ, নেয়ানডারটাল মানব ; গ, আধুনিক মানব।

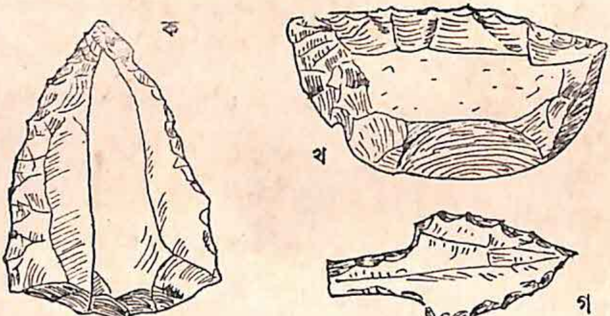
ঝুঁকে পড়েছে প্রায় কাঁধের সঙ্গে সমান হয়ে, ঘাড় বেঁকিয়ে সে আকাশের দিকে তাকাতে পারে না। পা দুটিও সোজা নয়, হাঁটুর কাছে বেঁকানো,

পায়ের পাতা সম্ভবত সোজা হয়ে মাটিতে বসে না ; দেহের ভার পড়ে তার বাইরের দিকটায়—যার ফলে পাতাদুটি আজকের শিশুদের মত একটুখানি ভিতর দিকে ভাঁজ করা। বস্তুত তার পারিপাট্যহীন অপটু হাঁটা দেখলে মনে পড়ে সদ্য-হাঁটতে-শেখা শিশুকে।* পায়ের আঙুল যে এ যুগের বয়স্ক ব্যক্তির তুলনায় বেশী সক্রিয় তাও মনে করিয়ে দেয় শিশু বা বানরকে। পক্ষান্তরে হাত দিয়ে কিছু ধরা তার পক্ষে আমাদের চেয়ে বেশী কষ্টসাধ্য, কারণ বুড়ো আঙুলের নড়াচড়ার ক্ষমতা কম। মানুষটির উচ্চতা পাঁচ ফুট মাত্র, কিন্তু এমন কথা মনে করবার কারণ নেই যে ক্ষমতায় সে ছিল দুর্বল বা অপটু। সে কালের সেই রুক্ষ নির্দয় জগতে, বন্য পশুর পাশাপাশি ও নিজেদের দলগত প্রতিযোগিতার মধ্যে বাস করে তা হলে হাজার হাজার বছর টিকে থাকা সম্ভব হত না।

একদা য়োরোপের প্রান্তরে উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়েছিল এই ছোটখাটো গাঁট্টাগোট্টা পশুপ্রায় নুয়ে-পড়া লোকের দল। তিন চারটি পরিবার একত্র হয়ে হয়তো সারি বেঁধে চলেছে আহার্য বা বাসস্থানের খোঁজে—কোথাও নদীর ধার ধরে, কোনও দেশে বরফ-জমা মাঠের উপর দিয়ে, বন জঙ্গল এড়িয়ে। শামুক বা পাখির ডিম পেলে তা ভেঙে মুখে পুরছে, কোথাও হাতের পাথরটা দিয়ে মাটি খুঁড়ে বার করছে কোনও সুস্বাদু মূল, আবার সুবিধা মত পাথর যা চোখে পড়ছে তা কুড়িয়ে নিচ্ছে সঙ্গে। তখনও গায়ে জামা নেই, রোমশ দেহ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত, তখনও আবহাওয়া অপেক্ষাকৃত উষ্ণ, চতুর্থ তুষার যুগ আসতে কয়েক হাজার বছর বাকি। তখনও বিশ্রাম বা ঘুমের জন্য তারা গুহা গহ্বরে আশ্রয় নেয় নি, হয়তো গাছের ডালপালা দিয়ে বানাত অস্থায়ী ঘর, ভুক্তাবশিষ্ট হাড়গোড় বা ব্যবহারের পাথর ইত্যাদি দেখে মনে হয় খোলা আকাশের নিচেও দিন কাটত তাদের। এই রকম অনেক ঘাঁটির চিহ্ন ও নেয়ানডারটাল মানুষের কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে রুশিয়ার ককেশাস ও ক্রাইমিয়া এলাকায় ও পশ্চিম এশিয়ায়, যার থেকে মনে হয় সে দিক থেকেই য়োরোপে তার প্রবেশ।

* অনেক বিশেষজ্ঞ নেয়ানডারটাল মানুষের ভঙ্গি এই রকম অনুমান করলেও মার্কিন নৃতত্ত্ববিদ অ্যাশ্‌লি মন্‌টেগু এমন মত প্রকাশ করেছেন যে এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল; সে নাকি সম্পূর্ণ খাড়া হয়ে চলত, ঘাড় ও পা দুইই ছিল আমাদের মত সোজা।

কি ছিল এদের জীবনযাত্রার চেহারাটা? বলা বাহুল্য, অন্নচিন্তাই সবচেয়ে প্রবল—যেমন আজকের দিনেও সব প্রাণীর এবং অধিকাংশ মানুষের। দিন কাটত আহার্যকে কেন্দ্র করে, তার পরেই হয়তো আশ্রয় ও আত্মরক্ষার চিন্তা। নেয়ানডারটাল মানুষের দাঁত দেখে কেউ কেউ মনে করেন যে সে ছিল প্রধানত নিরামিষাশী, হয়তো প্রথম দিকে বুনো ফল মূলই ছিল তার প্রধান খাদ্য ; হয়তো আবহাওয়ার পরিবর্তনের পরে তুষার যুগে এ ধরনের ভোজ্য কমে আসাতে তাকে মাংসাশী হতে হয়েছিল, শিকার ধরা যে খুব সহজ কাজ ছিল না তা বোঝা যায় তার অস্ত্র শস্ত্রের দিকে



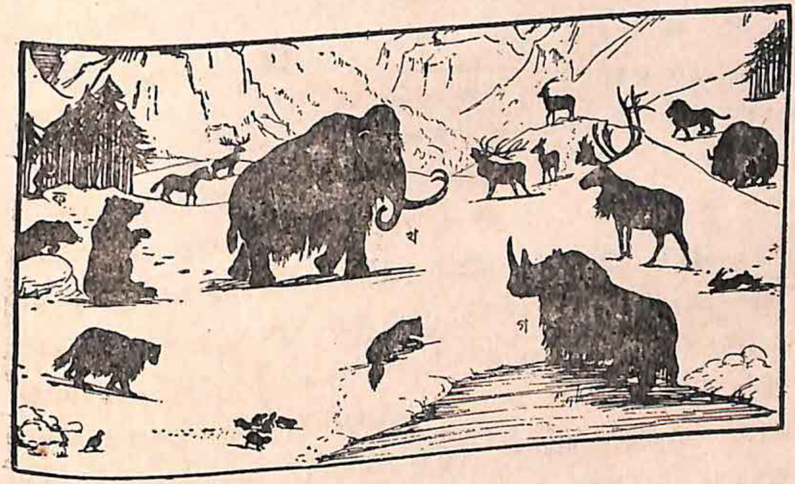
১৬নং চিত্র

নেয়ানডারটালদের হাতিয়ার (মুস্তেরীয় কৃষ্টি) ; ক, ছুরির মুখ ; খ, চাঁছনি ; গ, বর্শার ফলা।

তাকিয়ে ; আগের তুলনায় উন্নত হলেও তা মোটামুটি স্থূল ও সংখ্যায় অল্প—পাথরের কাটারি যার নাম দেওয়া হয়েছে হাতকুড়াল (অর্থাৎ তাতে হাতল নেই), পশুর চামড়া চেঁছে পরিষ্কার করবার জন্য চ্যাপটা ধারালো পাথর বা চাঁছনি, লাঠির মাথায় বসিয়ে ব্যবহারের জন্য চকমকি পাথরের তৈরি বর্শা-ফলকও এই সময়ে প্রথম দেখা যায়। এ ছাড়া কাঠের হাতিয়ারও ছিল নিশ্চয় যা এত দিনে পচে ক্ষয়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছে, হয়তো ভুক্ত জন্তুর হাড়ও অস্ত্র বা যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছে এরা, শেষের দিকে হাড়ের উপর কারিগরি দেখা যায়। ধনুর্বিদ্যার কোনও চিহ্ন নেই।

এক দিকে এই সামান্য ক'টি রুক্ষ হাতিয়ার, অন্যদিকে সে কালের জন্তু জানোয়ারও সহজে ধরা দেবার মত নয়। গুহাবাসী সিংহ, চিতা বা ভালুক

আত্মরক্ষায় বিশেষ দক্ষ, নানা জাতির হরিণ বা অন্য অহিংস্র প্রাণী পলায়নে অতিশয় তৎপর। শেষের দিকে শীত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর ও পূর্বাঞ্চল থেকে এসে পড়েছিল দলে দলে বল্‌গা-হরিণ আর তখনকার দিনের মোটা লোমওয়ালা গণ্ডার ও ম্যামথ। ভুক্তাবশেষ দেখে বোঝা যায় সে সময়ে বল্‌গা-হরিণই মানুষের প্রধান ভোক্ষ্য ছিল, কিন্তু বুনো ঘোড়া, গণ্ডার ও ম্যামথও যে সে খায় নি তা নয়। হয়তো অপেক্ষাকৃত ছোট ও অহিংস্র জন্তুদের অথবা শাবক বা বৃদ্ধ পশুদের সে কাবু করত অতর্কিত আক্রমণে, যখন তারা নদী পার হচ্ছে বা জল খেতে এসেছে। সম্ভবত অনেক সময়ে নিজের হাতে সে মারেই নি, পশুরা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করে মরেছে, সেই মৃতদেহ সে টেনে এনেছে গুহায়, অথবা হিংস্র জন্তুর শিকারে ভাগ বসিয়েছে; এই হিংস্র জন্তুদের মধ্যে সে কালের খড়্গদন্তী বাঘ তখনও বেঁচে ছিল। হয়তো নেয়ানডারটাল মানুষ বলের পরিবর্তে কৌশলই ব্যবহার করেছে বেশী, গর্ত খুঁড়ে বা ফাঁদ পেতে ধরেছে শিকার, বিশেষ করে অতিকায় জন্তুদের, যেমন



১৭নং চিত্র

নেয়ানডারটাল কালের প্রাণী; ক, মানুষ; খ, ম্যামথ; গ, পশমী গণ্ডার।

ধরে আজকের দিনেও অনেক জাতি। ফাঁদের কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ আজ নেই, কিন্তু ফ্রান্সের এক গুহাতে পাওয়া গিয়েছে কতগুলি গোলক, যা দেখে মনে পড়ে দক্ষিণ আমেরিকায় ব্যবহৃত বোলাস নামক এক রকম অস্ত্র;

দড়ির সঙ্গে কতগুলি ভারী জিনিস জুড়ে এটি তৈরি হয়, জন্তুর পায়ে ছুঁড়ে মারলে সে অচল হয়ে পড়ে।

আফ্রিকার পিগমিরা হাতি শিকারে আর একটি কৌশল ব্যবহার করে থাকে, কোনও কোনও নৃতত্ত্ববিদ মনে করেন নেয়ানডারটাল মানুষ হয়তো এই উপায়ে ম্যামথ মারত। তা যদি হয় তো ম্যামথের জন্য এরা ওৎ পেতে অপেক্ষা করত কোথাও, সে কাছে এলে একই সঙ্গে অনেকগুলি বর্শা এসে বিঁধত তার পেটে ; ম্যামথ তাতে মরত না, যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে করতে পালাত, শিকারীরাও ছুটত পিছনে পিছনে, দিনের পর দিন হয়তো, যত ক্ষণ না রক্তক্ষয়ে বা ঘায়ের বিষে জর্জরিত হয়ে অবশেষে ঘায়েল হত শত্রু।

যে উপায়ই ব্যবহার করে থাকুক নেয়ানডারটাল মানুষ, সে যে সামান্য কয়েকটি হাতিয়ারের সাহায্যে অতিকায় ম্যামথ আর রোমশ গণ্ডার মারতে পেরেছে তাতে আমরা দেখি বলের উপর বুদ্ধির জয়। সেই সঙ্গে প্রকাশ পাচ্ছে পারস্পরিক সহযোগিতা, অর্থাৎ অনেকের স্বার্থে গোষ্ঠী গঠন—যেই আবশ্যিক ভিত্তির উপর মানুষের সমাজ ক্রমে গড়ে উঠেছে আজ পর্যন্ত।

এই জন্তুদের রুক্ষ লম্বা লোমের ওভারকোটের নিচে ছিল ঘন পশমের এক স্তর। মেরুর বরফ যখন ক্রমেই নিচের দিকে নেমে আসছে তখনও এই রকম ডবল জামার নিচে ধারা বৃষ্টি বা হিম তুষার তুচ্ছ করে এরা পরমানন্দে ঘুরে বেড়াত, কিন্তু মানুষের অবস্থা ঠিক বিপরীত। দীর্ঘ রাত্রি, ঘন কুয়াশা, প্রবল বৃষ্টি ও বন্যা ক্রমে তাকে বাধ্য করলে খোলা জায়গা ছেড়ে গুহা গহ্বরে আশ্রয় খুঁজতে, যদিও কনকনে স্যাঁৎসেঁতে সে আশ্রয়ও খুব আরামদায়ক ছিল না। তা ছাড়া হিংস্র পশুরা আগের থেকেই সেখানে আড্ডা গেড়েছে, সুতরাং এই গৃহপ্রবেশের কাজটাও খুব সহজ হয় নি নিশ্চয়। এ সব সিংহ বা ভালুককে বার করে দিতে—ও বাইরে রাখতে—নিঃসন্দেহে মানুষের প্রধান সহায় ছিল তার পিতৃপুরুষের দান আগুন। এই দুঃখের দিনে আগুন যেমন হয়েছে আত্মরক্ষার অস্ত্র তেমনি যুগিয়েছে দেহের সুখ ও মনের স্বস্তিও, কারণ কড়া শীতের রাতে আগুনের পাশে ঘন হয়ে বসতে মানুষের ভাল লাগে, গল্প গুজবে মুখ খুলে যায়, আত্মীয়তা গাঢ় হয়। অবশ্য আগেই বলেছি বাক্‌শক্তি বলতে আমরা যা বুঝি নেয়ানডারটালদের তা ছিল না, তা বোঝা যায় তাদের চোয়ালের আকৃতির

থেকে, জিহ্বা-পেশীর সংযোগ এমন ছিল যে মুখ দিয়ে বেশী কথা বার হত না। তবু যত সামান্যই হক তাদের ভাষা, এরই সাহায্যে তারা কিছুটা জটিল ভাবের আদান প্রদান করেছে, নতুবা বোধ হয় সম্ভব হত না সংঘবদ্ধ শিকারের অভিযান, এবং আরও কিছু সামাজিক অনুষ্ঠান যার চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে এবং যার কথা একটু পরেই বলব।

ডারউইন বলেছিলেন যে ধারাবাহিক চিন্তার ক্ষমতা এসেছে মুখের কথার ফলে, শুধু ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির থেকে তা হতে পারত না; ভাষা শুধু ভাবনার বাহন মাত্র নয়, ভাষাই চিন্তাশক্তিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। মনে হয় বিভিন্ন কাজের সঙ্গতি ও নিয়ন্ত্রণের তাগিদেই এক দিন ভাষা ফুটতে বাধ্য হল। প্রথম শব্দগুলি হয়তো ছিল ক্রিয়াবোধক, পরে এসেছে বস্তু-বাচক কথা। এও নিঃসন্দেহ যে ভাষার ফলে মস্তিষ্কেরও উন্নতি ঘটেছে।

এই সময়েই বোধ হয় মানুষ প্রগতির পথে আরও এক পা বাড়িয়েছে দেহ আচ্ছাদন করে শীত নিবারণের উপায় শিখে। (অবশ্য জংলী অঞ্চলে শিকার তাড়া করে বেড়াবার সময়ে দেহের ক্ষত বাঁচাতেও পরিধেয়ের উদ্ভব হয়ে থাকতে পারে। যাই হক, সজ্জা ও লজ্জার ধারণা অনেক পরে জন্ম নিয়েছে মানুষের মনে।) আচ্ছাদন অবশ্য আর কিছুই নয়—আহার্যের জন্য নিহত পশুর চামড়া, চামড়া চেঁছে পরিষ্কার করবার উপযুক্ত পাথুরে অস্ত্র মেলে এদের ঘাঁটিতে। শিকারের পরে সেখানে বসেই আহার শেষ করত না সে পূর্ব-পুরুষদের মত—হয়তো বাইরে শীত অসহ্য ছিল বলে; কিন্তু ঘরেও তা বলে সমস্ত লাশটা সে টেনে আনত না—ঠ্যাং বা কাঁধের হাড়ের তুলনায় গুহাতে পাঁজর বা মেরুদণ্ডের হাড় খুব কম, অর্থাৎ মুখরোচক অংশগুলিই সে বেছে নিয়ে আসত। কাঁচা ও রান্না মাংস দুইই খেয়েছে সে, হাড় চিরে মজ্জাটুকু, খুলি ফাটিয়ে মেধাটুকু খেতে যে খুব ভালবাসত তারও প্রমাণ সে রেখে গিয়েছে। এবং ইটালি ও যুগোস্লাভিয়ায় প্রাপ্ত কোনও কোনও খুলি দেখে মনে হয় শেষের দিকে সে মানুষের মগজও খেয়েছে পিকিং মানবের মত।

পুরাপ্রস্তর যুগের মানুষকে প্রায়ই গুহা-মানব বলা হয়, কিন্তু যখন সম্ভব হয়েছে তখন বাইরে বাইরেই সে থেকেছে—গুহাতে তার চিহ্ন অনেকটা অক্ষত থেকে গিয়েছে বলেই সে দিকে আমাদের নজরটা পড়েছে বেশী। তুষার যুগ আসবার আগে নেয়ানডারটালরা হয়তো শীত কালে বাধ্য হয়ে

গুহায় আশ্রয় নিয়েছে, গরম পড়লেই ঐ স্যাঁৎসেতে আশ্রয় ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে আবার। এদের কঙ্কালের হাড়ে অনেক সময়ে এমন রোগের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে অত্যধিক ভিজে জায়গায় বাসের ফলে যা ধরে থাকে মানুষকে। রোগ ও জীবন সংগ্রামের তাড়নায় বেশী দিন বাঁচত না এরা।

নেয়ানডারটাল সমাজের সবচেয়ে বড় যা বৈশিষ্ট্য তা এই কঙ্কালের প্রসঙ্গেই উল্লেযোগ্য। এদের দেহাবশেষ যে এত জায়গায় পাওয়া গিয়েছে তার একটা কারণ যে কবর প্রথা এরাই প্রথম স্থচনা করে। অন্তত কোনও কোনও দেহকে যে সযত্নে ও বিশেষ ভঙ্গিতে সমাধিস্থ করা হয়েছিল তার অনেক প্রমাণ আছে। ফ্রান্সের লা শাপেল অঞ্চলে এক অগভীর কবরে খুব স্থরক্ষিত এক কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে ; মানুষটি শুয়ে আছে ডান হাতে মাথা রেখে, হাঁটু দুটি ভাঁজ করা, বাঁ হাতের আওতার মধ্যে পাথরের খণ্ড, আহারের মাংস ইত্যাদি ; এ ছাড়া পাশে সাজানো বারোটি ঝিনুক জাতীয় বস্তু, তখনকার দিনে যা বহুমূল্য। এই ধরনের কবর আরও কয়েকটি পাওয়া গিয়েছে, মাথার নিচে কখনও পাথরের বালিশ, তা ছাড়া পাশে ও উপরে পাথরের পাটা দিয়ে দেহকে বাঁচানো হয়েছে মাটির চাপ থেকে ; কবর খোঁড়া হয়েছে গুহাস্থিত চুলার কাছাকাছি—আগুনের তাপে হিম-শীতল শবে প্রাণসঞ্চারের ব্যর্থ প্রয়াস হয়তো ছিল এই প্রথার মধ্যে। ১৯২১ সালে সাত আট বছর বয়সের এক শিশুর কঙ্কাল মেলে এক ত্রিকোণ কবরে—এক কোণে ধড়, আর এক কোণে মাথা ; অনেক পরে পুরাপ্রস্তর যুগের শেষ ভাগে মাথা কেটে আলাদা গোর দেওয়ার এক রীতি প্রচলিত ছিল সম্পূর্ণ অন্য মানুষের সমাজে, এইখানে তার স্থচনা কিনা কে জানে! সে যাই হক, নেয়ানডারটালদের সময় থেকে আজ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন চলে এসেছে আনুষ্ঠানিক সমাধির যোগসূত্রটা, অনুষ্ঠান-রীতির কিছু পরিবর্তন হয়েছে মাত্র ; আজ আমরা মৃতদেহের উদ্দেশ্যে ফুল অর্পণ করি, তারা দান করেছে কড়ি বা ঝিনুক—তা যদি আমরা ভক্তি ও ভালবাসার অভিব্যক্তি বলে ধরি তো প্রেরণাটি প্রায় লক্ষ বছর পুরনো।

এই কবর প্রথার স্থষ্টি প্রত্নতত্ত্বের দিক থেকে খুব সৌভাগ্যের কথা। বুদ্ধিমান মানুষ জলে ডুবে বা ফসিল রাখবার মত অন্য দুর্দৈবে পড়ে বড়

একটা মরে নি, সুতরাং কবর মস্ত বড় নির্ভর। এরই ফলে নেয়ানডারটাল মানুষের চেহারা থেকে আরম্ভ করে উত্তরকালীন মানুষের আচার ব্যবহার সমাজ সম্বন্ধে এত কিছু জানতে পারা গিয়েছে আজ; কারণ কবর শুধু দেহ রাখবার স্থানই নয়, ইতিহাসের প্রতি যুগেই আহার্য ব্যবহার্য ও পরলোকের সহায়ক বিবিধ উপকরণ মৃতের সুখ সুবিধার জন্য সযত্নে সাজিয়ে রাখা হয়েছে সেখানে। পুরাকালের পরদা উন্মোচনে এ সবের গুরুত্ব যে কতখানি তা পরবর্তী দিনের ইতিহাসে আরও বিশদ ভাবে প্রকাশ পায়। এ দেশেও প্রাচীন কালে আর্যদের মধ্যে কবর প্রথা প্রচলিত ছিল, পরে কাঠের প্রাচুর্য দেখে তারা দাহ প্রথা গ্রহণ করে। তখনও কিন্তু দগ্ধ অস্থি মাটিতে নিহিত করা হত, সেই জায়গাকে বলা হত শ্মশান, শ্মশান মানে যেখানে শব শুয়ে থাকে—সুতরাং এই শব্দটির মধ্যেও কবর প্রথার ইঙ্গিত রয়েছে।

এ সব অবশ্য অনেক পরের কথা, কিন্তু নেয়ানডারটাল কালেই যে মৃতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তার সূচনা হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। শবের সঙ্গে জিনিস যা দিয়েছে তারা তা সম্ভবত অন্য জগতে ব্যবহারের জন্য; কিন্তু এমনও হতে পারে যে তখনও মানুষ মৃত্যুকে সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে নি, ভেবেছে তা দীর্ঘ ঘুম মাত্র—আবার প্রিয় ব্যক্তি জেগে উঠবে, তখন দরকার হবে খাবার দাবার, অস্ত্রশস্ত্র, নিজস্ব সেই কাটারি পাথরটি।

ঝিনুক বা ঐ ধরনের জলজ খোলকের কি যে সাংকেতিক অর্থ ছিল এদের মনে কে জানে। কড়ির সঙ্গে যোনির সাদৃশ্য লক্ষ করে বলা হয়েছে তা ছিল উর্বরতা বা সন্তান সম্ভাবনার প্রতীক। কোনও রকম রক্ষাকবচ বা মৃতসঞ্জীবনীও তা হয়ে থাকতে পারে। অর্থ যাই হক, দূর দূরান্তর পর্যন্ত ও সব জিনিস যে তারা সঙ্গে করে নিয়ে বেড়িয়েছে তাতে মনে হয় বিশ্বাসটা খুব দৃঢ় ছিল।

এই কি ধর্মবিশ্বাসের প্রথম ক্ষীণ সূচনা? কিন্তু এই প্রসঙ্গে এর চেয়েও চমৎকারী সাক্ষ্য আছে। য়োরোপের কোনও কোনও অঞ্চলে ভালুকের খুলি ও অন্যান্য হাড় পাওয়া গিয়েছে যত্নে সাজানো অবস্থায়। বর্তমান সুইৎসার্লাণ্ডের নেয়ানডারটালরা কতগুলি সিন্ধুক বানিয়েছিল পাথর সাজিয়ে, তার মধ্যে খুলি বসিয়ে রেখেছে সব একই দিকে মুখ করে। অসট্রিয়ার এক জায়গায় চুয়ান্নটি পায়ের-হাড় ঠিক এমনি সাজানো দেখা

দেখা যায়, আর এক গুহায় আবিষ্কৃত হয়েছে বিয়াল্লিশটি খুলি ও কয়েকটি ঊরুর হাড়। জার্মেনিতেও পাওয়া গিয়েছে সঞ্চিত হাড়। আজকের জগতেও সাইবেরিয়া ও উত্তর জাপানে এমন সম্প্রদায় দেখা যায় যাদের জীবনে ও ধর্মবিশ্বাসে ভালুকের স্থান প্রধান—এই সংস্কারের উদ্ভব মানুষের সঙ্গে ঐ প্রাণীর সাদৃশ্যের থেকে। এই জাপানীদের নাম আইনু, এরা চেহারায় পশ্চিম য়োরোপীয়দের মত। ভালুকের খুলি এরা ঘরের বাইরে পুব দিকে মুখ করে বসায়, পূজার উদ্দেশ্যে। এদের বিশ্বাস যে শিকারের পরে ভালুকের খুলিটি যত্নে রক্ষা করলে নিহত প্রাণীর কোনও অনিষ্ট আর হয় না। উপরন্ত তার আত্মা তুষ্ট হয়ে আরও ভালুক জুটিয়ে দেয় শিকারীকে। অবশ্য নেয়ানডারটাল মানুষ যে ঠিক এই ধরনের কুহকে বিশ্বাস করত এমন কথা মনে করা নিশ্চয় কল্পনার আতিশয্য হবে, কিন্তু কোনও একটা জাদু যে সেই প্রাথমিক মনকে আশ্রয় করেছিল, তার ব্যবহারিক জীবনযাত্রায় স্থান পেয়েছিল, এটাই আশ্চর্য।

আর এমন যদি হয় যে কোনও রকম অনৈসর্গিক বা অতিলৌকিক শক্তির ধারণা তখনই মানুষের মনে উঁকি দিয়েছে এবং ঐ খুলি ও হাড় তার বা তাদের তুষ্টি ক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত, তবে তা আরও বিস্ময়কর। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে প্রকৃতির নানাবিধ আকস্মিক ও ভয়াবহ খেয়াল বুঝতে না পেরে মানুষ প্রথমে শুধু আতঙ্কিতই হয়েছে হীনতর প্রাণীদের মত। কিন্তু ক্রমে ঝড় বিদ্যুৎ মেঘ গর্জনের আড়ালে কি সব অদৃশ্য কিন্তু সচেতন শক্তি সে অনুমান করেছে, বজ্রপাতের সময়ে তার কল্পনায় দেবতারা ডেকে উঠেছে থরথরিয়ে কেঁপে; হঠাৎ যে আকাশটা কালো হয়ে এল, তীব্র আলোয় চোখ ঝল্‌সে দিয়ে ভয়ংকর গর্জন করে উঠল, তার পর গাছপালা ভেঙে অবিশ্রান্ত উন্মাদ জলঝাপটায় মানুষ ও পশুকে ব্যস্ত, উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলল এ কোনও দুষ্ট দানব বা রুষ্ট দেবতার কাজ। এদের তুষ্ট করার সম্ভাবনা ক্রমে মনে জেগেছে, সাংকেতিক দ্রব্য আর তুকতাক দিয়ে। আরও পরে এই আশ্চর্য শক্তিরা এক এক দেবতার রূপ নিয়ে দানা বেঁধেছে মানুষের মনে, তাদের স্তুতির মন্ত্র ও অনুষ্ঠান যুগে যুগে জটিলতর হয়ে উঠেছে, এর দৃষ্টান্ত পরে আমরা আরও দেখব। এমনি কোন্ অস্পষ্ট অতীতে, হয়তো লক্ষাধিক বছরের ও পারে নিহিত আমাদের পরিচিত অনেক প্রাকৃতিক

দেবতার (nature gods) অঙ্কুর। ঋগ্‌বেদের ঋষিরা স্তব গেয়েছেন অনন্ত আকাশের দেবতারূপ বিশ্বপিতা দ্যৌস্পিতার, ইনিই গ্রীসীয়দের দেবপতি জ্রিউস, যার রোমীয় নামান্তর জুপিটার; আর্যরা সূর্যের উপাসনা করেছে ভারতে মিত্র নাম দিয়ে, ইরানে মিথ্র; মেঘ বৃষ্টির কর্তা ইন্দ্র বেদের প্রধান দেবতা। এই প্রসঙ্গে জনৈক বাঙালী লেখক মন্তব্য করেছেন, "অধিকাংশ দেবতার কল্পনাই উদ্ভূত হইয়াছে প্রাকৃতিক লীলার অনুভূতি হইতে।" এবং দেশে দেশে প্রাগৈতিহাসিক দেবতারা প্রায় সবই প্রাকৃতিক দেবতা। (আমাদের শিব দুর্গা প্রভৃতি অ-প্রাকৃতিক দেবতা বৈদিক নয়, পৌরাণিক—অনেক পরের সৃষ্টি।) ঈশ্বরবাদ ঐতিহাসিক কালের ঘটনা হলেও এরও উদ্ভব প্রকৃত পক্ষে ঐ প্রাকৃতিক অনুভূতির মধ্যেই এমন কথাও হয়তো অনেকে বলবে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে ডস্‌টয়েভস্কি রচিত এক উপন্যাসের কয়েকটি কথা; ঐ ভাবটি প্রকাশ করতে গল্পের এক ব্যক্তি সংক্ষেপে বলেছিল, "ঈশ্বরের সংস্কার এসেছে বজ্র বিদ্যুৎ থেকে।" ব্যক্তিটি এক আধুনিকা তরুণী, যাকে বলে 'আলোকপ্রাপ্তা'।

মানুষকে এ জীবন সম্বন্ধে প্রথম ভাবতে বাধ্য করেছে এ জীবনেরই অবসান—মৃত্যু। এই দুর্বোধ্য রহস্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে বিস্মিত বিহ্বল উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছে, চেতনার গভীরে হঠাৎ অনুভব করেছে পরিচিত দিনগত ভাবনা চিন্তার বাইরে আহার আশ্রয় ক্ষুধা নিদ্রার অতিরিক্ত অন্য কিছুর অস্পষ্ট আভাস। মৃতের স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলা পশুদের মত অত সহজ হয় নি, কারণ স্বপ্নে তারা বার বার ফিরে ফিরে এসেছে (যেমন এখনও আসে)। শুভ এবং অশুভ আত্মা বা ভূত প্রেতে বিশ্বাস হয়তো এরই থেকে উদ্ভূত। এদের এড়াবার উদ্দেশ্যেই হয়তো মৃতের অন্ত্যেষ্টির বিভিন্ন ব্যবস্থা—মাটির নিচে চাপা দিয়ে, পুড়িয়ে বা অন্য ভাবে ধ্বংস করে, কিংবা শুধু মাথাটি বিচ্ছিন্ন করে। প্রথমে সামান্য কড়ির থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী যুগে যে বহুমূল্য বস্তু সব রাখা হয়েছে কবরে তাও হয়তো এদের তোষণ করে দূরে রাখবার জন্যই। এই সব অবোধ্য ভীতিকর অতিলৌকিক শক্তির ভাবনা মানুষের মনে ঢুকেছে তার দেহের রোগ জ্বালার থেকেও। একটা সুস্থ মানুষ যে হঠাৎ জ্বরে কাঁপতে কাঁপতে শুয়ে পড়ল তা নিশ্চয় কোনও অপদেবতার কাজ, নয়তো দেবতার রোষের ফল। সে

কালের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার মধ্যে কতখানি ভয় আর কতখানি মমতা এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া সহজ নয় ; এ কালের শান্তি স্বস্ত্যয়ন ব্যবস্থার মূলেও ভয়ের চিহ্ন আছে।

মৃত্যুর দর্শনে পশুও ক্ষণ কালের জন্য বিহ্বল হয়, কিন্তু মানুষের উন্নত মস্তিষ্ক মৃত্যুকে অত সহজে ভুলতে পারে নি। জীবন যে অনিত্য, মৃত্যু যে অবশ্যম্ভাবী ও সর্বনাশী তা মেনে নেওয়া তার কাছে অসহ্য মনে হয়েছে। এই ভয়ংকর বস্তুটাকে জয় করবার জন্যই সম্ভবত জীবাত্মার পরিকল্পনা—এমন একটা কিছু যা বিনষ্ট হয় না, যা মৃত্যুর অতীত। কোন্ অতীতের এই বিশ্বাস আজ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ, আজও অধিকাংশ মানুষ অবিনশ্বর আত্মায় বিশ্বাসী, এবং তারই পরিণতি স্বরূপ জন্মান্তরবাদ অনেকের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত।

মানুষের মনে ধর্ম দর্শনের সূচনা ও প্রাথমিক অভিব্যক্তি সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হল এখানে, তার অর্থ এ নয় যে নেয়ানডারটাল যুগেই এই ধারার সূত্রপাত। সে সময়ের যা সাক্ষ্য তা অপেক্ষাকৃত সামান্য। কিন্তু ভালুকের খুলি বা কড়ির পিছনে শিকারের জাদু ও দেবতার পূজা যাই থেকে থাক, নেয়ানডারটাল মানুষ যে একটা কিছু বিশ্বাস বা মতবাদ—যাকে বলে ideology—আশ্রয় করেছিল জীবনে, সে যে প্রত্যক্ষ, স্পষ্ট ও ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যের সংকীর্ণ গণ্ডিটা অতিক্রম করেছিল অল্প মাত্রায় হলেও, এই চিন্তাই আমাদের মুগ্ধ করে। কোনও কোনও ঘাঁটিতে ম্যাংগানিজ্র ডাইঅক্সাইডের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে, তার থেকে মনে হয় হয়তো ঐ লাল রং দেহে মাখত তারা। কড়ির মত এরও কোনও সাংকেতিক অর্থ থাকা সম্ভব। আর যদি এমন হয় যে দুইই অলংকার মাত্র, তবু এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে মানুষ এমন জিনিসের প্রতি মন দিতে আরম্ভ করেছিল যার কোনও প্রত্যক্ষ বাবহারিক সার্থকতা নেই। এ সব বস্তুর ব্যবহার প্রকৃত মনুষ্যত্বের নির্ভুল নিশানা—বানর বা বনমানুষ যত চালাকই হক কখনও কড়ি দিয়ে ঘর সাজাবে না।

নেয়ানডারটাল মানুষের এই বিশেষত্বের প্রতি লক্ষ রাখলে, মৃতের প্রতি তার যত্ন মমতার চিহ্ন দেখলে আমাদের আপন জন বলে তাকে ভাবতে কষ্ট হয় না। কিন্তু আসলে ক্রমবিকাশ-তরুর যে শাখাটি আশ্রয় করে তার অভিব্যক্তি ঘটেছিল সেটি হঠাৎ মরে গেল, দেখা দিল নতুন মানুষ, খাঁটি

মানুষ—বিয়োগান্ত নাটকের এই শেষ অঙ্কের সূচনা হয়তো আজ ৫০,-৬০,০০০ বছর আগের কথা। এক দিকে ক্রমশ শীত বাড়ছে, গাছ পালা কমে আসছে, রেখে যাচ্ছে প্রান্তর আর জলাভূমি, গুহা গহ্বরে সব লোকের জায়গা হচ্ছে না আর, খোলা মাঠে ঠাণ্ডায় মরছে অনেকে, নির্দয় প্রতিকূল জগতে শিকার ধরা, ধরে তার থেকে সকলের উদর পূর্তি ক্রমেই কঠিন হয়ে আসছে—অন্য দিকে পুব দিক থেকে দলের পর দল আসছে এক নতুন মানুষ, উন্নত মানুষ, তাদের ধরন ধারণ আলাদা, চেহারায় তারা সম্পূর্ণ বিজাতীয় ; এই দুই সংকটের মধ্যে পড়ে, লক্ষাধিক বছরের একচ্ছত্র আধিপত্যের পরে, বেচারা নেয়ানডারটাল মানুষ অতি দুঃখে দেখতে দেখতে পৃথিবীর থেকে একেবারে বিদায় নিল।

কিন্তু এ হল সনাতন ধারণা। নেয়ানডারটাল মানুষের বিলুপ্তি সম্বন্ধেও মতবিরোধ আছে, যেমন আছে তার চেহারা ও বুদ্ধি সম্বন্ধে। কেউ কেউ বলেন অত নাটকীয় ভাবে সে বিদায় নেয় নি পৃথিবীর লীলামঞ্চ থেকে, পরবর্তী মানবের সঙ্গে মিশ্রিত হতে হতে ক্রমে তার পৃথক সত্ত্বা হারিয়ে ফেলেছে ; অর্থাৎ কবি টি এস এলিয়টের বহু-উদ্ধৃত কথায় বলতে গেলে তার শেষ (?) হয়েছে "not with a bang but a whimper"। তৃতীয় সম্ভাবনা অনুসারে সে আমাদের সাক্ষাৎ ও একমাত্র পূর্বপুরুষ। এই সব মতবাদের স্বপক্ষে যুক্তি যা আছে তার আলোচনা পরে হবে খাঁটি মানুষের প্রসঙ্গে।

৮। পিল্‌টডাউন মানব : বৈজ্ঞানিক জালিয়াতি

প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে অধিকাংশ বইতে এখনও আর একটি প্রাচীন মানুষের নাম পাওয়া যাবে যার আসলে ওখানে কোনও স্থান নেই। লোকটি পিল্‌টডাউন মানব নামে বিখ্যাত—সম্প্রতি কুখ্যাত, যে দিন থেকে প্রমাণ হয়েছে যে আসলে সে সম্পূর্ণ কাল্পনিক, এক সুচতুর জালিয়াতির থেকে তার জন্ম। এই বইগুলিতে এর সম্বন্ধে পণ্ডিতদের চুলচেরা আলোচনা ও সুগম্ভীর মন্তব্য পড়লে এখন হয়তো হাসি পায়, কিন্তু এও মনে রাখা দরকার যে তাঁরা কেউ এই ব্যক্তিকে সহজে মানতে পারেন নি, নৃতত্ত্বজ্ঞের চোখে মানুষটির মধ্যে অসঙ্গতি ছিল অনেক—যদিও সেই কারণে তার অস্তিত্বে তাঁরা সন্দেহ করেন নি কখনও, বরং বিরুদ্ধ সাক্ষ্যের মধ্যে সাযুজ্য আনতেই ব্যস্ত ছিলেন। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের এই মনোভাব ও এত উত্তেজনার একটা কারণ বোধ হয় এই যে য়োরোপে এত পুরনো মানুষ আর পাওয়া যায় নি।

পিল্‌টডাউন মানবের অভ্যুত্থান ও তিরোধানের রোমাঞ্চকর কাহিনী এখানে বলা যেতে পারে সংক্ষেপে। বৈজ্ঞানিক কাজে সন্দেহের দাম যে কত বেশী, এবং দরকার হলে বিজ্ঞানীদেরও যে গোয়েন্দাগিরি করতে হতে পারে তা দেখা যাবে এই গল্পে।

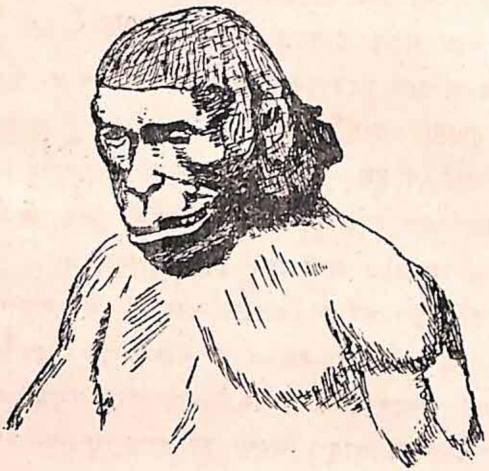
১৯০৮ সালে ইংলণ্ডের সাসেক্স প্রদেশে পিল্‌টডাউনের কাছে গ্রামের রাস্তা ধরে হেঁটে চলেছেন জনৈক ব্যক্তি, নাম চার্লস ডসন, আইনের ব্যবসায়ী, কিন্তু পুরাতত্ত্বে ও নৃতত্ত্বে গভীর উৎসাহ। চলতে চলতে তাঁর নজরে পড়ল

যে রাস্তাটি মেরামত হচ্ছে বাদামী রঙের এক পাথর দিয়ে যা সাধারণত সেই অঞ্চলে পাওয়া যায় না। খোঁজ নিয়ে জানলেন যে কাছেরই এক নুড়ি-কূপ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে পাথর। মানচিত্র অনুসারে ওখানে ও ধরনের কিছু নেই জেনে ডসন তাড়াতাড়ি সে জায়গায় গিয়ে মজুরদের বলে এলেন ফসিলের প্রতি কড়া নজর রাখতে। এবং এমনই ভাগ্য যে কয়েক দিন পরে তিনি যখন আবার খবর নিতে এলেন তখন এক জন তাঁর হাতে তুলে দিল অসাধারণ মোটা এক খুলির টুকরো।

ডসনের উৎসাহ বাড়ল। তিনি বারে বারে সেখানে ফিরে এসে এক মাথা থেকে আর এক মাথা ভাল করে খুঁজলেন, কিন্তু তখনকার মত আর কিছু পেলেন না, মজুররাও আর কিছু দিতে পারল না। এর তিন বছর পরে সেখানে একটি স্তূপ পরীক্ষা করতে করতে তিনি পেলেন সেই মুণ্ডেরই কপালের এক অংশ, তখন সব হাড় এক সঙ্গে নিয়ে গেলেন ব্রিটিশ মিউজিয়ামের এক বিশেষজ্ঞের কাছে। দু জনে মিলে আবার লোক লাগালেন খুঁজতে, ক্রমে আরও অংশ বার হতে লাগল—মাথার উপরের ও পিছনের খণ্ড, ডসন নিজে আবিষ্কার করলেন চোয়ালের অর্ধেক। পিল্ট-ডাউন মানুষ দ্রুত গড়ে উঠল, ১৯১২ সালে প্রকাশিত হল তার বিস্তৃত বিবরণ। সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হল তুমুল বাক্ বিতণ্ডা।

বিতর্কের প্রধান কারণ এই যে মাথার ও চোয়ালের বয়স মেলে না। যে পাথরে পাওয়া গিয়েছিল হাড়গুলি তা আদি প্লাইস্টোসিন যুগের, কিন্তু খুলির আকৃতি প্রকৃতি মেলে বেশ উন্নত জাতির মানুষের সঙ্গে, আর চোয়ালটা প্রায় অবিকল বনমানুষের। কেউ কেউ বললেন এই দুই অংশ এসেছে দুটি বিভিন্ন প্রাণীর থেকে, কিন্তু অনেক বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এ মত গ্রাহ্য করলেন না; এঁদের যুক্তি এই যে খুলি এবং চোয়াল মাত্র কয়েক গজের মধ্যে পাওয়া গিয়েছে, আর এরই মধ্যে যার খুলি তার চোয়াল হারিয়ে গেল আর যার চেয়াল তার ঠিক খুলিটাই পাওয়া গেল না এমন সম্ভাবনা খুবই কম; এ এক নতুন জাতের মিশ্র মানব, চোখের উপর যখন দেখা যাচ্ছে তখন একে না মেনে উপায় নেই। অনেকেই একে স্বীকার করলেন প্রায় প্রাচীনতম মানুষ বলে, তাই নাম দেওয়া হল উষা-মানব (ইওআনথ্রপাস)।

আশ্চর্যের কথা এই যে এর মধ্যে যে ইচ্ছাকৃত প্রবঞ্চনা থাকতে পারে এই তৃতীয় সম্ভাবনার কথা কেউ এক বারও ভাবলেন না। এমন একটি গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে চালাকির খেলা পণ্ডিতদের কল্পনারও বাইরে ছিল।



১৮নং চিত্র

পিল্‌টডাউন মানবের কল্পিত মূর্তি।

১৯১৫ সালে সব তর্কের প্রায় মীমাংসা হয়ে গেল ডসনের নতুন আবিষ্কারে। সেই জায়গারই দু মাইল দূরে তিনি পেলেন আর একটি উষা-মানবের খুলি-খণ্ড এবং নিচের পাটির এক মাড়ি-দাঁত ; দুইই হুবহু আগের হাড়গুলির মত। এ বার অনেক অবিশ্বাসীর মনই টলতে আরম্ভ করল। পিল্‌টডাউন রহস্যের প্রকৃত সমাধান হওয়ার আগে লেখা এক বইতে দেখা যায় এই মন্তব্য: "কিছু দিন আগেও অনেক বিজ্ঞানী ঐ চোয়ালকে শিমপানজি বা অন্য কোনও বানরের অংশ বলে ভাবতেন, কিন্তু পিকিং মানব প্রমাণ করেছে যে মানুষেয় চোয়ালও থুৎনিবিহীন হতে পারে ; এর থেকে এই মতই প্রতিষ্ঠিত হয় যে পিল্‌টডাউনের চোয়াল ও মাথা মানুষেরই অঙ্গ ও একই মানুষের অঙ্গ।"

ব্যাপারটা ঐখানেই চুকে যেতে পারত। অন্যান্য পুরামানবের মত উষা-মানবের নামও প্রাগিতিহাসের পাতায় পাকা হতে পারত, যদি না

সৌভাগ্যক্রমে তখনও সন্দেহ থাকত জন কয়েক বিশেষজ্ঞের মনে, বিশেষত অতলান্তিকের ও পারে যুক্তরাষ্ট্রে। আগে যে তৃতীয় সম্ভাবনার উল্লেখ করেছি শেষ পর্যন্ত একদা কাগজে কলমে তা খোলাখুলি উথাপন করা হল, বলা হল শিম্পানজি বা ওরাং-ওটাঙের হাড় দিয়ে ধাপ্পাবাজি খেলেছে কেউ। এ মতবাদের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন অক্‌সফোর্ডের ডকটর ওআইনার। তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা ১৯৫৩ সালে এক নিবন্ধে প্রকাশ করলেন তাঁদের রাসায়নিক ও অন্যান্য পরীক্ষার ফলাফল যাতে নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয় জালিয়াতি। (ইতিমধ্যে ডসন মারা গিয়েছেন ১৯১৬ সালে।) তাঁরা বললেন চোয়াল সংগ্রহ করা হয়েছে বিশেষ যত্নে খুলির সঙ্গে মিলিয়ে, খুলিও জাল, এবং পরে দু মাইল দূরে যে খুলির টুকরো ও দাঁত পাওয়া গিয়েছিল তাও আগে আবিষ্কৃত হাড়েরই অংশ, পরে ইচ্ছা করে সেখানে রাখা হয়েছে বিজ্ঞানীদের দোলায়মান মন থেকে সংশয় একেবারে দূর করতে। পিল্‌ট-ডাউন মানব যে সম্পূর্ণ কাল্পনিক এ সম্বন্ধে আজ কারও মনে আর কোনও সন্দেহ নেই। সম্প্রতি তেজী-কারবন মেপে খুলি ও চোয়ালের বয়স বেরিয়েছে যথাক্রমে ৬২০ ও ৫০০ বছর। চোয়ালটি যে এক ওরাং-ওটাঙের তা এর আগেই প্রমাণিত হয়েছে। দুটি খণ্ডই কৃত্রিম উপায়ে রং করা হয়েছিল।

উপরোক্ত নিবন্ধের দু বছর পরে ডকটর ওআইনার এ সম্বন্ধে একখানি বই প্রকাশ করে তাতে খোলাখুলি মন্তব্য করেছিলেন যে এই অবিশ্বাস্য প্রবঞ্চনা যে ডসনেরই কাজ তাতে তিনি নিঃসন্দেহ। এমন মতও শোনা যায় যে তাঁর সাময়িক মতিভ্রম হয়েছিল, অথবা তিনি না জেনে অন্যের প্রবঞ্চনার ফাঁদে পা দিয়েছেন। এ অভিযোগ সত্য হক আর নাই হক, কাজটা যে করেছে তার যে নৃতত্ত্ব ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান ছিল, সে যে পরিকল্পনাটি গড়ে তুলতে ও তা কাজে পরিণত করতে অনেক সময় খরচ করেছে, অনেক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু কি সে পেতে চেয়েছিল এর থেকে এই জিজ্ঞাসা থেকে যায়। যদি উদ্দেশ্য হয় নিজের নামটি স্মরণীয় করা তো আবিষ্কর্তা হিসাবে বইয়ের পাতায় যে বেঁচে থাকত সে হল ডসন। অজ্ঞাত ব্যক্তিটি হয়তো নিজে নাম কিনতে চায় নি, চেয়েছিল য়োরোপের নাম, আদি মানবের জন্মভূমি হিসাবে এশিয়া

আফ্রিকার পাশে তার স্থান। অবশ্য সমাজের সর্বত্রই এমন লোকও আছে যারা পণ্ডিতদের বোকা বানাতে পারলেই খুশী, নিজের ঘরে একলা বসে হাসে এই সব অজ্ঞাত রসিকরা।

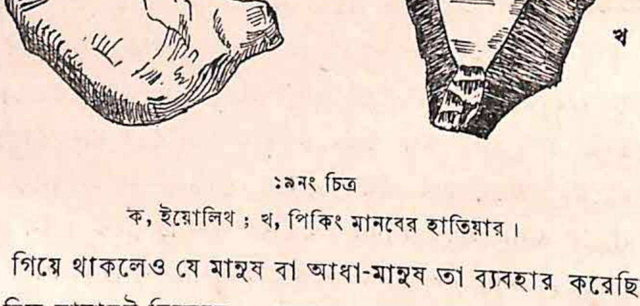
৯। অক্ষয় পাথরের বাণী

পুরামানবের অনুসন্ধানে যদি পাওয়া যায় সামান্য এক খণ্ড হাড় তো তার তুলনায় অনেক বেশী মেলে তার ব্যবহারের বস্তু ও উপকরণ। স্বভাবতই বিজ্ঞানীরা এই সব সাক্ষীগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পরীক্ষা করেছেন, এবং যন্ত্রশিল্পের বিভিন্ন ধারা বা কৃষ্টির উপর ভিত্তি করে আজ এক জটিল ও প্রকাণ্ড শাস্ত্র গড়ে উঠেছে। কিন্তু এক টুকরো খণ্ডিত পাথরের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে উত্তেজিত হয়ে ওঠা পণ্ডিতদের পক্ষে সহজ হলেও সাধারণ মানুষ তার থেকে খুব বেশী রস নিঙড়ে বার করতে পারে না, ঐ শাস্ত্রের গহন অরণ্যে তার পথ হারিয়ে যাওয়া আশ্চর্য নয়। তবে যথাসম্ভব সংক্ষেপে একটা মোটা মূলসূত্র অনুধাবন করা দরকার—জীবন-সংগ্রামে অস্ত্র আজও মানুষের প্রধান নির্ভর, জীবন উপভোগে যন্ত্র এখনও প্রধান সহায়, তাদের প্রগতির ধারাটা কার না জানতে ইচ্ছা হয়। তা ছাড়া সে কালের সাধারণ জীবন-যাত্রা ও গৃহস্থালিরও ইঙ্গিতে মেলে এই সব ব্যবহারের জিনিস পত্র থেকে।

বানর ও বনমানুষও অস্ত্র ব্যবহার করে। গাছের ডাল ভেঙে নিয়ে গরিলা হয়তো তাড়া করে শত্রুকে, ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে ছোড়ে ওরাং, খাঁচার বাইরে কলা রেখে শিমপানজির হাতে লাঠি তুলে দিলে সে তা কাজে লাগাবে; এমন কি সে নাকি বাঁশের আগায় লাঠি লাগিয়ে নাগাল বাড়াতেও পারে। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা ভেবে কোনও বনমানুষ অস্ত্র বা উপকরণ রাখবে না কাছে। একমাত্র মানুষের মাথায়ই ঢুকতে পারে এ

ধরনের দূরদর্শিতা, এবং যে দিন থেকে তার প্রথম প্রকাশ সে দিন থেকে প্রকৃত পক্ষে পুরাপ্রস্তর যুগের শুরু।

মানুষের প্রথম ব্যবহৃত পাথরের নাম দেওয়া হয়েছে ইয়োলিথ (eolith)। প্রথমে অবশ্য সে স্বাভাবিক পাথর বা গাছের ডাল ব্যবহার করেছে (অসট্রেলিয়ার আদিবাসীরা এখনও গাছ কাটে স্বাভাবিক পাথর দিয়ে), পরে তার মাথায় খেলেছে যন্ত্রের আকৃতি নিজের সুবিধা মত বদলে নেওয়ার বুদ্ধি। সে দিন থেকে এ ব্যাপারে বনমানুষের সঙ্গে তার পার্থক্য হল সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ। এই গুরুতর সন্ধিক্ষণটিকে খুব স্পষ্ট করে ধরা যায় না, এমন অনেক ইয়োলিথ পাওয়া গিয়েছে যার গড়নে মানুষের হাত আছে কিনা জোর করে বলা কঠিন। সবচেয়ে প্রাচীন হাতিয়ারের চেহারা যে স্বাভাবিক পাথরের কাছাকাছি ছিল, খুব বেশী পরিবর্তন যে তখনও সম্ভব হয় নি তাই আমরা আশা করতে পারি, সুতরাং একেবারে আদিকালের 'তৈরি' অস্ত্র বলে যা দাবি করা হয় আসলে হয়তো তৈরি নয় মোটেই। পূর্ব এশিয়ায় ও আফ্রিকায় এই ধরনের অতি প্রাচীন সন্দেহজনক 'খণ্ডিত পাথর' যে অনেক পাওয়া গিয়েছে, এবং পিথেকানথ্রপাস ও অসট্রালোপিথেকাসের প্রতি আরোপিত হয়েছে, তা আগে বলেছি। য়োরোপে ইয়োলিথ অনেক



১৯নং চিত্র

ক, ইয়োলিথ ; খ, পিকিং মানবের হাতিয়ার।

পাওয়া গিয়ে থাকলেও যে মানুষ বা আধা-মানুষ তা ব্যবহার করেছিল তার নিজের চিহ্ন সামান্যই মিলেছে। অনেকে মনে করেন যে প্লাইস্টোসিনের আগের অনেক পাথরও মানুষের হাতে গড়া, কিন্তু খুঁজতে খুঁজতে এই রকম

পাথর নাকি এক দিকে ইয়োসিন কালে (যার শেষ সাড়ে চার কোটি বছর আগে) ও অন্য দিকে বেশ আধুনিক কালের স্তরেও পাওয়া গিয়েছে ; সুতরাং এর অধিকাংশই প্রকৃতির কাজ বলে মনে হয়। সবচেয়ে পুরনো পাথর যার মধ্যে স্পষ্ট মানুষের কারসাজি আছে তা হল পিকিং মানবের গুহায় পাওয়া উপকরণ—ধরা যাক চার সাড়ে চার লক্ষ বছর আগে তৈরি।

প্রস্তর যুগের শুরু যেমন অস্পষ্ট তার শেষেও তেমনি একটি মাত্র দাঁড়ি টানা যায় না, আজও কোনও কোনও সমাজে সে যুগ চলছে বলা যেতে পারে—অসট্রেলিয়ার আদিবাসীদের দৃষ্টান্ত একটু আগেই দিয়েছি ; এই রোমাঞ্চকর প্রসঙ্গ সম্বন্ধে পরে আরও বিশদ বর্ণনার সুযোগ হবে। এ যুগের প্রধান দুই ভাগ পুরাপ্রস্তর ও নবপ্রস্তর, দ্বিতীয়টি মাত্র হাজার নয় দশ বছর আগে শুরু—তার হাজার তিনেক বছরে যন্ত্রশিল্প যতটা এগিয়েছে তার তুলনায় পূর্ববর্তী বহু লক্ষ বছরের অগ্রগতি নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর, যদিও আদি মানবের কোনও কোনও পাথর নাকি এত প্রকাণ্ড যে আধুনিক মানুষের তা তুলবারই শক্তি নেই। অর্থাৎ প্রায় আক্ষরিক ভাবে বলা চলে যে পুরা কেটেছে ভারে, নব কেটেছে ধারে। কিন্তু নবপ্রস্তর যুগের আলোচনা এখানে নয়।

পুরাপ্রস্তর যুগের তিনটি বিভাগ—আদি (বা নিম্ন), মধ্য, ও সাম্প্রতিক (বা উচ্চ)। আজকের মানুষ বা খাঁটি মানুষের অভ্যুদয় এই সাম্প্রতিক অংশের শুরুতে ; নেয়ানডারটাল ও তৎপূর্ববর্তী মানুষের আধিপত্য যথাক্রমে মধ্য ও আদি অংশে।

মাত্র হাজার বছর আগের ঐ সাম্প্রতিক যুগ পর্যন্ত বহু লক্ষ বছর ধরে যে ক'টি বস্তু মানুষ নিজের হাতে গড়েছে তার সংখ্যা বা সামর্থ্য খুব বেশী নয় ; পরবর্তী কালের সঙ্গে তুলনা করলে এতখানি সময় ধরে এই অতি মন্থর প্রগতিই সবচেয়ে বিস্ময়কর মনে হয়। এত কালের অবদান কয়েকটি মাত্র মৌলিক মোটা সরঞ্জাম—হাত-কুড়াল, বর্শা-ফলক, চাঁছনি। সবচেয়ে আগে মানুষ হয়তো কাঠের লাঠি ব্যবহার করেছে, কিন্তু তার কোনও চিহ্ন সে রেখে যায় নি। অনেকে বলেন যে পুরাপ্রস্তর যুগের যোগ্যতর নাম কাষ্ঠযুগ ; কথাটা বোধ হয় সমীচীন—বিভিন্ন গাছ থেকে নানা রকম কাঠ পাওয়া যেত, এবং কাঠ থেকে লাঠি, আংটা, ফাঁদ, বর্শার

হাতল, অস্থায়ী ছাউনি ইত্যাদি বানানো সহজ। কাঠের পরেই হয়তো কাজে লেগেছে বন ও মাঠের দান আরও নানা উদ্ভিজ্জ বস্তু—নল, ঘাস, পাতা, লতা, বাকল, বাদাম বা অন্যান্য কঠিন ফলের খোলা ; আর দৈনন্দিন আমিষ আহার্যের অবশিষ্ট থেকে হাড়, শিং, স্নায়ু, চামড়া, লোম, পালক, নখ, খুর। মোষের উর্বস্থি থেকে চমৎকার লাঠি হতে পারে, মাংসাশী পশুর সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ কুকুর-দাঁত খুব কাজের জিনিস, বিশেষ করে কাঠের হাতলে বসিয়ে নিলে। অবশ্য প্রথম থেকেই যে মানুষ এত রকম বিবিধ উপাদান কাজে লাগাতে শিখেছে তা নয়—হাড়ের ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায় পুরাপ্রস্তর যুগের সাম্প্রতিক অংশে। সম্ভবত কাঠ ব্যবহার করতে আরম্ভ করবার পরে একদা তার মগজে ঢুকল যে কঠিন পাথরকে ভেঙে তার গায়ে কিছুটা ধার আনতে পারলে তা দিয়ে কাটা ছেঁড়ার কাজ অনেকটা সহজ হয়, দেখা দিল প্রথম পাথুরে মিস্ত্রি।

দক্ষিণ য়োরোপ, আফ্রিকা, দক্ষিণ ভারত, জাপান, উত্তর আমেরিকা ইত্যাদি বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে পাওয়া গিয়েছে বিভিন্ন কালে ব্যবহৃত এক সনাতন পাথুরে কাটারি যাকে বলা হয় হাত-কুড়াল ; সম্ভবত মধ্য আফ্রিকার পূর্বাঞ্চলে এর উদ্ভব হলেও হয়তো কোনও কোনও অঞ্চলে এটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন আবিষ্কার। এই বস্তুটির প্রধান কাজ কি ছিল সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না ; সাধারণত বলা হয় যে মাটি খুঁড়ে শিকড়, পোকা বা অন্য খাদ্য বার করবার পক্ষে তা প্রকৃষ্ট হাতিয়ার, কিন্তু সম্ভবত শুধু ঐ নিরীহ কাজেই তা প্রযুক্ত হয় নি ; কিনিয়াতে নাইরোবি শহরের অদূরে এক ঘাঁটিতে বহু হাজার হাত কুড়াল পাওয়া গিয়েছে পশুর হাড়ের সঙ্গে, স্পষ্টতই অস্ত্রটি ব্যবহার হয়েছে মজ্জা ও মগজ বার করতে—সুতরাং হাত-কুড়ালীরা খুব যে নিরামিষাশী ছিল তা নয়। আসলে জিনিসটি হয়তো সব-কাজের হাতিয়ার, মাটি খোঁড়া থেকে বাঘ শিকার পর্যন্ত এবং তার পরেও মাংস কাটা চামড়া চাঁছা চলত তাতে। হাত-কুড়াল ভারতে অনেক পাওয়া গিয়েছে, বস্তুটি বেশ ভারী, কখনও এক ফুট লম্বা, যত্নে দু দিকে পাত খসিয়ে ধার আনা। ব্যবহারের সময়ে এই হাতিয়ার হাতে জড়িয়ে ধরা হত, না আটকে নেওয়া হত অন্য কিছুর সঙ্গে (যা এখন নষ্ট হয়ে গিয়েছে) তা বলা কঠিন, তবে সম্ভবত দ্বিতীয় বুদ্ধিটি এসেছে পরে।

ঘা মেরে পাথর ভেঙে হাতিয়ার তৈরি হত বটে, কিন্তু তার কৌশলেও কতগুলি বিশেষত্ব লক্ষিত হয়েছে। প্রথম দিকে দেখা যায় পাথরকে ফাটিয়ে তার ভগ্নাংশ থেকে কিছু কিছু পাত খসিয়ে ফেলে তাকে মোটামুটি চোখা করে তোলা। ক্রমশ বড় পাথরের গায়ে ঘা মেরে মেরে পাত খসিয়ে উপকরণের (যেমন কুড়ালের) আকৃতিটা আরও মার্জিত হয়ে উঠল। পাত কখনও ফেলা যেত, কখনও তার থেকে তৈরি হত চাঁছবার, কাটবার বা খুবলাবার যন্ত্র। এটুকু শিখতে কাটল প্রায় দেড় লক্ষ বছর, অর্থাৎ আদি পুরাপ্রস্তর যুগের প্রথম দিকটা। এই আদি যুগ শেষ হয়েছে ১'৭ লক্ষ বছর আগে, তার মধ্যে মানুষ যন্ত্রশিল্পের আর একটি নতুন ধারা আবিষ্কার করেছে; আগে যে অপেক্ষাকৃত ছোট পাতগুলি সে হয়তো নষ্ট করত এখন তারই থেকে সে বানাতে আরম্ভ করলে তার প্রধান উপকরণ, অর্থাৎ অনেকটা যেন আঁটি পরিত্যাগ করে খোসা গ্রহণ করলে। প্রথমটিকে বলা হয়েছে অষ্ঠি (core) শিল্প, দ্বিতীয়টিকে পাত (flake) শিল্প; প্রথমটি অনেকটা আধুনিক ভাস্কর্য-কৌশলের সঙ্গে মেলে। দ্বিতীয় ধারায় কুড়ালের ধার বাড়ল, তার চেহারায় এল প্রতিসাম্য; এই মার্জনা হয়তো সম্ভব হয়েছে পাথরের খণ্ড খসাবার জন্য অন্য পাথর দিয়ে না ঠুকে কাঠের ডাণ্ডা ব্যবহার করে। এই গেল প্রধানত জাভা মানব পিকিং মানবের যুগ।

এই প্রাচীন যুগে আফ্রিকার সর্বত্র, পশ্চিম য়োরোপে ও দক্ষিণ ভারতে অষ্ঠি-শিল্পের প্রাধান্য দেখা যায়। যন্ত্রের মধ্যে চার পাঁচটি বিশেষ আকৃতি লক্ষিত হলেও তাদের সবগুলিকেই এখন হাত-কুড়াল বলা হয়ে থাকে পাত-শিল্পের প্রধান ঘাঁটি হল য়োরোপ ও এশিয়ার মধ্য দিয়ে আল্‌পস, বল্‌কান, ককেশাস, হিন্দুকুশ ও হিমালয়ের সূত্র ধরে যে পার্বত্য মেরুদণ্ড চলে এসেছে তার উত্তরে। এই দুই শিল্পের পার্থক্যের চেয়ে আরও বেশী বিস্ময়কর নিজ নিজ ক্ষেত্রে তাদের অভ্যন্তরিক সমরূপতা ও অব্যাহত ধারা। তা বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় অষ্ঠি-শিল্পী অঞ্চলগুলিতে—উত্তমাশা অন্তরীপ থেকে ভূমধ্যসাগর, অতলান্তিক থেকে মধ্য ভারত পর্যন্ত হাত-কুড়ালের একই কয়েকটি রূপ। এবং দুটি তুষার যুগ ধরে এই চেহারাগুলির অল্প যা কিছু পরিবর্তন ঘটল, বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে তাও দেখা দিল একই ক্রমসূত্র

অনুসারে। এর থেকে মনে হয় যে ইতিহাসের সেই উষা কালেও এই দূর দূরান্তরের মানুষ-গোষ্ঠীর মধ্যে কোনও রকম যোগাযোগ, ভাবের আদান প্রদান হয়তো চলত। তুষার যুগের আগমনে দুই শিল্প-দলই যেন দক্ষিণে সরে এসেছে মনে হয়, উষ্ণতর অবস্থার প্রত্যাবর্তনে অষ্ঠি-শিল্পীরা আবার উত্তরে উঠেছে—এই সব চলাফেরার থেকে এই দুই দলেও যোগাযোগ ঘটে থাকতে পারে। এই ধরনের মিলনের কল্পনাও রোমাঞ্চকর, রহস্যময়, কারণ হাতিয়ারের সঙ্গে হাড় যা পাওয়া গিয়েছে তার সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে পাতশিল্পীরা প্রজাতিতে তো বটেই, হয়ত গণেও আমাদের থেকে বিভিন্ন, আর গর্ডন চাইল্ড লিখেছেন যে অষ্ঠি-শিল্পীরা খাঁটি হোমো সেপিয়েন্স বা তারই আদি পিতৃপুরুষ হয়ে থাকতে পারে।

এ যুগের যন্ত্রপাতির চেহারা যে বরাবর একেবারে রুক্ষ ও বৈচিত্র্যবর্জিত থেকে গিয়েছিল তা কিন্তু নয়। শেষের দিকের কাজে, বিশেষত হাত-কুড়ালে, অনেক সময় আশ্চর্য সৌন্দর্যবোধের ইঙ্গিত মেলে—যেন তারা সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যমূলক নয়, যেন তাদের সৃষ্টির পিছনে নিছক কার্যকারিতা ছাড়া অন্য কিছুরও তাগিদ ছিল। এই সব সৃষ্টির নজির থেকেও মনে হওয়া সম্ভব যে সে কালের কোনও মানুষ (যেমন পূর্বোল্লিখিত কানাম ও সোআন্সকুম মানব) আমাদেরই সাক্ষাৎ পূর্বপুরুষ, জাভা বা পিকিং মানবের সমকালীন হলেও হয়তো আমাদের সঙ্গেই তাদের ঘনিষ্ঠতা বেশী।

পুরাপ্রস্তর যুগের মধ্য অংশে (১৭ লক্ষ বছর থেকে ৩৭,০০০ বছর আগে) পাত শিল্পেরই পূর্ণ স্ফূর্তি, তখন নেয়ানডারটাল মানুষের প্রাধান্য। এরাই প্রথম পাথর থেকে ধারালো বর্শা-ফলক বানিয়েছে, তারই বলে ম্যামথ শিকারে সাহস পেয়েছে। শুধু চাঁছবার ও কোপ মেরে কাটবার জন্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র যন্ত্রও এই সময়ে তৈরি হয়েছে। ফ্রান্সের ল মুস্তিয়ের (Le Moustier) জায়গার নামে এই কৃষ্টির নামকরণ করা হয়েছে, আমরা তার :বাংলা করে বলতে পারি মুস্তেরীয় (১৬ নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। এই পাতশিল্প ছাড়া য়োরোপ, পশ্চিম এশিয়া ও আফ্রিকায় আর এক পদ্ধতি দেখা যায় যাতে অনেকখানি দূরদর্শিতা ও প্রাথমিক পরিকল্পনা দরকার হত ; এই লেভালোআ (Levallois) পদ্ধতি অনুসারে পাত খসাবার আগে পাথরটি কিছু খণ্ডিত করে তাকে প্রস্তুত করে নেওয়া হত

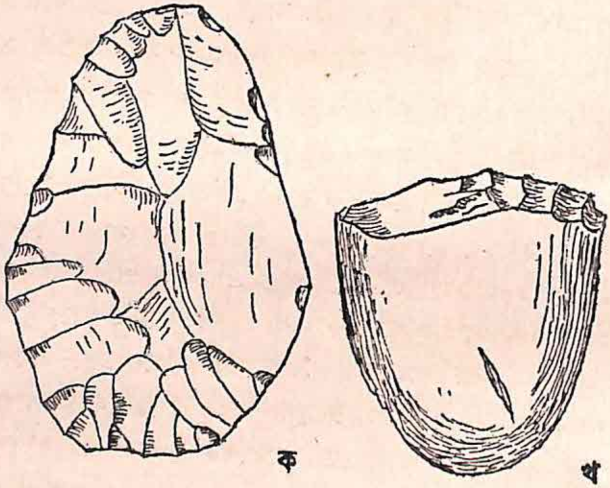
ইংলণ্ডের কতগুলি জায়গায় পাওয়া গিয়েছে যাকে বলা যেতে পারে নেয়ানডারটাল মানুষের হাতিয়ার কারখানা। ঠিক যেমনটি রেখে গিয়েছে সে কালের মানুষ আজও পাথরের স্তূপ তেমনি সাজানো। মনে হয় স্তূপের মধ্যে বসে কেউ যেন কাজ করেছে। সে কালের সমাজেই পৃথক এক কর্মকার শ্রেণীর সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল কিনা কে জানে!

আদি মানবের হাতিয়ার প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে দু এক বার ভারতের উল্লেখ করেছি। এশিয়ার অন্যত্র প্রাচীনতম মানুষদের ফসিল পাওয়া গিয়ে থাকলেও এ পর্যন্ত ভারতে সে রকম সাক্ষাৎ নিদর্শন মেলে নি—খুলি তো দূরের কথা, এক খণ্ড দাঁতও না; বিগত শতাব্দীতে নাকি থিওবাল্ড নামক এক কর্মী মধ্য ভারতের প্লাইস্টোসিন স্তরে এক খুলির উপরিভাগ আবিষ্কার করেছিলেন, ১৮৮১ সালে তার খবর প্রকাশিত হয়েছিল পত্রিকায়, কিন্তু পরে কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির যাদুঘরে তা হারিয়ে যায়। প্রত্যক্ষ সাক্ষীর অভাব সত্ত্বেও কিন্তু পাথুরে হাতিয়ারের নিদর্শন প্রচুর, তা থেকে বোঝা যায় যে প্রস্তর যুগের আদি কাল থেকেই এ দেশে মানুষের বসবাস ছিল। এই সাক্ষীগুলিকে আর একটু বিশদ ভাবে পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে, মোটামুটি চার লক্ষ থেকে এক লক্ষ বছর প্রাচীন কালের মধ্যে।

মনে হয় যে য়োরোপের তুষার যুগগুলির সঙ্গে সঙ্গে উত্তর ভারতেও পর্যায়ক্রমে হিমের আক্রমণ ঘটেছে, যদিও এ সম্বন্ধে প্রমাণ এখনও সম্পূর্ণ নয়; এবং দক্ষিণ ভারতে ও আফ্রিকায় পালা করে শুষ্ক ও আর্দ্র যুগ এসেছে, অর্থাৎ বারিপাত কমেছে বেড়েছে। যে অজ্ঞাত কারণে উত্তরে শীতের আসা যাওয়া, সম্ভবত তারই ফলে দক্ষিণে যুগ বিবর্তন, কিন্তু এই দুই পালার মধ্যে সাময়িক সম্পর্ক সম্বন্ধেও আপাতত নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না; এই সব অনিশ্চয়তার ফলে ভূতাত্ত্বিক কাল নির্ণয় খুব দৃঢ় নয়। যাই হক, এই সম্ভাবনীয় আবহাওয়া বিপ্লবের পটভূমিতে ভারতেও আমরা বহিরাঞ্চলের অনুরূপ পাত ও অষ্ঠি-শিল্পের অভিব্যক্তি দেখতে পাই—প্রথমটি উত্তরে, দ্বিতীয়টি প্রধানত দক্ষিণে। পাত-শিল্পের সম্পর্কিত আর এক গোষ্ঠী যন্ত্র প্রায়ই পৃথক ভাবে নির্দেশ করা হয়ে থাকে—এগুলি প্রধানত এশিয়ার বৈশিষ্ট্য, নুড়ি থেকে তৈরি, শুধু এক দিকে ধার; সাধারণত নুড়িটি

কোআর্টজ্রাইট পাথরের, এবং তৈরি হাতিয়ারে তার কিছু অংশ অক্ষত থাকত, সেখানটা হাতে ধরা হত। ইংরেজীতে এদের বলা হয়েছে chopper-chopping tools (এই দুই শ্রেণীর মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে—প্রথমটি এক দিকে পাত খসানো, দ্বিতীয়টির দু দিকে), আমরা সংক্ষেপে বলব কোপানি। উত্তর ভারতের আদি পুরাপ্রস্তর শিল্পে এদের বিশিষ্ট স্থান।

এ দেশে মানুষের সবচেয়ে আদিম সাক্ষী কতগুলি বৃহৎ রুক্ষ পাত-যন্ত্র, দ্বিতীয় তুষার যুগের শেষে উত্তর ও মধ্যভারতে তাদের সৃষ্টি কোআর্ট-জ্রাইট পাথরের থেকে—এই কৃষ্টির নাম দেওয়া হয়েছে প্রাক্-সোআন (pre-Soan)। দ্বিতীয় ও তৃতীয় তুষার যুগের অন্তর্বর্তী প্রলম্বিত উষ্ণ যুগে যন্ত্রশিল্পের প্রধান দুই ধারা (পাত ও অষ্ঠি) স্পষ্ট রূপ নিয়েছে। আগে উত্তরের কথা ধরা যাক ; পাঞ্জাবে সিন্ধু নদের উপনদ সোআন (বা সোহান, সংস্কৃতে শোভনা) : পাত ও কোপানি শিল্প সোআন, সিন্ধু ও পুন্চ



ক খ

২০নং চিত্র

ক, নিম্ন পেলিওলিথিক কালের য়োরোপীয় হাত-কুড়াল ; খ, নুড়ি থেকে তৈরি সোআন হাতিয়ার।

(ঝিলমের কাছে) উপত্যকায় এবং লবণ পর্বতে বেশী স্পষ্ট—এর নাম সোআন কৃষ্টি। এই শিল্পের প্রথম দিকে, প্রায় চার থেকে দু লক্ষ বছর আগে, ভারী ভারী যন্ত্র তৈরি হয়েছে গোল নুড়ির থেকে, তৈরী বস্তুর

আকৃতিও সেই অনুসারে গড়ে উঠেছে। শেষের দিকে, তৃতীয় তুষার যুগের আরম্ভে, পাত খসাবার আগে অষ্ঠির প্রস্তুতি দেখা যায়, প্রায় সমসাময়িক কালে যে রীতি জানা ছিল পশ্চিম য়োরোপ, দক্ষিণ আফ্রিকা ও প্যালেসটাইনে (লেভালোআ পদ্ধতি), কোপানির তুলনায় এই ধরনের পাত-যন্ত্রের প্রতি এই সময়ে বেশী নজর পড়ল। হাতিয়ারগুলি হয়তো কাজে লেগেছে ছুরি, চাঁছনি বা বর্শা-ফলক হিসাবে।

নর্মদার দক্ষিণে নুড়ির কাজ বিরল, যদিও একেবারে লোপ পায় নি। সে অঞ্চলে আদি পুরাপ্রস্তর যুগের অষ্ঠি-শিল্প মাদ্রাজ-কৃষ্টি নামে পরিচিত, কারণ মাদ্রাজে এর প্রথম পরিচয় মেলে ; কিন্তু এই শিল্পের প্রধান কেন্দ্র দক্ষিণ-পূর্ব ভারত হলেও দেশের মধ্য ও পশ্চিম অঞ্চলেও নমুনা পাওয়া যায়। পাথরগুলির আকৃতি মূলত পেআর ফল কিংবা ডিমের মত, দৈর্ঘ্যে এক ফুট কি তারও বড়, দু পাশেই পাত খসানো, সবটা ঘিরেই ধার (অর্থাৎ কোপানির থেকে বিভিন্ন)—এই হল তথাকথিত হাত-কুড়াল। মাদ্রাজ-ধারা সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে গড়ে ওঠে নি, উত্তরের সঙ্গে সর্বদা যোগাযোগ ছিল ; দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এলাকায় অষ্ঠি প্রভাব জোরালো, উত্তরে (যেমন কারনুলে) পাত বা কোপানি শিল্প দেখা যায়। প্লাইসৃটোসিনের মধ্য কাল থেকে যন্ত্রগুলি আরও মার্জিত আরও ছোট হয়ে উঠল পাত খসাবার কৌশলে অধিকতর দক্ষতার ফলে ; আগে এই কাজ সাধিত করতে পাথর দিয়ে ঘা মারা হয়েছে হাতুড়ির মত, এই সময়ে মনে হয় যেন কাঠ বা শিঙের দণ্ড ব্যবহার হয়েছে, য়োরোপীয় পুরাপ্রস্তর শিল্পে যেমন দেখা যায়।

ভারতীয় প্রস্তর শিল্পের এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের পর এ বার দেখা দরকার তৎকালীন জগতের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক। পুবে পশ্চিমে দু দিকেই মিল দেখা যায়—উত্তর ভারতের কোপানি শিল্পের সঙ্গে পূর্ব এশিয়ার, দক্ষিণের হাত-কুড়ালীদের সঙ্গে আফ্রিকা ও পশ্চিম য়োরোপের। চীনের শোকোতিয়েন গুহায় যে আদিতম হাতিয়ারটি পাওয়া গিয়েছে তা কোপানি যন্ত্র, চার্ট পাথরের নুড়ি থেকে তৈরি ; গুহার এই অঞ্চলে মানুষের হাড় কিছু মেলে নি, তা যেখানে পাওয়া যায় সেখানে তার সঙ্গে আছে বহু কোপানি, কোনও কোনওটা বেশ বড় ও ভারী ; স্ফটিকশিলার তৈরি নানা রূপের ও আকৃতির পাত-যন্ত্রও এ অঞ্চলে প্রচুর, তাদের অসংস্কৃত চেহারা দেখে মনে

হয় মিস্ত্রির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কোনও রকমে ধারালো মুখটি প্রস্তুত করা; এগুলি চাঁছনি হিসাবে ব্যবহার হয়েছে মনে হয়। এ পর্যন্ত ভারতের সোআন কৃষ্টির সঙ্গে সাদৃশ্য স্পষ্ট। এই গুহাতে অস্থি-যন্ত্রও পাওয়া যায় যার চতুর্দিকে ধার, কিন্তু হাত-কুড়াল একেবারেই নেই। পক্ষান্তরে মাদ্রাজ-কৃষ্টির বৈশিষ্ট্য এই বস্তুটি আফ্রিকা ও য়োরোপে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়; পশ্চিমের সঙ্গে এই সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ যে দক্ষিণ ভারত, আফ্রিকা ও দক্ষিণ ইংলণ্ডের হাতিয়ারে এক এক সময়ে কোনও পার্থক্যই দেখা যায় না; শুধু তাই নয়, ঐ ঐ অঞ্চলে ক্রমপরিবর্তন যা কিছু ঘটেছে তাও একই পথ ধরে।

ঐতিহাসিক কালে যান বাহনের ফলে দেশে দেশে ভাবের আদান প্রদান সহজ হয়েছে, সুতরাং সে সময়ে দূরাঞ্চলের মধ্যে কৃষ্টিগত মিল তত আশ্চর্য নয়, কিন্তু এখন আমরা যে সময়ের আলোচনা করছি সেই আদি ও মধ্য প্লাইস্‌টোসিন কাল কয়েক লক্ষ বছর আগেকার কথা, তখন পা ছাড়া চলাফেরার কোনও গতি ছিল না মানুষের এবং মানুষও সংখ্যায় ছিল অল্প। তবু অস্ত্র তৈরির ধারা ছড়িয়েছে দেশ থেকে মহাদেশে; এর পিছনে বিপুল কোনও উদ্দেশ্যমূলক অভিযান এবং মিশ্রণ সর্বদা কল্পনা করা বোধ হয় উচিত হবে না, কোনও খবরদার যে বার্তা বয়ে এনেছে তাও নয়; মনে রাখা দরকার যে সে কালের লোকের ঘর বলে কিছু ছিল না, ভবঘুরের দল শিকারের খোঁজে ঘুরে ঘুরে বেড়াত, অস্ত্র শিল্পও ছড়াত তাদের সঙ্গে সঙ্গে। এ ভাবে কোনও বিদ্যার প্রসার অবশ্য সময়সাপেক্ষ, কিন্তু দেশে দেশে সময়ের দূরত্ব যে ছিল অনেকটা তাতে সন্দেহ নেই। সেই কালের ভারতীয় হাতিয়ারের আলোচনা করতে গিয়ে বিখ্যাত প্রত্নবিদ সার মর্টিমার হুইলার এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে ভাব যে কি করে ছড়ায় তা বলা যায় না, এক এক সময়ে মনে হয় যেন তার গায়ে পাখা আছে এবং প্রজাপতির মত উড়ে উড়ে এখানে সেখানে ডিম পাড়ে সে।

প্রস্তর শিল্পের প্রধান দুই ধারা সম্বন্ধে এমন অনুমান করা হয়েছে যে তা ভিন্ন জাতের মানুষের কাজ—পুবের মিস্ত্রি হয়তো জাভা মানব জাতীয় লোক আর পশ্চিমের কর্মী নেয়ানডারটাল কিংবা প্রাচীনতম খাঁটি মানুষ (হোমো সেপিয়েন্‌স)। ভারতের হাতিয়ার-বৈচিত্র্য দেখে মনে হয় যেন দেশটি ছিল পুব পশ্চিমের মিলন স্থল, একাধারে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধারার সীমা

সেখানে এসে শেষ হয়েছে। তা যদি হয় তো সেই আদিম কালেই এ দেশে "কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা, দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে সমুদ্রে হল হারা"। মাদ্রাজ-শিল্পের সঙ্গে উত্তরের যে যোগ ছিল তা আমরা দেখেছি, হাত-কুড়াল হাতে দাক্ষিণাত্যের 'আর্য' আর চাঁছনি বা কোপানি হাতে পাঞ্জাবের 'ম্লেচ্ছ' যখন মুখোমুখি হয়েছে তখন পরস্পর সম্বন্ধে তারা কি ভেবেছে কি বলেছে কে জানে!

শুধু হাতিয়ারের ধারা ও অবস্থানের উপর নির্ভর করে আদি কালের এই প্রথম ভারতীয়দের মোটেই ভাল করে চেনা যায় না, হাতিয়ার-তথ্যও প্রায়ই বিচ্ছিন্ন ও অসম্পূর্ণ, কখনও বা তার উপরে যে তত্ত্ব গড়া হয়েছে তা বিজ্ঞান-সম্মত নয়, যদিও সম্প্রতি দেশের নানা স্থানে নতুন অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ আরম্ভ হয়েছে মনে হয়। আপাতত নাট্যমঞ্চ অনেকটা স্পষ্ট হলেও তার উপরে অভিনেতারা প্রায় অদৃশ্য, ক্ষীণ আভাসে বুঝতে হয় তাদের গতি বিধি। দ্বিতীয় তুষার যুগের শুরুতে হিমালয় আবার এক বার জেগে উঠে মাথা তুলেছিল আরও প্রায় ৬০০০ ফুট (উর্ধ্ব দেশে উদ্ভিদের ফসিল থেকে তা জানা যায়); তার চূড়ায় চূড়ায় বরফ জমে হিমবাহ সৃষ্টি হল, তাদের গলিত স্রোত নেমে এসে তখন যে নদী পথ তৈরি করেছিল এখনও প্রায় সেই পথেই তাদের গতি। নিম্ন ভূমির এই শীতল প্রান্তরে তখন এল প্রথম মানুষ এবং তার সঙ্গে নতুন জন্তু জানোয়ার (এর আগে ঘোড়া ও হাতির প্রবেশ ঘটেছে পাঞ্জাবের প্রান্তরে, শিবালিক অঞ্চলের ফসিল থেকে তা জানা যায়)। এই আদিম মানুষের একমাত্র সাক্ষী ঐ রুক্ষ প্রাক্-সোআন হাতিয়ার। দ্বিতীয় তুষার যুগের পরে হিমালয়ের হিমবাহ বিদায় নিল, হাওয়া মৃদু হয়ে এল, নদী পথের বিস্তীর্ণ সমতল ভূমিতে শিকার তখন সহজলভ্য—এই অনুকূল পরিবেশে মানুষ সংখ্যায় বেড়ে চলল, সঙ্গে সঙ্গে তার হাতিয়ারও (আদি ও মধ্য সোআন)। হাতিয়ার তুলনা করে বোঝা যায় যে মধ্য প্লাইস্-টোসিনের শেষ ভাগে আফ্রিকার লোক এসে ঢুকেছিল ভারতে; এরা প্রথমে দক্ষিণে বাস করেছে—উত্তরের শীত হয়তো পছন্দ হয় নি, নয়তো সোআন জাতিরা বিদেশীদের ঢুকতে দেয় নি তাদের সহজ শিকার ভূমিতে। প্লাইস্-টোসিনের সাম্প্রতিক অংশে কিন্তু এরা উত্তরে কোথাও কোথাও ঘাঁটি বেঁধেছে দেখা যায়।

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বে বিখ্যাত কর্মী সার মর্টিমার হুইলার তাঁর সাম্প্রতিক এক বইতে মধ্য প্লাইস্টোসিন ভারতীয়দের যে আনুমানিক চিত্রটি এঁকেছেন তা এই রকম : এরা নানা শ্রেণীর নানা জাতির মানুষ ও প্রায়-মানুষ, কেউ জাভা মানবের তুলনায় উন্নত, কেউ নিকৃষ্ট, এদের চেহারাও নানা রকমের ; কারও কারও মেধা আমাদের সমান হওয়া আশ্চর্য নয়, কথা বার্তা কত দূর বলতে পারে তা সন্দেহের বিষয়। নদীর ধারে যেখানে সকালে সন্ধ্যায় পশুরা জল খেতে আসে সেখানে বসে অসংখ্য পাথুরে হাতিয়ার বানিয়ে চলেছে এরা—শুধু শিকার বধ করতে নয়, মাংস কাটতেও তার প্রয়োজন ; কিন্তু তা ছাড়া আরও কি কাজ উদ্ধারের উদ্দেশ্য ছিল এত পরিশ্রমের পিছনে কে জানে—প্রধান হাতিয়ার হাত-কুড়ালের ব্যবহার সম্বন্ধেই তো এখনও নিঃসন্দেহ হতে পারি নি আমরা।

১০। খাঁটি মানুষ : প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি

নেয়ানডারটালদের তিরোধানের সঙ্গে মানবেতিহাসের এক যুগের উপর যবনিকা পড়ল এবং হোমো সেপিয়েন্‌স বা খাঁটি মানুষের যে নতুন যুগ শুরু হল তা আজও অপ্রতিহত। এর মাত্র কয়েক হাজার বছরে মানুষের যত প্রগতি ঘটেছে তার সঙ্গে পূর্ববর্তী লক্ষ লক্ষ বছরব্যাপী ইতিহাসের তুলনাই হয় না।

এই নতুন মানুষদের জন্ম যে কবে তা খুব স্পষ্ট নয়; সাধারণ ধারণা এই যে নেয়ানডারটালদের অন্তিম কালে তার সৃষ্টি, কিন্তু এই ধারণারও পরিবর্তন দরকার হতে পারে। ১৯৪৭ সালে ফ্রান্‌সের শাঁরৎ প্রদেশের এক গুহায় চতুর্থ তুষার যুগের পূর্ববর্তী স্তরে দুটি বিভিন্ন খুলির টুকরো মেলে এবং তার সঙ্গে কিছু হাতিয়ার যার গঠন পদ্ধতি নেয়ানডারটালদের মুস্‌তেরীয় ধারার চেয়েও প্রাচীন; এ দিকে খুলি প্রায় হুবহু আধুনিক মানুষের মত। প্রথম খণ্ডটি সম্ভবত কোনও বালক বা তরুণীর, তাতে নাকের উপরের অংশ কিছুটা অক্ষত, তার থেকে কপাল ও মুখের চেহারা অনুমান করা সহজ—সে চেহারা যে অবিকল খাঁটি মানুষের মত সে সম্বন্ধে সব বিশেষজ্ঞই একমত। দ্বিতীয় খণ্ডটি তালুর, হাড় কিছুটা মোটা, কিন্তু তা ছাড়া সর্বতোভাবে আধুনিক, মগজের মাপ ১৪৭০ সিসি, অর্থাৎ আধুনিক মানুষকেও হার মানায়। এদের বলা হয় ফঁতেশভাদ মানব, এদের তালু আধুনিকদের মত গোল করা, কপাল সম্পূর্ণ খাড়া। অন্তত

৮০,০০০ বছর আগে য়োরোপে এরা ঘুরে বেড়িয়েছে, হয়তো নেয়ানডারটালদের—এমন কি তাদের পূর্বপুরুষদের—সঙ্গেও মিশ্রণ ঘটেছে এদের।

এর সঙ্গে তুলনীয় য়োরোপের দ্বিতীয় পুরামানব দেখা দিয়েছে ইংলণ্ডে, কেন্ট প্রদেশে সোআন্‌সকুম নামক জায়গায়, তারই থেকে মানুষটির নাম। ১৯৩৫-৬ সালে এখানে এক নুড়ি-খাতের মধ্যে প্লাইস্‌টোসিন স্তরে একই ব্যক্তির খুলির পিছনের ও বাঁ পাশের দুটি হাড় পাওয়া যায় এবং তার সঙ্গে কিছু পাথুরে হাতিয়ার ; ১৯৫৫ সালে ডান পাশের অনুরূপ হাড়টিও আবিষ্কৃত হয়েছে। খণ্ডগুলি আধুনিক মাথায় সম্পূর্ণ খাপ খায়, যদিও সামান্য মোটা। সোআন্‌সকুম মানবের প্রায় সমবয়সী আফ্রিকার কান্‌জেরা মানব ; তিনটি কঙ্কালের অবশিষ্ট পাওয়া গিয়েছে কিনিয়ার কান্‌জেরা নামক জায়গার মধ্য প্লাইস্‌টোসিন স্তরে ; সঙ্গের হাতিয়ারও সোআন্‌সকুম মানবের সমকালীন। দুই মহাদেশের এ দুটি মানুষকে দেখেই মনে হয় তিন লক্ষ বছর আগে মানুষের দেহ ও মগজ আধুনিক ছাঁচে ঢালা হয়ে গিয়েছিল—রোডিসীয় ও নেয়ানডারটাল মানবের বহু পূর্বে। কিন্তু ওআইনার সম্প্রতি বলেছেন যে সোআন্‌সকুম মানব পৃথিবীতে এসেছে মাত্র তৃতীয় তুষার যুগের কিছু আগে এবং চেহারায় সে নেয়ানডারটাল ও আধুনিক মানবের মাঝামাঝি। ফঁতেশভাদ মানবের প্রতিও নেয়ানডারটাল চরিত্র আরোপ করা হয়েছে।

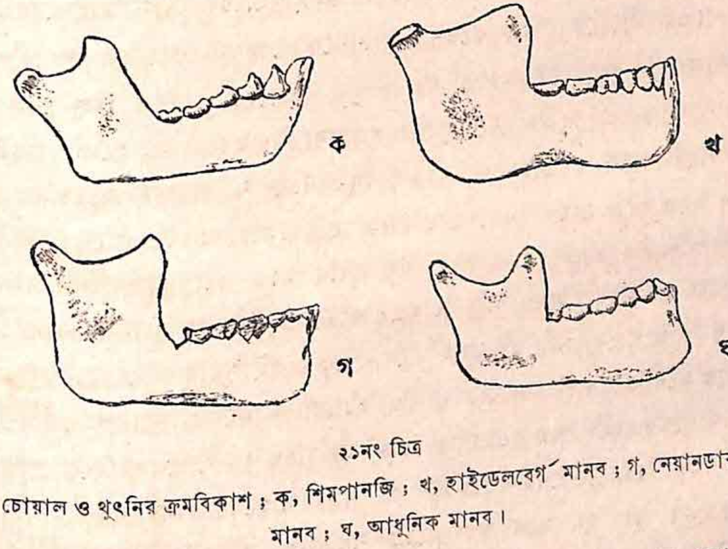
কিন্তু যারা আমাদের সঙ্গে আত্মীয়তার দাবি করেছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন আফ্রিকার কানাম মানব। ১৯৩২ সালে কিনিয়ারই ভিকটোরিয়া হ্রদের তীরে পশ্চিম কানামে নিম্ন পাটির এক থুৎনিওলা আধুনিক চোয়াল আবিষ্কৃত হয় ; ফসিলটি নাকি ছিল আদি প্লাইস্‌টোসিন স্তরে (দুর্ভাগ্যবশত এখন জায়গাটি ধুয়ে গিয়েছে)। কিন্তু এই ব্যক্তিটির থুৎনিতে ছিল ক্যানসার, সে জন্য জোর করে বলা যায় না ঐ অঙ্গটি সম্পূর্ণ গড়ে উঠেছিল কিনা। কানাম মানবকে দেখে কোনও কোনও নৃতত্ত্ববিদ নিঃসন্দেহ যে খাঁটি মানুষ জাভা মানবের সমপ্রাচীন।

ইতিপূর্বে ধারণা ছিল যে ক্রমবিকাশের পথে এক দিকে আছে জাভা মানব অন্য দিকে আধুনিক মানব, আর অন্যান্য পুরামানবরা এদের মধ্যে বিভিন্ন ধাপ, কিন্তু এই সব আবিষ্কারে সেই সনাতন ধারণা আজ টলায়মান। খাঁটি মানুষ যদি অতি প্রাচীন হয় তবে আরও অনেক সম্ভাবনা দেখা দেয়,

যেমন নেয়ানডারটালদের পূর্বপুরুষ হয়তো শুধু পিথেকানথ্রপাস বা সোলো মানবের মত কেউ নয়, খাঁটি মানুষের সঙ্গে সোলো বা ঐ জাতীয় কোনও মানুষের মিশ্রণে তার জন্ম !

আফ্রিকার তৃণপ্রান্তরেই কি নবমানবের উদ্ভব, যে দেশে নর ও বানরের পূর্বপুরুষদের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে, যে দেশ হয়তো বা প্রথম মানুষ জাতীয় প্রাণীরও জন্মভূমি ? লক্ষ লক্ষ বছর আগে কি এদেরই সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে বাস করেছে এ যুগের মানুষ, আদি প্লাইস্টোসিন কালেই কি তার প্রতিযোগিতা চলছিল্ বনমানুষের সঙ্গে ? দূর অতীতের কুহেলিতে আজও সম্পূর্ণ আবৃত এ সব প্রশ্নের জবাব, আপাতত এদের অভিনব ইঙ্গিতেই আমরা স্তম্ভিত।

সে যাই হক, খাঁটি মানুষের বাসস্থান বা গতি বিধির কোনও স্পষ্ট ঠিক ঠিকানা মেলে নি যত দিন না বিগত ও শেষ তুষার যুগের মাঝামাঝি হঠাৎ তারা দেখা দিল য়োরোপে, নেয়ানডারটাল একাধিপত্যের ক্ষেত্রে। সম্ভবত



২১নং চিত্র

চোয়াল ও থুৎনির ক্রমবিকাশ ; ক, শিম্পানজি ; খ, হাইডেলবের্গ মানব ; গ, নেয়ানডারটাল মানব ; ঘ, আধুনিক মানব।

পুব দিক (রুশিয়া বা এশিয়া) থেকেই তারা এসেছে, স্রোতের পর স্রোত। সে দিন সাবেক য়োরোপীয়রা নিশ্চয় অবাক হয়েছিল এদের দেখে। এদের দেহ উন্নত, মাথা গোল, একেবারে খাড়া হয়ে চলে এরা।

এখানে বলা দরকার যে এরা প্রায় আজকের মানুষের মত দেখতে হলেও একেবারে যে পার্থক্য ছিল না তা নয়। প্রথম দিকের খাঁটি মানুষদের ফসিল পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে যদিও সকলেরই পায়ের হাড় সোজা, হাঁটুতে ভাঁজ নেই, মগজ প্রায় সমান, তবু কারও চিবুক আধুনিক মানুষের মত এত স্পষ্ট নয়, কারও হয়তো মাথাটা একটু বেশী লম্বা, কিংবা ভুরুর নিচের হাড় একটু বেশী প্রকট, যদিও নেয়ানডারটালদের মত অতটা কখনও নয়। এ সব বৈচিত্র্য হয়তো প্রাকৃতিক পরীক্ষার ইঙ্গিত, যে পরীক্ষার থেকে আজকের মানুষের সেরা ছাঁচটি তৈরি হল শেষ পর্যন্ত। অবশ্য আধুনিক মানুষও সব এক জাতি নয়, এবং প্রকৃতির পরীক্ষা এখন শেষ হয়ে গিয়েছে এমন কথা মনে করবার কোনও কারণ নেই ; যথা, এ যুগে আমাদের আক্কেল দাঁত অনেক দেরি করে ওঠে, কখনও বা ওঠেই না।

সে কালে এই সম্পূর্ণ দুই রকম মানুষের সাক্ষাৎকার নিশ্চয় অতি রোমাঞ্চকর ঘটনা। নেয়ানডারটালদের গুহা গহ্বরেই খাঁটি মানুষদেরও চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। কি করে যে প্রাচীনকে বেদখল করেছিল অর্বাচীন তা আমরা শুধু অনুমানই করতে পারি—যুদ্ধ বিগ্রহের কোনও চিহ্ন নেই। অবশ্য তখনকার দিনে দল বেঁধে যুদ্ধের সম্ভাবনা নিশ্চয় ছিল না, হলে হয়েছে ছোটখাটো সংঘর্ষ, হাতাহাতি—যার কোনও চিহ্ন না থাকাই স্বাভাবিক ; এমনি অল্পে অল্পে ক্রমশ নেয়ানডারটালরা হটে গিয়ে থাকতে পারে। এও সম্ভব যে অন্তত প্রথম দিকে কিছু দিন নবীন আর প্রবীণ পাশাপাশি বাস করেছিল, তা হলে হয়তো কিছু সংমিশ্রণ ঘটেছে। এ রকম সংমিশ্রণ অন্যত্রও ঘটে থাকতে পারে, যদি দুই দলই এসে থাকে একই পূর্বাঞ্চল থেকে, যেমন অনেকে মনে করেন। তা যদি হয় তো হয়তো আজকের কোনও কোনও সভ্য মানুষের দেহে নেয়ানডারটাল 'রক্ত' প্রবাহিত! প্যালেসটাইনে প্রাপ্ত কিছু কিছু ফসিলে নেয়ানডারটাল ও খাঁটি মানুষের এমন সব বৈশিষ্ট্য একত্র দেখা যায় যে মনে হয় এদের সংযোগে সত্যিই বর্ণসংকরের সৃষ্টি হয়েছিল। সে দেশে ১৯৩১-২ সালে কারমেল গিরির এক গুহায় পাওয়া গিয়েছে স্পষ্ট নেয়ানডারটাল ফসিল, আর এক গুহায় প্রায় আধুনিক মানুষের দেহাবশেষ, এবং তা ছাড়া এদের অন্তর্বর্তী সব রকম ধাপ, যার

থেকে মনে হয় যৌন মিশ্রণ সত্যিই ঘটেছিল। এ কালের য়োরোপীয়দের মধ্যেও মাঝে মাঝে হঠাৎ নেয়ানডারটাল বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে, যেমন উন্নত ভ্রূ-অস্থি, কোটরগত চক্ষু, ঢালু কপাল, স্বল্প চিবুক। এই সব কারণে কেউ বা এমন কথাও বলেছেন যে আসলে নেয়ানডারটাল মানুষ মরে যায় নি, মিশে গিয়েছে খাঁটি মানুষের মধ্যে, এরা বলেন যে শুধু যে খুনের কোনও চিহ্ন নেই তাই নয়, নেয়ানডারটালদের আস্তানা ছিল নানা দেশে মহাদেশে, সর্বত্রই তাকে মেরে শেষ করা হয়েছে তা বিশ্বাস করা কষ্টকর; তা ছাড়া ভিন্ন প্রকার মানুষের মধ্যে যৌন মিশ্রণ চির দিনই দেখা যায়। আর এক দল বলেন মিশ্রণও হয় নি, একমাত্র নেয়ানডারটালদের থেকেই খাঁটি মানুষ উদ্ভূত—তা মানলে এই কষ্টগ্রাহ্য সম্ভাবনার কথা ওঠে না যে সেই প্রাচীন কালের মানুষ পদব্রজে এত দূর দূরান্তরের পথ অতিক্রম করেছে। এ সব মতবাদ গ্রহণের পথে বাধা হল যে নেয়ানডারটালদের অন্তর্ধান বেশ আকস্মিক।

যাই হক বর্তমানে আমাদের প্রসঙ্গ হল খাঁটি মানুষ। এই নতুন আগন্তুকদের রীতি নীতি যে সর্বত্র একই ছাঁচে ঢালা ছিল তা নয়, বিভিন্ন দলের মধ্যে কতগুলি কৃষ্টিগত পার্থক্য লক্ষ করেছেন প্রত্নবিদরা। তার সাক্ষী রূপে এ বার আমরা পাই শুধু হাতিয়ার নয়, অন্যান্য নানাবিধ উপকরণ; শুধু পাথর নয়, হাড় শিং হস্তীদন্তের বস্তু।

এ কথাটা স্পষ্ট করে মনে রাখা দরকার যে যদিও নেয়ানডারটালদের সমকালীন ও পরবর্তী খাঁটি মানুষের কঙ্কাল এ যাবৎ য়োরোপেই পাওয়া গিয়েছে, যদিও সেখানেই তার অস্তিত্বের অন্যান্য প্রমাণও (প্রথমে অস্ত্র উপকরণ, পরে অলংকার, গুহাচিত্র ইত্যাদি) অধিকাংশ আবিষ্কৃত হয়েছে, তবু এমন কথা এখনও জোর করে বলা চলে না যে সেখানেই তার জন্ম। এশিয়া ও আফ্রিকার অধিকাংশ এখনও সন্ধান করেন নি সুযোগ্য বিশেষজ্ঞরা। খুঁজে দেখলে হয়তো এই দুই মহাদেশে অথবা সমুদ্রগর্ভে পাওয়া যাবে আমাদের সাক্ষাৎ পিতৃপুরুষদের আরও উৎকৃষ্ট আরও প্রাচীন দেহাবশেষ। এ কথা নেয়ানডারটাল মানুষের সম্বন্ধেও খাটে। নির্দয় প্রকৃতির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার কৌশল শিখবার আগে বহু লক্ষ বছর মানুষের বসবাস এশিয়া, আফ্রিকা ও য়োরোপের উষ্ণ অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। আমেরিকা মহাদেশে

পুরামানবের চিহ্ন এত বিরল যে মনে হয় মানুষ সেখানে ঢুকেছে মাত্র পুরা-প্রস্তর যুগের শেষাশেষি, হাজার কুড়ি বছর আগে। কি করে ঢুকল তারা সাগর-ঘেরা আমেরিকায়? জলপথে তখনও মানুষ চলতে শেখে নি অবশ্য, কিন্তু স্থলপথ সে কালে খোলা ছিল উত্তরে সাইবেরিয়ার সঙ্গে মাত্র ১০,০০০ বছর আগে পর্যন্ত, বর্তমানে যেখানে বেরিং প্রণালী। (এর দৈর্ঘ্য মাত্র ৫৬ মাইল এবং এখনও শীত কালে এত অগভীর যে হেঁটে পার হওয়া সম্ভব।) এ যাবৎ আমেরিকায় মানুষের সবচেয়ে পুরনো কঙ্কাল যা পাওয়া গিয়েছে তার বয়স মাত্র ১১,০০০ বছর, মানুষের হাতে গড়া প্রাচীনতম বস্তুর বয়স ছিল ১০,০০০ বছর; কিন্তু কোনও কোনও সাম্প্রতিক খবরের ইঙ্গিত যদি সত্য হয় তবে মনে হয় আমেরিকা মহাদেশে খাঁটি মানুষ দেখা দিয়েছে প্রায় য়োরোপের সমকালেই। এক পত্রিকার খবরে প্রকাশ টেক্সাস রাষ্ট্রে নাকি ৩৫,০০০ বিসিতেই তার পা পড়েছে, যদিও এ সম্বন্ধে এখনও তর্ক চলছে। পত্রিকাটি অবশ্য মার্কিন। ক্যালিফর্নিয়ার অদূরে সান্টা রোজা দ্বীপে এক ম্যামথ-ভোজের চিহ্ন মিলেছে, পোড়া হাড়ের তেজী-কারবন মেপে বয়স দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩০,০০০ বছর। মেকসিকোর মরুভূমি খুঁড়ে প্রায় ৫০০ পশুর-হাড় বেরিয়েছে, তার মধ্যে একটি আছে ম্যামথ বা ম্যাস্টোডনের অস্থি-খণ্ড, প্রাথমিক পরীক্ষায় এরও বয়স দাঁড়িয়েছে ঐ রকম, এবং এর সঙ্গে যে মানুষের সম্পর্ক ছিল তা বোঝা যায় এই দেখে যে খণ্ডটির গায়ে পশুর ছবি আঁকা। সমস্ত বিষয়টি এখনও বিতর্কের বস্তু।

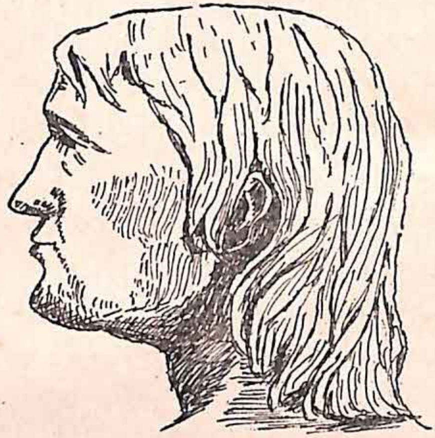
খাঁটি মানুষের স্পষ্ট অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে হাতিয়ার শিল্পের দ্রুত উন্নতি হয়েছে মাত্র কয়েক হাজার বছরের মধ্যে। প্রথম আগন্তুকদের তৈরি পাথরের পাত বা হাড়ের ফলা নেয়ানডারটালদের থেকে বিভিন্ন, যদিও পাথরের ফলকে কোথাও কোথাও মুস্তেরীয় প্রভাব দেখা যায়—এই দুই মানুষের মধ্যে যোগাযোগের তা আর একটা প্রমাণ। ইতিপূর্বে মানুষের সৃষ্টিতে সৌন্দর্যবোধের ছোটখাটো চিহ্ন লক্ষিত হয়েছে—কিন্তু এই খাঁটি মানুষের সময় থেকে বিচিত্র ব্যক্তিগত অলংকারে, অস্ত্র ও উপকরণের নানা রকম কারুকাজ ও নক্শায়, চিত্রে ও ভাস্কর্যে দেখা যায় সৌন্দর্যপ্রীতির স্ফূর্তি ও সৌন্দর্যসৃষ্টির ক্ষমতা, যা মানুষেব একান্ত স্বকীয় ও শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য। আর কাজের জিনিস সম্বন্ধে বলা চলে যে ধাতুর অবর্তমানে যা যা কিছু

বানানো সম্ভব মানুষ যেন দিনে দিনে আবিষ্কার করেছে তার বিচিত্র রূপ ও কার্যকারিতা। উপকরণগুলি হয়ে এসেছে আগের চেয়ে ছোট, অধিকতর কৌশলের পরিচায়ক ও পৃথক পৃথক কাজের জন্য ভাগ করা। তাদের উপাদান স্বরূপ নানা ভাবে কাজে লাগানো হয়েছে হাড়, গজদন্ত, শিং। পাথরের কাজেও অধিকতর চাতুর্য চোখে পড়ে ; উপযুক্ত পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির ফলে কি করে একই খণ্ডের থেকে অনেকগুলি সরু লম্বা পাত খসানো যায় এ যুগের মানুষ তা শিখেছে, পূর্বোক্ত লেভালোআ পদ্ধতির তুলনায় এতে মাল ও শ্রম দুইই বেঁচেছে। প্রত্যক্ষ ও অব্যবহিত হাতিয়ার বানিয়েই মানুষ আর সন্তুষ্ট থাকে নি, বানাতে আরম্ভ করেছে হাতিয়ার তৈরির হাতিয়ার। প্রয়োজনের তাগিদেই উদ্ভাবন এই নীতির ফলে মানুষের পোশাক ও বাসস্থান হয়েছে অধিকতর আরামপ্রদ, খাদ্য হয়েছে সুস্বাদু, জীবনযাত্রা হয়ে উঠেছে সহজ ; এক কথায় ব্যবহারিক সভ্যতা বেড়েছে।

এক আধুনিক শ্রেণীবিভাগ অনুসারে এই সাম্প্রতিক পুরাপ্রস্তর যুগের সংক্ষিপ্ত ধারা বিবরণ নিচে দেওয়া হল। এর বিভিন্ন বিভাগের আখ্যাও ফ্রান্সের স্থানীয় নাম থেকে এসেছে। পূর্বের নীতি অনুসারে আমরা পেরিগর (Perigord), ওরিনিয়াক্ (Aurignac), সলুত্রে (Solutrē) ও লা মাদ্‌লেন (La Madeleine) থেকে বাংলা বিশেষণ বানিয়ে নেব পেরিগরদীয়, ওরিনাসীয়, সলুত্রীয় ও মাদলেনীয় ; শব্দগুলি শুনতে অনেকটা ঐ সব শব্দজাত ফরাসী বিশেষণের মতই।

একেবারে প্রথম দিকে (নিম্ন পেরিগরদীয়, ৩৫,০০০-২৮,০০০ বিসি) পাথর থেকে খুব পাতলা পাত খসাবার উদ্দেশ্যে মানুষ কাঠ বা হাড়ের বাটালি ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছে ; এরই থেকে আসল ছুরির জন্ম। সূচের আবিষ্কার না হলেও চাঁছবার ও কাটবার যন্ত্রের উন্নতি হয়েছে, সম্ভবত চামড়ার থেকে সরু টুকরো কেটে তাই দিয়ে জোড়া হচ্ছে জামা কাপড়ের টুকরো। অনেক যন্ত্রে মুস্তেরীয় প্রভাব দেখা যায়। য়োরোপের এই নবমানবদের চেহারায় ছিল মেডিটেরানিয়ান বা দক্ষিণী ছাপ। এদের পরে যারা এল (ওরিনাসীয়, ২৮,০০০-২৩,০০০ বিসি) তাদের সবচেয়ে যুগান্তকারী আবিষ্কার খোদাই কাজের বা চিরবার উপযুক্ত এক শ্রেণীর উপকরণ যার ইংরেজী নাম বিউরিন (burin) ; মামুলি চকমকি পাথরের

সরু লম্বা ফলাকে (blade) সংস্কার করে তৈরি হত এই ধারালো যন্ত্র। বিউরিনের বিশেষত্ব এই যে তার ফলায় নতুন করে ধার আনা হত শুধুমাত্র গা থেকে এক একটি করে পাত খসিয়ে। এই যন্ত্রের ফলে সম্ভব হল হাড়, হরিণ-শিং ও ম্যামথ-দাঁতের থেকে বিবিধ উপকরণের সৃষ্টি, যেমন সরু পিন বা সুদৃশ্য বর্শা-ফলক, এমন কি আগুনের তাপে বর্শা-দণ্ড সোজা করবার উদ্দেশ্যে তা ধরবার হাতল। মানুষের এই গোষ্ঠীটির জাতিগত নাম ক্রোমানীয় (Cro-Magnon), আধুনিক মানুষের পূর্বপুরুষদের মধ্যে এরাই সবচেয়ে সুপুরুষ, এদের কথা পরে আরও বলব।

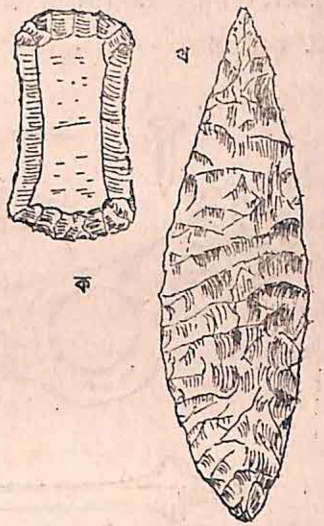


২২নং চিত্র
ক্রোমানীয় মানব।

পরবর্তী কৃষ্টিতেও (উচ্চ পেরিগরদীয়, ২৩,০০০-১৮,০০০ বিসি) এদেরই প্রধান অংশ ; পিছন-সোজা ছুরি এই সময়ের উদ্ভাবন।

এর পরের ৪০০০ বছরের (সলুত্রীয়, ১৮,০০০-১৪,০০০ বিসি) সবচেয়ে বড় কীর্তি পাথরের গায়ে ঘা না মেরে শুধু যন্ত্রের উপর হাতে চাপ দিয়ে পাত খসানো। এর ফলে খুব পাতলা পাত বার করা সম্ভব হল—অনেকটা গাছের পাতার মত তা দেখতে—তার থেকে তৈরি হল নানা রকম নতুন হাতিয়ার ও অনেক সাবেক হাতিয়ারের মার্জিত সংস্করণ। সলুত্রীয়দের ব্যবহৃত কিছু জিনিস পাওয়া গিয়েছে যা অনেকটা তীরের ফলার মত দেখতে, তার থেকে অনেকে মনে করেন যে ধনুর্বিদ্যা এই সময়ের মধ্যে আয়ত্ত হয়ে গিয়েছিল। পক্ষান্তরে এদের পরবর্তী মানুষের আঁকা ছবিতেও যদিও তীর বা বর্শার মত অস্ত্র দেখা যায়, ধনুকের রূপায়ণ একেবারেই পাওয়া যায় না। অনেকে বলেন যে গুহাচিত্রের ঐ তীর জাতীয় অস্ত্রগুলি আসলে হাতে ক্ষেপণের হাতিয়ার, ইংরেজীতে যাকে বলে ডার্ট, ধনুর্বিদ্যায় দীক্ষা হয়েছে আরও দেরিতে।

এর পরে পুরাপ্রস্তর কৃষ্টির শেষ বা উচ্চতম স্তর (মাদলেনীয়, ১৪,০০০-৮০০০ বিসি)। এই চরম উন্নতির যুগে যে কলাকুশলী মানুষ-গোষ্ঠীর প্রাধান্য তাদের জাত সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত দেখা যায় ; কারও কারও ধারণা এরা য়োরোপে এসেছিল পশ্চিম এশিয়া বা ক্যাস্‌পিয়ান সাগর এলাকা থেকে। এক খুলি পরীক্ষা করে কিছুটা মংগোলীয় ভাব লক্ষিত হয়েছে এবং সে দিক থেকে এদের এসকিমোদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে ; কিন্তু এই খুলির নাক য়োরোপীয়দের মতই উন্নত এবং আরও অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করে অনেকে মংগোলীয় প্রভাব অস্বীকার করেন, মনে করেন জাতিতে এরা ক্রোমানীয়দেরই নিকৃষ্ট বংশধর।

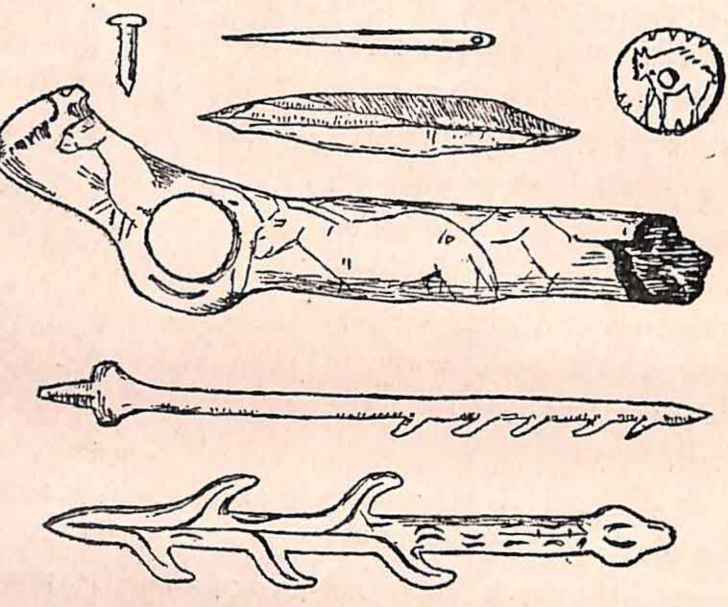


২৩নং চিত্র
সলুত্রীয় উপকরণ ; ক, চাঁছনি ; খ, ছুরি।

এই সময়ে য়োরোপের হাওয়া উষ্ণতর ও আর্দ্রতর হয়ে উঠেছে। শীতের অনুসরণে পাইন গিয়েছে উত্তরে, তার সঙ্গে সঙ্গে বলগা-হরিণ, ম্যামথ ও গণ্ডার; উন্মুক্ত প্রান্তর ভরে উঠেছে বন বনানীতে সেখানে বাস করতে আসছে নতুন জীব জন্তু। গুহার পশুরা মরে গেল, এল আমাদের বেশী পরিচিত অন্যান্য প্রাণী—চাষ ও স্থায়ী বসতির পূর্বাভাস নিয়ে যেন। জীবনযাত্রার ধারাটাই বদলে গেল, তার ফলে যন্ত্রপাতি সাজ সরঞ্জামেও এল অনেক পরিবর্তন। হ্রদে নদীতে মাছ ধরা শুরু হল পরম উৎসাহে, প্রধানত হারপুন বা কাঁটাদার বল্লম দিয়ে, যদিও ছিপের ব্যবহারও জানা ছিল।

পাথর অনেকটা অবজ্ঞাত হয়ে পড়ল হাড় ও শিঙের খাতিরে ; এই উপাদানগুলির চরম পরিণতি দেখা গেল বহুকণ্টকিত বর্শাফলক, বড়শি সত্যিকারের ছিদ্রিত সূচ ইত্যাদির উদ্‌ভাবনে। আজকের মত সে দিনের গৃহকর্ত্রীরও সূচ হারিয়ে যেত ; কে এক জন বানিয়েছিল সূচ রাখবার কৌটো ফাঁপা পাখির-হাড় থেকে, সূচ ভরা সেই কৌটো ঠিক তেমনি পাওয়া

গিয়েছে। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে এদের স্থচ তৈরির সম্পূর্ণ সরঞ্জামও সাজানো আছে : এক খণ্ড হাতির দাঁত যার থেকে সরু সরু টুকরো খসিয়ে নেওয়া হয়েছে, চোখা ছুরি, বালি পাথরের চাক—তার মধ্যে গর্ত, সেই গর্তে ঘুরিয়ে স্থচের গা গোল করা হত, পালিশ করবার পাথর এবং চোখ ফুটো করবার



২৪নং চিত্র
মাদলেনীয় অস্ত্র উপকরণ, হাড় ও পাথরের তৈরি।

জন্য অতি সূক্ষ্ম চকমকি। সে কালের হাড়-স্থচের প্রশংসায় এ কালের এক লেখক মন্তব্য করেছেন যে বহু শতাব্দী পরে ঐতিহাসিক কালেও এর জুড়ি দেখা যায় নি ; সুসভ্য রোমীয়দের তো নয়ই, য়োরোপের রনেসাঁস (পঞ্চদশ শতাব্দী) পর্যন্ত নাকি এর তুল্য কিছু ছিল না। হাতির দাঁতের পিন ও বোতামও পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যে কখনও কখনও খোদাই করা পশু-মূর্তি। এত সাজ সরঞ্জামের সহায়ে পোশাক পরিচ্ছদ তৈরি সহজ হয়ে গেল, পাথরের ছুরিতে সূক্ষ্ম পশুচর্ম কেটে হাড়ের স্থচে তা জুড়ে মেয়েরা সেই আবরণ সাজালে ছিদ্রিত ঝিনুক ও অন্যান্য সামুদ্র খোলকের আভরণে। মানুষ যে শুধু 'কাজের জিনিসে' তৃপ্ত নয় তা নানা ভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠল

এই সময়ে—বসনে ভূষণে প্রসাধনে, দেহ চিত্রণে রঙের ব্যবহারে, মেয়েদের চুল বাঁধার সূচনায়। মিস্ত্রির কাজেও যেন সৌন্দর্যের ছোঁয়া লাগল, হাতের কাজ হয়ে উঠল কারুশিল্প। কিন্তু শিল্পপ্রতিভার মহত্তম নিদর্শন সে যুগের মানুষ রেখে গিয়েছে গুহা গহ্বরের দেয়ালে, চিত্রে ও ভাস্কর্যে—এই মাদলেনীয় কালেই তার স্ফূর্তি, পরবর্তী অধ্যায়ে এই আশ্চর্য সৃষ্টির সঙ্গে আমাদের পরিচয় হবে। কিন্তু এই প্রস্ফুটিত ফুল যেন দেখতে দেখতে ঝরে পড়ল; তুষার যুগের শেষে য়োরোপের খোলা প্রান্তর যখন বন বনানীতে ঢেকে গেল তখন বিদায়ী ম্যামথ ও বাইসনের সঙ্গে সঙ্গে মাদলেনীয়রাও তাদের শিল্প-প্রতিভা নিয়ে সম্পূর্ণ উধাও হয়ে গেল।

এখানে বলে রাখা দরকার যে সলুত্রীয় ও মাদলেনীয় ধারা পশ্চিম য়োরোপের সম্পূর্ণ স্থানীয় কৃষ্টি, যদিও সাধারণ ভাবে সাম্প্রতিক পুরাপ্রস্তর যুগের কাল বিভাগে এই নামগুলি ব্যবহার হয়ে থাকে। ওরিনাসীয় কৃষ্টি আরও বিস্তৃত, পশ্চিমে ইংলণ্ড পর্যন্ত, পুবে য়োরোপের সীমা ছাড়িয়ে।

ওরিনাসীয়-মাদলেনীয় কালে দৈনন্দিন সামাজিক জীবন যাত্রার মোটামুটি সম্পূর্ণ চিত্রটি আমরা পাই। মৃতের অন্ত্যেষ্টি সম্বন্ধে এদের যত্ন ও নিয়ম কানুন থেকে মনে হয় যে এদের মনে পরবর্তী জগত অনেকটা এ জগতেরই সমতুল্য ছিল। নেয়ানডারটাল কবরেও এ ধরনের ইঙ্গিত আমরা পেয়েছি, সুতরাং সম্ভবত এই বিশ্বাস আরও প্রাচীন কাল থেকে চলে এসেছে, এবং পরে আরও বহু সহস্র বছর ধরে তা যে দৃঢ়তর হয়েছে মানুষের মনে সে বিষয়েও সন্দেহ নেই; মৃতদেহের পরিচর্যা, পরবর্তী জীবনে তার সব রকম সুখ সুবিধার ব্যবস্থা ইত্যাদির চরম পরিণতি আমরা দেখতে পাই পিরামিড যুগের মিশরে, কিন্তু এই একই প্রেরণা ও প্রয়াস স্পষ্ট প্রতীয়মান পুরাপ্রস্তর যুগের শেষ ভাগেও। শুধু তাই নয়, শেষ বিদায়ের পর প্রিয়জনের সুখ সুবিধা সৃষ্টির সঙ্গে জড়িয়ে ছিল তাকে ফিরিয়ে আনবার করুণ প্রচেষ্টা, এই চরম নিয়তি সম্বন্ধে এক মন-না-মানা অবিশ্বাস; তাই বিবর্ণ পাণ্ডুর শবের গায়ে লাল গৈরিকের (ochre) রং মেখে তাকে 'সজীব' করে তুলতে চেষ্টা করা হয়েছে বারে বারে—সেই রং এখনও লেগে আছে কঙ্কালে। অন্ত্যেষ্টি শেষ করবার আগে বারে বারে এই চেষ্টায় বিফল হয়েছে মানুষ, তবু

২০,০০০ বছর ধরে ব্যবহার করেছে এই 'মৃতসঞ্জীবনী'! এতই অস্বাভাবিক, এতই দুর্বোধ্য মনে হয়েছে মৃত্যুকে।

সমাধি তৈরি হত সাধারণত গুহার ভিতরেই, এবং নিচে ও উপরে পাথরের খণ্ড দিয়ে দেহকে বাঁচানো হত মাটির সংস্পর্শ থেকে। শবকে পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে হাঁটু মুড়ে পা দুটি তুলে দেওয়া হত—হয়তো ঘুমের ভঙ্গি কিংবা গর্ভস্থ ভ্রূণের অনুকরণে; বহু পরে মিশরের খুব প্রাচীন কবরেও এই ভঙ্গি দেখা যায়। সম্ভবত কখনও শবকে শক্ত করে বাঁধা হত যাতে তার প্রেতাত্মা জীবিতদের উপর উপদ্রব না করতে পারে। কবরে কখনও কখনও কোনও পশুর মুণ্ড কিংবা দাঁত বা শিং পাওয়া গিয়েছে, এ কালের আদি-বাসীদের রীতি নীতির সঙ্গে তুলনা করে অনেকে তা টোটেমের প্রতীক বলে মনে করেন। টোটেম খুব জটিল ব্যাপার, সংক্ষেপে বলা চলে যে তা হল কোনও এক বিশিষ্ট প্রাণী বা বস্তু যার আত্মা যার গুণ এক বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে প্রবাহিত, যাকে ঘিরে তাদের সমাজ ও দর্শন; যথা আমাদের যেমন এক গোত্রে বিয়ে হয় না, তেমনি একই টোটেম-গোষ্ঠীতেও হয় না। আজও পৃথিবীর যে সব জাতি প্রায় পুরাপ্রস্তর যুগে বাস করছে তাদের মধ্যে টোটেম-তন্ত্র খুব প্রবল, সে সম্বন্ধে পরে আরও কিছু বলবার সুযোগ হবে। এদের আচার অনুষ্ঠান নীতি বিশ্বাস ইত্যাদির অনেক কিছু যে বহু পুরাতন কাল থেকে চলে এসেছে তাতে সন্দেহ নেই, তাই এদের সঙ্গে মিলিয়ে নৃতত্ত্ববিদরা পুরামানবের সমস্যামূলক প্রশ্নের জবাব খুঁজে থাকেন প্রায়ই। যাই হক, কবরে পাওয়া পশুমুণ্ড ও হাড় যদি টোটেমই হয়ে থাকে তবে এও ঠিক যে মৃতের সৎকারের সঙ্গে তখন বেশ একটা বিস্তারিত অনুষ্ঠান জড়িত ছিল এবং উন্মত্ত নাচ গান চীৎকারে গুহা গহ্বর গম গম করে উঠত। এই কালেই মানুষের মুখে প্রকৃত ভাষা ফুটেছিল এমন ধারণা সম্প্রতি গড়ে উঠেছে কয়েক জন বিজ্ঞানীর মনে। চিবুকের যে খাঁজ আধুনিক মানুষের বিশেষত্ব তা নাকি বাক্‌শক্তির জন্য প্রয়োজন।

সেরা জাতের খাঁটি মানুষের কবর প্রথা কেমন ছিল তার একটি নমুনা: এক গুহায় কাটা খাদের মধ্যে পাওয়া গিয়েছে তিন ব্যক্তিকে; প্রথমে এক খুব দীর্ঘ পুরুষ, তার গলায় হার, মাথায় মুকুট—দুইই ঝিনুক, মাছের কাঁটা আর হরিণ-শিঙের তৈরি; হাঁটুর উপর দুটি বহুমূল্য কড়ি, হাতের

কাছে বড় গোছের এক পাথুরে অস্ত্র। লোকটির পাশে এক অষ্টাদশী যুবতী ঐ রকমই সজ্জিতা। এদের দু জনেরই মুখ সমুদ্রের দিকে ফেরানো। তার পর ১৫ বছরের একটি বালক। ষাঁড় আর হরিণের হাড় কাছাকাছি—পরজীবনে ভক্ষ্যের অভুক্তাবশিষ্ট! মাদলেনীয় কালে শুধু মুণ্ড কবরের প্রথাও ছিল, ফ্রান্সের এক গুহায় কয়েক গাদা মাথা জড়ো করা আছে, এক ভাগের চতুর্দিক ছিদ্রিত শামুকের খোলা দিয়ে ঘেরা।

এই সব কঙ্কালের মধ্যে কখনও বা রোগের চিহ্নও দেখা যায়; কারও হাড় পচেছে জীবাণুর আক্রমণে, কেউ মরেছে বাতে। সে কালে শতকরা মাত্র দশ জন চল্লিশের বেশী বাঁচত, পঞ্চাশের বেশী এক জন। এদের পূর্ববর্তী নেয়ানডারটালরা ছিল আরও স্বল্পায়ু—প্রায় অর্ধেক মরত শৈশবে, চল্লিশের কোঠা পার হত এক শোতে মাত্র পাঁচ জন। পিকিং মানবের এক গুহায় চল্লিশের মধ্যে পনেরটি লোক মরেছিল চৌদ্দরও কম বয়সে তা আমরা আগে দেখেছি। হিংস্র পশুর আক্রমণে, আততায়ীর হাতে বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মৃত্যুর কথা ছেড়ে দিলেও, পুরা কালের মানুষ নিশ্চয় এমন রোগে মরত যা এখন আর মারাত্মক নয়; অবশ্য সভ্য যুগের কোনও কোনও রোগ (যেমন ক্যানসার বা হৃদ্‌রোগ) সে কালে বেশী ছিল না। কিন্তু মোটামুটি সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে শুধু আয়ু নয়, জনসংখ্যাও বেড়েছে। ক্রমবিকাশের পথে কোনও প্রাণীর সাফল্য বিচার করা হয় তার সংখ্যাবৃদ্ধির থেকে। যান্ত্রিক উদ্‌ভাবনের সাহায্যে মানুষ যদি নিজের শক্তি বাড়াতে না পারত, তবে এই নখদন্তহীন অনন্যোপায় দুর্বল প্রাণীটি আজ হয়তো তার নেয়ানডারটাল ভাইয়ের মত নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। এমন কি পুরাপ্রস্তর যুগের শেষ পর্যন্ত পৃথিবীতে তার স্থান খুব সুনিশ্চিত ছিল না, আজকের তুলনায় সংখ্যায় সে ছিল নগণ্য—সাম্প্রতিক পুরাপ্রস্তর মানুষের আনুমানিক জনসংখ্যা সর্বসাকুল্যে আধ কোটি থেকে এক কোটির মধ্যে তা আগে বলেছি এক জায়গায়; এর সঙ্গে সভ্য মানুষের কয়েকটি বাৎসরিক জনসংখ্যার তুলনা করা যেতে পারে: ১০০০ বিসি—১০ কোটি, ১৮০০ সাল—৯০ কোটি, ১৯৫৮ সাল—২৮০ কোটি। অথবা বলা যায় নিম্নলিখিত সালগুলির মধ্যে মানুষের সংখ্যা দ্বিগুণ বেড়েছে বা বাড়বে: ১-১৬০০-১৮০০-১৯০০-১৯৬০-২০০০ (৬০০ কোটি)। জীবন সংগ্রামে এক একটি জয় লাভের পরে মানুষ

দেখতে দেখতে বেড়ে উঠেছে। এর এক উদাহরণ কৃষির আবিষ্কার—খাদ্য সমস্যা সহজ হয়ে যাওয়ার পরেই দেখা যায় কবরের সংখ্যাও অনেক গুণ বেশী। আধুনিক দৃষ্টান্ত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইংলণ্ডের শিল্প-বিপ্লব যার শুরু বাষ্পীয় যন্ত্রের আবিষ্কারে ; ১৮০১ সালে সে দেশের জনসংখ্যা ছিল ১৬,৩৪৫,৬৪৬ আর ১৮৫১ সালে তা বেড়ে হল ২৭,৫৩৩,৭৫৫।

নতুন মানুষের আলোচনা থেকে আগে পরে অনেকটা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছি আমরা, প্রসঙ্গ ছিল সে কালের কবর। সেখানে সাজ সজ্জা ও অন্যান্য অবশিষ্ট যা পাওয়া যায় তার থেকে মনে হয় প্রকৃত মানুষের এই প্রভাত কালে সমাজে নারীর স্থান পুরুষের সমানই ছিল—বস্তুত 'সভ্যতার' আগমনের আগে স্ত্রীলোকের অধীনতার কোনও চিহ্ন দেখা যায় না। শিশুদের পোশাকের আড়ম্বর দেখে মনে হয় সে কালেও তাদের উপর অনেক-খানি স্নেহ ভালবাসা বর্ষিত হয়েছে ; এক জায়গায় দুটি শিশুর জামায় গাঁথা দু হাজারেরও বেশী ঝিনুক—হয়তো মায়েদের মনে ও সব খোলক ছিল পরজীবনের রক্ষাকবচ। হাতির দাঁতের বালা ফ্যাশান-দুরস্ত ছিল ; শিশুরাও তা পরত।

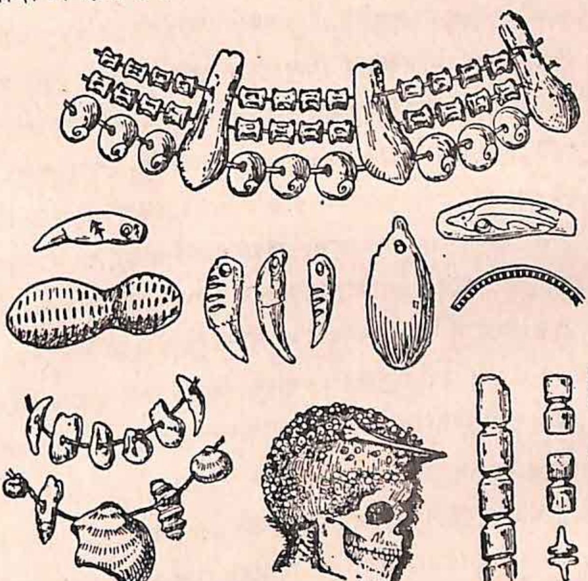
এ যাবৎ ঝিনুক ও কড়ি জাতীয় খোলক সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তাতে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে সে কালে ও সব বস্তুর কদর ছিল খুব বেশী।* ভূমধ্য ও ভারত সাগরের উপকূল থেকে তা সংগ্রহ করে দূর দূরান্তরে বয়ে নিয়ে যাওয়া হত। সে যুগে সম্ভবত কয়েকটি পরিবার একত্র বাস করত জ্যেষ্ঠদের অধীনে, যদিও ঠিক সর্দার বা দলপতির কোনও চিহ্ন মেলে না, যেমন মেলে না যুদ্ধ বিগ্রহের নির্দেশ কিছু, যথা বিশেষ ধরনের অস্ত্র, মানুষের ভাঙা হাড় অথবা ছবিতে যুদ্ধের রূপায়ণ ; এ সবই পাওয়া গিয়েছে পরে সভ্যতার সূচনার সঙ্গে সঙ্গে। অদৃশ্য অলৌকিক শক্তির ধারণা সে কালে মানুষের মনে নিশ্চয় বদ্ধমূল ছিল, কিন্তু দেব দেবীর কোনও প্রত্যক্ষ চিহ্ন তারা

---

* এর আগে নেয়ানডারটাল মানুষও যে এ সবের কদর বুঝেছিল সে কথা আগে বলেছি। আর বহু কাল পরে আজও আমরা 'টাকা'র সঙ্গে 'কড়ি' শব্দটা যোগ করি, এবং কিছু দিন আগেও (সিরাজুদ্দৌলার কাল পর্যন্ত) কড়ি এ দেশে টাকার কাজ করেছে। কড়ির এই ব্যবহার আফ্রিকা ও এশিয়ার অন্যত্রও দেখা যায়। মার্কো পোলোর কাহিনী অনুসারে সে সময়ে চীনের কোথাও কোথাও ভারতের আমদানী কড়ি মুদ্রার কাজ করত।

রেখে যায় নি। একমাত্র এক পৃথুলা স্ত্রীমূর্তির দেখা মেলে নানা জায়গায়, একে উর্বরতার প্রতিভূ সন্দেহ করে নাম দেওয়া হয়েছে জননী দেবী (mother goddess) ; এই মূর্তি বিভিন্ন রূপান্তরে দেশে দেশে মানুষ গড়েছে বহু সহস্র বছর ধরে ঐতিহাসিক কাল পর্যন্ত। একে কখনও বা 'ভিনাস'ও বলা হয়, যদিও রূপে সে মোটেই মনোহারিণী নয়। এর কথা আবার বলব পরবর্তী অধ্যায়ে সে যুগের ভাস্কর্য-শিল্পের আলোচনায়।

সে দিনের কোনও ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলাকে কল্পনা করতে চেষ্টা করলে অনেকটা এই রকম ছবি আমাদের চোখের সামনে ফুটে ওঠে : পরনে ঝিনুক-গাঁথা চামড়ার পোশাক, গলায় হার, হাতে বালা, মাথায় ঝিনুক ও



২৫নং চিত্র

খাঁটি মানুষের অলংকার ; হাতির দাঁত, মাছের দাঁত, হাড় ও ঝিনুকের তৈরি।

দাঁতের তৈরি মুকুট, কোমরবন্ধেও ঝিনুক আর খোলক ; মুখমণ্ডল ও অঙ্গ রক্তলাল রঙে রঞ্জিত। এ চেহারা দেখলে সহজে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া যায় না, এ যুগের রুজ-মাখা সুন্দরীরাও হয়তো বলবেন যে একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছে ; কিন্তু সে কালে সব কিছুরই সাংকেতিক অর্থ ছিল—যেমন ঐ রক্তোপম লাল গৈরিকের ছিল প্রাণদায়ক জাদু।

এই বর্ণনায় দেহসজ্জার একটি উপকরণ সম্ভবত বাদ পড়ে গিয়েছে—তা হল পাখির পালক। এর কোনও চিহ্ন অবশ্য এখন পর্যন্ত টিঁকে থাকা সম্ভব নয়, কিন্তু বিচিত্রবর্ণ কোমল পালকের মত এমন একটি চিত্তাকর্ষক বস্তু যে সে কালের ফ্যাশান-দুরস্ত মানুষ কাজে লাগায় নি তা ভাবাই যায় না। আজও রেড ইণ্ডিয়ানদের বেশভূষায় পালকের প্রতি পক্ষপাতিত্ব সর্বজনবিদিত। পুরাণ কাহিনীতেও উল্লেখ দেখা যায়; যথা, অ্যাজ্রটেক দেবপতি কেটজ্রাল-কোট্‌ল বাস করত এক রূপার গৃহে, তার ছাত নানা রঙের পালক দিয়ে তৈরি; বাড়ির চার দিকে চারটি ঘর, যথাক্রমে সোনা পান্না জ্যাস্‌পার এবং রঙিন ঝিনুক দিয়ে মোড়া। এখানে বহুমূল্য ধাতু ও মণির পাশাপাশি সামুদ্র খোলকের উল্লেখ লক্ষণীয়। তেমনি আইসল্যাণ্ডের এক পুরা-কাহিনীতে দেখা যায় বনদেবতার তিন প্রাসাদের বর্ণনা—একটি পাথরের, একটি কাঠের আর একটি হাড়ের তৈরি। আজ দিন কাল বদলে গিয়েছে, ঝিনুক বা হাড় দিয়ে এখন আর কেউ বাড়ি বানায় না, কিন্তু এ সব প্রাচীন উপকথা টিঁকে আছে প্রাক্তন মানুষের রুচি ও রীতির সাক্ষী হয়ে। ইরান মেকসিকো পেরু প্রমুখ বিবিধ দেশের পুরাণে এই একই গল্প দেখা যায় যে কোনও দেবতা বা অতিমানব মানুষকে চাষ বাস ও সভ্যতার অন্যান্য বিদ্যা শিখিয়েছে, তার আগে পশুচর্ম বাকল বা পাতা ছিল তার পরিধেয়, শিকার ও মূল ছিল তার উপজীব্য; প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে এ সব কাহিনীতে খাদ্য হিসাবে মূলের তুলনায় ফলের উল্লেখ বিরল—অথচ এ কালের ইতিহাসে ফলের স্থান অনেক উচ্চে।

দেশ বিদেশের পুরাণে এই ধরনের ঐক্য ও সাদৃশ্য আমরা আগেও লক্ষ করেছি, পরেও করব। ছোটখাটো বিষয়ের মিলও এক এক সময়ে হঠাৎ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মিশরের গল্পে দেখা যায় দেবী আইসিস তার স্বামী-ভ্রাতা ওসাইরিসকে হারিয়ে দূর দেশে এসে রানীর শিশু পুত্রের ধাত্রী হল; রানী এক রাত্রে দেখলে সে তার ছেলেকে জলন্ত আগুনের উপর শুইয়ে রেখেছে, ছুটে এসে তাকে তুলে নিয়ে যখন আইসিসকে তিরস্কার করলে তখন সে তার দেবিত্ব প্রকাশ করে জানালে যে ঐ উপায়ে রাজপুত্রকে সে অমরত্ব দান করছিল—কিন্তু এখন সব পণ্ড হয়ে গেল। গ্রীসের দেবী ডিমিটারের সম্পূর্ণ ভিন্ন কাহিনীতেও অনুরূপ একটি ঘটনা আছে, তবে সে

হারিয়েছিল তার মেয়েকে, তার পর মনের দুঃখে ঘুরতে ঘুরতে ঘটনাস্থলে এসেছিল। যেখানে মূলে একই সংস্কৃতি বা ভৌগোলিক সান্নিধ্যের প্রমাণ মেলে সেখানে এই ধরনের মিল দূর দেশের মধ্যেও সহজবোধ্য (যেমন ভারত ও আয়ার্ল্যাণ্ডের মধ্যে) ; কোনও কোনও ক্ষেত্রে লোকমুখে এক দেশের গল্প পৌঁছে থাকবে দেশান্তরে।

পুরাণ অবশ্য ইতিহাস নয়: ইতিহাস এক ও অপরিবর্তনীয়, পুরাণ কাল্পনিকতা ও অতিরঞ্জনে ভারাক্রান্ত, একই দেশে একই কাহিনীর বিভিন্ন বৃত্তান্ত মেলে পুরাণে। তা ছাড়া প্রাগিতিহাস, বিশেষত পুরাপ্রস্তর যুগ, এত দূর অতীতের কথা যে তার বিশেষ কোনও কালের সঙ্গে কোনও পুরাণ কাহিনীকে যুক্ত করা সম্ভব নয়। তবু পুরাণের গল্প পুরাকালকে সাধারণ ভাবে বুঝতে সাহায্য করে, পুরামানবের মধ্যে যোগাযোগের নির্দেশ দেয়, তাই তার ঐতিহাসিক মূল্য আছে—আর তাই এ বইতে পৌরাণিক কাহিনী বা বর্ণনার এত উল্লেখ।

এত কথা উঠল প্রাথমিক খাঁটি মানুষের পোশাক ও প্রসাধনের থেকে, কিন্তু বাইরের চেহারা ও সাজ সজ্জার তুলনায় সে কালের মানুষের মন, তার ধ্যান ধারণা ও ব্যবহার অনেকের কাছে বেশী কৌতূহলোদ্দীপক। এ ক্ষেত্রে সাক্ষাৎ প্রমাণ কিছু নেই—ব্যবহৃত বস্তু, কবর প্রথা ইত্যাদির থেকে যেটুকু ইঙ্গিত মেলে তার কথা আগে বলেছি। কিন্তু পণ্ডিতরা সেখানেই থেমে যান নি, এ কালের পৌরাণিক সম্প্রদায় ও তাদের সমাজ অনুশীলন করে তার সূত্র ধরে পথ খুঁজেছেন পুরাতনের অন্ধকারে, অথবা শুধুমাত্র যুক্তিসম্মত অনুমানই প্রকাশ করেছেন। এটা ঠিক যে সুসংবদ্ধ ধারাবাহিক চিন্তার ক্ষমতা মানুষ লাভ করেছে অনেক পরে ঐতিহাসিক কালে ; এই উক্তির অর্থ এ নয় যে আজকের সভ্য মানুষ আমরা সর্বদা যুক্তি দিয়ে নিজেদের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করি—অর্থ শুধু এই যে প্রাথমিক মানুষের জীবন ছিল প্রায় সম্পূর্ণ রূপে সাময়িক আবেগ আর কল্পনার বশবর্তী। তার মন ছিল শিশুর মন। শিশু যেমন গল্প বানাতে, গল্প শুনতে ভালবাসে, সহজে বিশ্বাস করে, সেও তেমনি প্রত্যক্ষ ও স্বপ্নে দেখা জিনিস নিয়ে গল্প বানাত, মুখপরম্পরায় বংশ-পরম্পরায় কিংবদন্তী ক্রমে পবিত্র সত্য হয়ে উঠল, পুরাণ বিধি ব্যবস্থা ধর্ম-বিশ্বাসে পরিণত হল। কোনও কোনও বস্তু, প্রাণী, প্রাকৃতিক ঘটনা বা

সংকেত অমঙ্গলের প্রতীক রূপে গেঁথে গেল মানুষের মনে। আর এই সব কিছুর ব্যাখ্যা, বাছ বিচার ও বিধানের জন্য গজিয়ে উঠল এ যুগের পুরোহিতদের আদি পিতৃপুরুষ—যার ইংরেজী নাম witch doctor, সে তুকতাক আর কুহক দিয়ে ভাগ্য পরিবর্তন করে, রোগ সারায়, সে স্বপ্ন বিচার করে, ভাল মন্দ নির্ণয় করে দেয়।

পরিবার বা গোষ্ঠীর যে কর্তা তার প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব বাড়ল সমাজের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ; সে শাস্তি বিতরণ করে, সে স্বপ্নে বারে বারে দেখা দেয়, ক্রমে ভয় ও ভক্তির আকর এই প্রবীণ দলপতিই হয়তো দেবতার প্রতিভূ হয়ে দাঁড়াল। সমাজ-বৃদ্ধির ফলে ক্রমে কিছু কিছু বিধি নিষেধও প্রয়োজন হয়ে পড়ল—লক্ষ করলে তার পরিণতি আজও দেখতে পাওয়া যায় একাধারে অসভ্য ও সুসভ্য সম্প্রদায়ে। যাকে বলা হয় ট্যাবু, অর্থাৎ আধুনিক আদিবাসী গোষ্ঠীর কড়া সুনির্দিষ্ট সামাজিক আইন কানুন, তার সূত্রপাত হয়তো সেই অতীতের অন্ধকারে। বিভিন্ন পরিবার বা গোষ্ঠীর মধ্যে স্ত্রী পুরুষের অবাধ মেলামেশায় সম্ভবত দল ভাঙার ভয় ছিল, অথচ যৌন আবেগ প্রবল, এ নিয়ে নিশ্চয় সে কালের ব্যবস্থাপকদের অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং পরিশেষে নিয়ম বেঁধে দিতে হয়েছে, যার থেকে পরে বিবাহ প্রথার উৎপত্তি।...

এই নতুন মানুষকে আর যেন অত অপরিচিত মনে হয় না ; শুধু তার আকৃতিতে নয়, প্রকৃতিতে, বসনে ভূষণে পছন্দে অপছন্দে, এমন কি সংস্কারে লোকাচারে এ যুগের নির্ভুল পূর্বাভাস। প্রধানত য়োরোপীয় মানুষের কথাই আমরা বলছি বটে, কিন্তু মনে রাখতে হবে যে এ মানুষ সেই অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বহু দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রাচীন পিকিং মানবের এলাকার মধ্যেই শোকোতিয়েনের এক গুহায় কয়েক লক্ষ বছর পরে আবার নতুন মানুষ গোষ্ঠীর দেখা মেলে। এরা যে প্লাইস্টোসিনের একেবারে শেষের দিকের লোক তার সাক্ষী রূপে রয়েছে বাঘ চিতা হায়েনা ভালুক উটপাখি ইত্যাদির প্রচুর পরিমাণ হাড়, এদের কৃষ্টি যে সাম্প্রতিক পুরাপ্রস্তর যুগের তা প্রতীয়মান পাথর ও হাড়ের তৈরি বিচিত্র অলংকার ও উপকরণের সম্ভারে। এক খুলির থেকে সাতটি পাথরের পুঁতি উদ্ধার করা হয়েছে, তার থেকে মনে হয় ঐ মাথায় কোনও এক রকম আভরণ বা আবরণ শোভা

পেয়েছিল এক কালে। পুঁতি রং করতে ব্যবহার হয়েছে হিমাটাইট (লোহাসম্বলিত খনিজ)। পশুর হাড় ও দাঁত এবং খোলক ছিদ্র করেও পুঁতি তৈরি হয়েছে, এর কোনও কোনও খোলক পাওয়া যায় ১০০-২০০ মাইল দূরে। একটি নুড়ি পাওয়া গিয়েছে যা সম্ভবত লাল হিমাটাইট দিয়ে রং করেছিল কেউ। মৃত ব্যক্তিদের হাড়ের গায়েও ঐ রং লেগে আছে, সম্ভবত অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার থেকে।

এই গুহায় খুলি আবিষ্কৃত হয়েছে চারটি, কিন্তু যা হাড় পাওয়া গিয়েছে তার থেকে বোঝা যায় যে সাতটি মানুষকে কবর দেওয়া হয়েছিল সেখানে—এক প্রৌঢ়, এক যুবক, দুই যুবতী, এক কিশোর, দুই শিশু (একটি পাঁচ বছরের, আর একটি ছোট)। কবর অনুষ্ঠানের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত থাকলেও এ দিকে কিন্তু খুলিগুলি দেখে মনে হয় ভারী অস্ত্রে ঘা মেরে তাদের ফাটানো হয়েছে ; পিকিং মানবের বহু কাল পরে আধুনিক মানব কি একই জায়গায় তার খুনীবৃত্তির পুনরাবৃত্তি করেছে? প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিদ হ্বাইডেনরাইখ অনুমান করেন যে এই সাত জন একই পরিবারের লোক এবং এরা হঠাৎ খুন হয়েছে কোনও রকমে: তিনি লিখেছেন, "এরা হয়তো এক শিকারীর পরিবার, ঐ গুহার ভিতরে অথবা কাছাকাছি এদের প্রধান আস্তানা ছিল ; আবার এমনও হতে পারে যে এরা চলেছিল নতুন কোথাও ঘর বাঁধতে, মারা পড়েছে পথে।" হাড়গুলি এমন ভাবে ছড়ানো যে মনে হয় সমাধিস্থ হওয়ার আগে অন্তত কোনও কোনও দেহ ছিন্ন বিছিন্ন হয়েছে ; গুহাটি যে নানা জানোয়ারের আড্ডা ছিল তাতে সন্দেহ নেই।

মৃত্যু যে ভাবেই ঘটে থাকুক ঐ খুলিগুলি পরীক্ষা করে তার প্রাচীন মালিকদের সম্বন্ধে যা জানা গিয়েছে তাতেও অনেকগুলি রহস্য নিহিত : ঐ ক'টি লোকের মধ্যে নানা জাতের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, এক 'পরিবারের' মধ্যে যা কিঞ্চিৎ বিসদৃশ! জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিটির মধ্যে হ্বাইডেনরাইখ আদি মংগোলীয় ছাঁচ লক্ষ করেছেন (প্রসঙ্গত, এর মেধাটি প্রকাণ্ড—১৫০০ সিসি), একটি স্ত্রীর মধ্যে মেলানেশীয় আর একটির এসকিমো ধারা দেখা যায়। অবশ্য আর এক জন বিশেষজ্ঞের মতে পুরুষটি আদি য়োরোপীয় ও অসট্রেলীয় জাতির সংমিশ্রণ হতে পারে—বর্তমান জাপানের আইনু জাতির মধ্যে তার নাকি প্রায় সম্পূর্ণ প্রতিচ্ছবি মেলে। আইনু মেয়েরা কপাল থেকে এক বেল্ট

ঝুলিয়ে তাতে ভার বহন করে, তার ফলে কপালের হাড় চ্যাপটা হয়ে আসে ক্রমে—প্রথম স্ত্রী-খুলিটিতে নাকি এই রকম কৃত্রিম পরিবর্তন দেখা যায়। কারও কারও মতে এরা সকলে একই ককেশীয় জাতির লোক, যে জাতি প্লাইস্টোসিনের অন্তিম কালে বাস করত পূর্ব এশিয়ায়; সুতরাং এই মতানুসারে এরা বর্তমান চৈনিকদের পূর্বপুরুষ নয়, যদিও এদের বংশধররা পূর্ব এশিয়ার এখানে ওখানে এখনও ছড়িয়ে আছে ছোট ছোট গোষ্ঠীতে।

কিন্তু সাধারণ ভাবে বলতে গেলে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কোনও স্বতন্ত্র সাম্প্রতিক পুরাপ্রস্তর কৃষ্টির নিদর্শন অল্প, অধিকাংশ অঞ্চলেই এ পর্যায়ের শিল্পে ও সমাজে নতুন কোনও পরিবর্তন লক্ষিত হয় নি এ পর্যন্ত, যেমন হয়েছে য়োরোপে বা আফ্রিকায়। অবশ্য উপরের উদাহরণটির মত ব্যতিক্রম কোথাও কোথাও দেখা যায়—চীনেরই উত্তরে অরডস মরুভূমির প্রান্তে, পর যুগের প্রসিদ্ধ মহাপ্রাচীরের অদূরে, সে কালের মানুষ ঘাঁটি বেঁধেছিল কয়েক জায়গায়, এরা নানা রকম পাত-যন্ত্র বানিয়েছে খুদবার খুবলাবার গর্ত করবার উদ্দেশ্যে, এক খণ্ড কাজ-করা হাড়ও পাওয়া গিয়েছে; এ সবের সঙ্গে আছে কাঠকয়লার টুকরো, সম্ভবত এদের চুলার থেকে এসেছে তা। এদের আমিষ খাদ্যের মধ্যে ছিল মরুর গাধা, হায়েনা, হরিণ, গরু, পশমী গণ্ডার এবং উট পাখির ডিম; পশুদের জল খাওয়ার জায়গায় ঘর বাঁধত শিকারীরা, ফলে শিকার যে মিলেছে সহজে তার সাক্ষী স্বরূপ রয়েছে নানা জাতির অস্থি-সম্ভার।

যন্ত্র উপকরণের সাদৃশ্য থেকে মনে হয় যে এই অরডস কৃষ্টি হয়তো আরও উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে দক্ষিণ সাইবেরিয়ার মানুষের কাছে ঋণী। এখানে সুজলা জমি অধিকার করে বহু আস্তানা গড়ে উঠেছিল সাম্প্রতিক পুরা-প্রস্তর কালে, বিশেষত ইয়েনিসাই নদীর উপত্যকায়; এর একটি প্রসিদ্ধ ঘাঁটির নাম মল্টা, সেখানে প্রথম দিকের অধিবাসীরা রেখে গিয়েছে মেরু-শেয়াল হরিণ, পশমী গণ্ডার এবং কিছু ম্যামথের হাড়, তা ছাড়া পাথর-পাত ও হাড়ের বিবিধ হাতিয়ার, তার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কাজ করা। ম্যামথের দাঁত খোদাই করে এরা গড়েছে উদ্ভট স্ত্রীমূর্তি ('ভিনাস'), পাখি ইত্যাদি। এরা আস্তানা বানাত মাটির নিচে, তার পাঁচটি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, ব্যবহৃত চুলা পাওয়া গিয়েছে ইতস্তত। এরা যে খাঁটি মানুষ (ক্রোমানীয়?) তা

বোঝা যায় একটি শিশুর কবর থেকে। কবরে গৈরিকের ব্যবহার ও শিরাভরণ সাইবেরিয়াতেও দেখা যায়। সম্ভবত ৬০০০ বিসির আগেই এ দেশের অলংকার, পুঁতি, রং-করা নুড়ি ইত্যাদির প্রচলন ছিল, সূচের ব্যবহার জানা ছিল, কুকুর ছাগল ভেড়া পোষা হত মাংসের জন্য। আরও পশ্চিমে নবপ্রস্তর যুগের উন্মেষ ঐ তারিখের খুব বেশী আগে নয়; পশ্চিমে সেই অঞ্চল ও পুবে চীনের মধ্যে সাইবেরিয়া কি সেতুর কাজ করেছে?

ভারতেও এ পর্যন্ত পুরাপ্রস্তর কৃষ্টির কোনও স্বতন্ত্র সাম্প্রতিক অধ্যায় স্পষ্ট করে চেনা যায় না কোথাও, সাবেক ধারাই চলে এসেছে মনে হয়; মধ্য ভারতে গোদাবরীর শাখানদী পর্ভরের উপরাংশে এবং বোম্বাই শহরের ২১ মাইল উত্তরে খানদিভ্‌লি নামক জায়গায় নতুন কৃষ্টির কিছু কিছু চিহ্ন মেলে হাতিয়ারের ধারা ও গঠন পদ্ধতির থেকে। কিন্তু যারা এ সব বানিয়েছে তাদের সাক্ষী বলতে আর কিছু আমাদের নেই—নেই এক খণ্ড হাড়, এমনকি আলংকারিক বা আনুষ্ঠানিক উপকরণ। কারনুল জেলার গুহায় নাকি পশুর ফসিল ও হাড়ের তৈরি উপকরণ পাওয়া গিয়েছিল। সে কালের লোকে সম্ভবত নদীর ধারে বাস করত, অথবা ঝরণার কাছাকাছি গুহায়, পশু পাখি শিকার করে খেত। অবশ্য ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের অনুসন্ধান ও অনুশীলনে এখন পর্যন্ত অনেক ফাঁক।

পুরাপ্রস্তর যুগের শেষ ভাগের মানুষ পূর্ববর্তীদের তুলনায় অস্ত্র বিদ্যায় ও শিকারে অনেক বেশী পারদর্শী। এর আগে নেয়ানডারটাল মানুষ বর্শার মাথায় পাথরের ফলক পরিয়ে সর্বপ্রথম অতিকায় জন্তুকে আক্রমণ করতে সাহস পেয়েছে, কিন্তু সেও হার মেনেছে আরও দুর্ধর্ষ শত্রু তুষারের কাছে, চেষ্টা করেছে পালিয়ে বাঁচতে। শেষ তুষার যুগের এই খাঁটি মানুষই প্রকৃতিকে অগ্রাহ্য তরে তারই ক্ষেত্রে তাকে পরাস্ত করেছে—মাথার বুদ্ধি ও হাতের কৌশলের জোরে।

আমাদের এই সাক্ষাৎ পিতামহদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রা সম্বন্ধে অনেক তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। তখনও প্রধানত শিকার ও আহার্যের অন্বেষণে দিন কাটে, তবে নেয়ানডারটালদের তুলনায় দলগুলি বেশী ভারি ও সংঘবদ্ধ, যার ফলে ও নতুন নতুন অস্ত্রের সাহায্যে শিকার ধরা অনেক

সহজ হয়ে এসেছে। এ দেশে যেমন কিছু দিন আগেও রাজারা মৃগয়ায় বার হতেন শরৎ কালে, সে যুগে তেমনি গ্রীষ্ম কালে এই শিকারী দলের পর্যটন শুরু হত পশুদের ঋতুগত পরিযাণের ক্ষেত্র লক্ষ করে ; এদের চলাচলের পথে চামড়ার তাঁবু ফেলে তারা অস্থায়ী ঘর বাঁধত। তাঁবুর মুখে খোলা উনান পাথর দিয়ে গোল করে ঘেরা, তাকে ঘিরেই দিনের যত কাজ। শিকার কমে এলে তাঁবু গুটিয়ে আবার নতুন দিকে যাত্রা। একই জায়গায় বসে যে অন্নসমস্যার সমাধান হতে পারে তা তখনও মানুষের কল্পনার বাইরে—পশুপালন ও কৃষি তখনও কিছু দূরে।

নেয়ানডারটাল মানুষ সম্ভবত কি উপায়ে ম্যামথ মারত সে সম্বন্ধে আগে আলোচনা করেছি। বৃহৎ জন্তুর শিকারে পরবর্তী খাঁটি মানুষ যে অধিকতর চাতুর্য দেখাবে এটাই আমরা আশা করতে পারি। আরও বড় দল পাকিয়ে তারা একই সঙ্গে এক পাল ঘোড়া বা ষাঁড় শিকার করত। সে কালের বুনো ঘোড়া দেখতে ছিল অন্য রকম, ছোট খাটো গড়ন, লোমশ দেহ—শিকারীরাই তাদের ছবি এঁকে রেখে গিয়েছে, সে কথা পরে বলছি। জায়গায় জায়গায় আগুন জেলে পথ বন্ধ করে, তার পর হাতে জলন্ত মশাল নিয়ে তাড়া করে সমস্ত ঘোড়ার দলকে তারা নিয়ে যেত গভীর খাদের দিকে ; সেখানে পৌঁছে নিরুপায় পশুরা গড়িয়ে পড়ত নিচে, হাত পা ভেঙেও যারা বেঁচে থাকত বল্লমের মুখে প্রাণ দিত তারা। ঘোড়ার মাংস যে সে কালের উপাদেয় খাদ্য ছিল তার অনেক প্রমাণ আছে। লক্ষ ঘোড়ার হাড় এক সঙ্গে পাওয়া গিয়েছে এক জায়গায়। চামড়াও কাজে লাগত।

ষাঁড়ের আকৃতি ছিল ঘোড়ার ঠিক বিপরীত, এ যুগের পোষ-মানানো জানোয়ারের তুলনায় অনেক বড়, প্রকাণ্ড ভয়ংকর শিং, অতি হিংস্র মেজাজ, এই অধুনালুপ্ত প্রাণীটির নাম অরকৃস (৩নং চিত্র দ্রষ্টব্য), সাইবেরিয়ায় এদের বরফ-জমা দেহ পাওয়া গিয়েছে তা আগে বলেছি। এরা যখন কোনও সংকীর্ণ গভীর পার্বত্য পথে ঢুকত তখন পাথর বা গাছ দিয়ে দু দিকের রাস্তা বন্ধ করে এদের ফাঁদে ফেলা সহজ হত। তার পর চলত হত্যাকাণ্ড, সে কাজেও বল্লম বা বর্শাই ছিল প্রধান অস্ত্র—যে বর্শা অন্তত দেড় লক্ষ বছর ধরে মানুষের প্রধান প্রহরণের কাজ করে এসেছে।

ভুক্তাবশিষ্ট যে হাড় আমাদের এই পূর্বপুরুষরা রেখে গিয়েছে তার থেকে চেনা যায় বলগা-হরিণ, ম্যামথ, পশমী গণ্ডার, মেরু-শেয়াল, বুনো ঘোড়া ইত্যাদি ঠাণ্ডা কালের জন্তুকে, বুনো ষাঁড়, বাইসন ইত্যাদি উষ্ণতর অঞ্চলের পশুকে, আর বন বা উপত্যকার অধিবাসী মাংসাশী জানোয়ার গুহা-ভালুক, বাদামী ভালুক আর সিংহ। এদের অনেকের ছবিও এঁকে রেখে গিয়েছে শিকারীরা।

তুষার যুগের শীত কাল নিশ্চয় খুবই কষ্টে কেটেছে মানুষের, কিন্তু তবু সে বেঁচেছে, যেমন বাঁচে আজকের এসকিমোরা। পার্বত্য অঞ্চলের লোক গুহা গহ্বরে আশ্রয় নিয়েছে, খোলা দেশের মানুষ তারই অনুকরণে ঘর বানিয়েছে অর্ধেক মাটির নিচে, খড় কিংবা চামড়ার ছাত দিয়ে। ঐ খুপরিটুকুর মধ্যে দিন কেটেছে নানা কাজে। মেঝের মাঝখানে আগুন জেলে মেয়েরা সেঁকেছে মাংস, তার উগ্র গন্ধে ও ধোঁয়ায় মাঝে মাঝে শ্বাস বন্ধ হয়ে এসেছে, ছায়া কেঁপে কেঁপে উঠেছে অন্ধকার কোণে কোণে। গৃহকর্তা অস্ত্র বানিয়েছে পাথর হাড় শিং বা কাঠ থেকে ঠুকে ঠুকে, অথবা তার হাতের কৌশলে মূর্তি পেয়েছে এক স্থূলা নারীর বিগ্রহ—পূজার উদ্দেশ্যে কিংবা সন্তান কামনায় তৈরি হয়তো। শিশুরা অবাক হয়ে দেখেছে বয়স্কদের কাজ, খেলার ফাঁকে ফাঁকে।

শীতের আগে সম্ভবত গৃহকর্তারা প্রাণপণে সঞ্চয় করেছে শিকার, ঘরের বাইরে বাইরে ঠাণ্ডায় মজুত করে রেখেছে সেই রসদ যাতে পচে না যায়, কাঁটা গাছের বেড়া দিয়ে ঘিরে দিয়েছে যাতে জন্তু জানোয়ারে চুরি না করতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও অকুলানের দিনে অল্প সময়ের জন্য তাদের বার হতে হয়েছে শীত অগ্রাহ্য করে, হরিণ কিংবা ম্যামথের খোঁজে। অপেক্ষাকৃত ছোট জানোয়ারের জন্য যে ফাঁদ পাতা থাকত এমন ইঙ্গিত আছে তাদের আঁকা ছবিতে। আর ক্ষুধা অসহ্য হয়ে উঠলে নিজেরই দুর্বল ভাই বা পঙ্গু বাপকে কি সে আক্রমণ করত না? অবশ্য এর কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই, যেমন আছে পিকিং মানবের ইতিহাসে।

অস্থায়ী হলেও এই সময়ে মানুষ প্রথম নিজের হাতে বাসঘর বানাতে আরম্ভ করেছে, যদিও গুহাবাস সে একেবারে ত্যাগ করে নি; এমন কি আজকের জগতেও গুহাবাসী সম্প্রদায় দেখা যায়, স্পেইন দেশের গ্রানাডা

অঞ্চলে কয়েক হাজার লোক এ ভাবে বাস করে। সেখানে সাক্রোমন্টি পাহাড়ের গায়ে এদের সরু লম্বা চুনকাম-করা গৃহগুলিতে বিদ্যুৎ, রেডিও এমন কি রেফ্রিজারেটারের পর্যন্ত ব্যবস্থা আছে—আধুনিক ফ্ল্যাট বাড়ির খাতিরেও এই আবাস তারা ছাড়তে রাজী নয়। (এরা প্রধানত বিদেশী পর্যটকদের নাচ দেখিয়ে জীবিকা অর্জন করে। এদের ভাষায় কিছুটা সংস্কৃত প্রভাব আছে—কারও কারও মতে অতীতে এরা ভারতে ছিল, সেখান থেকে ইরান ও মিশরের পথে গিয়েছে ও দেশে।) বিংশ শতাব্দীর এত সুখ সুবিধা প্রস্তর যুগের মানুষ তার গুহায় পায় নি বটে, তবু দক্ষিণ য়োরোপের মাদলেনীয় গুহাগুলিতে বাস ব্যবস্থার পারিপাট্য স্বচক্ষে দেখলে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। গুহা-জীবন শুনতে যতটা কষ্টকর মনে হয় আসলে ততটা হয়তো নয়।

তৎকালীন মানুষের এক সম্প্রদায় বর্তমান চেকোস্লোভাকিয়ার মোরাভিয়া অঞ্চলে নিজেদের জীবনযাত্রার একটি বিশেষ সম্পূর্ণ চিত্র রেখে গিয়েছে। অনুকূল প্রাকৃতিক অবস্থার ফলে তাদের ঘাঁটিগুলি প্রায় অক্ষত অবস্থায় মাটির নিচ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে, সেই কারণে তাদের সম্বন্ধে এত কিছু জানা সম্ভব হয়েছে। ১৮৮০ সালে অনুসন্ধানের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত ঘাঁটির সংখ্যা এক শোরও বেশী। প্রথমেই চোখে পড়ে ম্যামথ মাংসের প্রতি এঁদের পক্ষপাতিত্ব। প্রেডমস্‌ট নামক জায়গায় তারা যে প্রায় ১০০০ ম্যামথের খণ্ড কেটে এনেছিল তার সাক্ষ্য আছে। গুহা-ভালুকের সঙ্গেও লড়েছে এরা, জন্তুটি পিছনের পায়ে দাঁড়ালে তার উচ্চতা ১২ ফুট, স্বভাব অনেক বেশী হিংস্র এ কালের বংশধরদের চেয়ে। আর ম্যামথের আকৃতিই তো ভয়ংকর, বড় জাতের ম্যামথ নাকি আজকের হাতির চেয়েও উঁচু ছিল।

হয়তো মাটি খুঁড়ে ফাঁদ পেতে নেয়ানডারটাল মানুষ ম্যামথ মেরেছে এ কথা আগে বলেছি। এদের শিকার-কৌশলও সেই রকমই হয়ে থাকতে পারে। ডকটর আবসলম নামে এক বিজ্ঞানী দাবি করেন যে সত্যিই এ রকম এক ফাঁদ তিনি আবিষ্কার করতে পেরেছেন, এমন কি তার মধ্যে এক ম্যামথের কঙ্কালও পেয়েছেন। ইনি মনে করেন যে ফাঁদে-পড়া জন্তর প্রাণবায়ু বার করে দেবার জন্য সে কালের মানুষ আর এক নতুন ফন্দি আবিষ্কার করেছিল ; চামড়ার ঝোলার মাথায় পাথর বেঁধে তাই দিয়ে ঘা

মেরে মেরে ম্যামথের খুলি ফাটিয়ে দিত তারা। তাদের সরঞ্জাম ও গহনা অধিকাংশই ম্যামথ-হাড়ের বা দাঁতের তৈরি।

এরা বাস করত সারিবাঁধা চামড়ার তাবুতে বা ঘরে। কাছেই প্রকাণ্ড চুলা আর আঁস্তাকুড়। খাওয়ার পরে হাড়গুলি সব সযত্নে ভাগ ভাগ করে সাজিয়ে রাখা হত—ম্যামথের দাঁত, চোয়াল, ভাঙা খুলি (ঘিলু ছিল পরম লোভনীয় বস্তু) সব আলাদা আলাদা স্তূপে ; কাজের জন্য যখন যে হাড় দরকার তা পেতে দেরি হত না একটুও। কাজ মানে কেবল দরকারী অস্ত্র আর সরঞ্জাম নয়, দাঁত বা হাড়ের ছোট ছোট খণ্ড গর্ত করে বহু যত্নে তৈরি হত গলার হার, হাতের বালা আরও কত অলংকার। হাড় এবং দাঁতের উপর নানা রকম জটিল নকশার কাজও দেখা যায় যার হয়তো কোনও সাংকেতিক অর্থ ছিল। আর গহনা ছাড়াও দেহ সাজাত তারা সাদা, লাল আর হলদে রং মেখে ; সাক্ষী রয়েছে রং গুড়োবার বাটি ও নোড়া, এখনও রঙের চিহ্ন তার গায়ে। এক ফাঁপা হাড়ে কে যেন ভরেছিল লাল রঙের চূর্ণ, এত কাল পরে আবার তাতে মানুষের হাতের ছোঁয়া লেগেছে।

মৃতের প্রতি যত্ন ও শ্রদ্ধার চিহ্ন পাওয়া যায় এক সাম্প্রদায়িক কবরে। আটটি শিশু ও বারোটি বয়স্ক ব্যক্তির দেহ এক সঙ্গে রক্ষিত, কবরের উপরে নিচে পাথরের গাঁথনি, এক দেয়ালের গায়ে ম্যামথের চোয়াল সোজা করে বসানো, অন্য দেয়ালে কাঁধের হাড় সারি দিয়ে সাজানো।

বহু কাল খোলা জায়গায় বসবাসের পর শীতের তাড়নায় শেষ কালে এদের গুহায় আশ্রয় নিতে হয়েছিল। ম্যামথ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, এল বল্গা-হরিণ আর বুনো-হরিণ। তার পর অকস্মাৎ এক দিন এই মানুষের গোষ্ঠীও উধাও হয়ে গেল। এদের তিরোধানের মতই রহস্যময় য়োরোপে এদের প্রথম আবির্ভাব। কোথায় যে এদের উদ্ভব তা কেউ জানে না। খুলিতে অসট্রেলিয়ার আদিবাসীদের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে, সাজ সজ্জা অলংকার ও ভাস্কর্যেও মিল দেখা যায়। আবার অসট্রেলীয় খুলি ভারতেও পাওয়া যায়। এর থেকে কেউ কেউ মনে করেন যে এদের পিতৃপুরুষদের বাস ছিল মধ্যবর্তী কোনও অঞ্চলে—হয়তো কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণে—সেখান থেকে তারা ছড়িয়ে পড়েছিল দু দিকে। নেয়ানডারটালদেরও

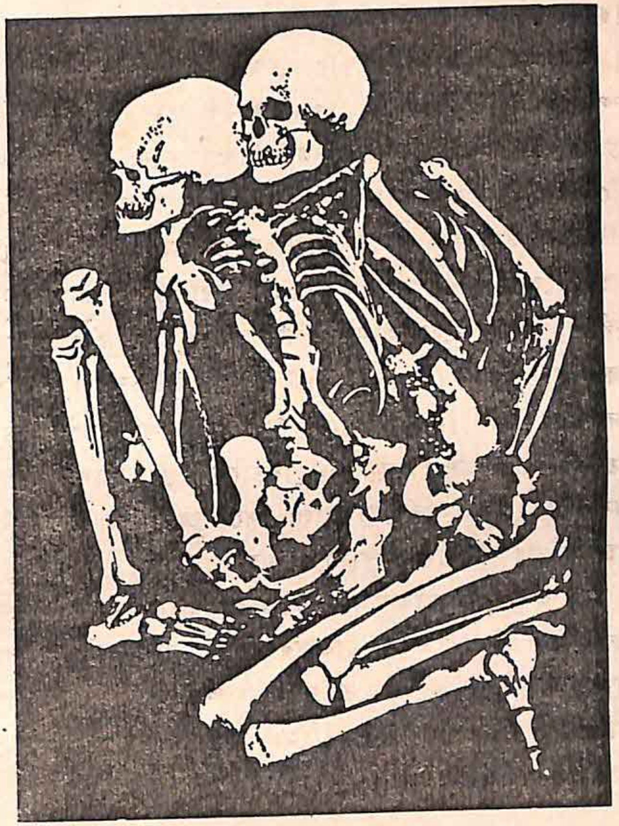
সম্ভবত সেই দিকে ঘর ছিল, তার থেকে এ কথাও বলা হয়েছে যে সেখানে হয়তো এদের মধ্যে রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছে কিছুটা, এবং তারই ফলে এই খাঁটি মানুষের চেহারা পুরোপুরি 'ভদ্র' বা মার্জিত নয়।

এই পুরোপুরি মার্জিত বলতে বোঝায় যে মানুষ সেই ক্রোমানীয় মানবের উল্লেখ করেছি আগে, ওরিনাসীয় কৃষ্টির আলোচনা প্রসঙ্গে; এর নামকরণ ফ্রান্সের এক গ্রামের এক শিলাশ্রয়ের নামে। এখানে ১৮৬৮ সালে, নেয়ানডারটাল মানুষ আবিষ্কারের মাত্র ১২ বছর পরে, পাঁচটি সম্পূর্ণ ও সুসংরক্ষিত কঙ্কাল পাওয়া যায়—এক বৃদ্ধ, দুই যুবক, এক স্ত্রীলোক ও এক শিশুর। বৃদ্ধ ব্যক্তিটির মগজের মাপ ১৬০০ সিসি, অর্থাৎ এ কালের অধিকাংশ লোকের চেয়ে বেশী। পরে য়োরোপের অন্যত্র আরও অনেক কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে। নেয়ানডারটালদের সঙ্গে ক্রোমানীয়দের পার্থক্য যেমন স্পষ্ট, অন্য দিকে আজকের মানুষের তুলনায় মৌলিক প্রভেদ নগণ্য। এদের দেহ দীর্ঘ (পাঁচ ফুট ১১ ইঞ্চি, নাক উঁচু) কপাল সোজা, চোয়াল দৃঢ়, ঘাড় সম্পূর্ণ খাড়া, পা লম্বা, তারও হাড় সোজা। এক পুরুষ কঙ্কালের দৈর্ঘ্য ছ ফুটেরও বেশী, এক স্ত্রী-খুলির মগজ মাপে এ কালের সাধারণ পুরুষকেও হার মানায়। সে কালের জাতিদের মধ্যে ক্রোমানীয় মানুষ দেখতে সব চেয়ে সুশ্রী ছিল, চেহারার ধরন ছিল অনেকটা আজকের রেড ইণ্ডিয়ানদের মত। এরা এবং ঐ সদ্যবর্ণিত মোরাভিয়াবাসী ম্যামথশিকারী জাতিই বর্তমান য়োরোপীয়দের জন্মদাতা বলে অনেকে মনে করেন।

ফ্রান্স ও ইটালির সীমানায় গ্রিমালডি নামক জায়গায় এদেরই সমসাময়িক আর এক জাতি নিজেদের কঙ্কাল রেখে গিয়েছে, তা পরীক্ষা করে অনেকে সন্দেহ করেছেন যে এরা নিগ্রোদের পূর্বপুরুষ (বর্তমান জগতে আফ্রিকার বুশম্যান ও হোটেনটটরা এদের সবচেয়ে কাছাকাছি), কিন্তু এ প্রশ্নের সম্পূর্ণ মীমাংসা এখনও হয় নি।

এই প্রসঙ্গে খাঁটি মানুষের উদ্ভব সম্বন্ধে দু কথা বলা দরকার এখানে। আশ্চর্যের বিষয় যে পণ্ডিতদের মাথায় এমন ধারণাও গজিয়েছে যে বিভিন্ন জাতির উৎপত্তি বিভিন্ন প্রাণীর থেকে—যেমন শ্বেতাঙ্গরা শিমপানজি জাতীয়, পীতাঙ্গরা ওরাং জাতীয় এবং কৃষ্ণাঙ্গরা গরিলা জাতীয় আদি পুরুষের বংশধর। এই অদ্ভুত তত্ত্ব গ্রহণের পথে এত বাধা বিপত্তি এবং ক্রমবিকাশ-

বাদের তা এতই পরিপন্থী যে এ সম্বন্ধে আর কোনও মন্তব্য বাহুল্য হবে। যে সব পণ্ডিতরা এশিয়া ও আফ্রিকার ছোঁয়া থেকে নিজেদের জাতকে বাঁচাতে বদ্ধপরিকর হয়তো তাঁদেরই মাথায় এমন ধারণার উৎপত্তি সম্ভব।



২৬নং চিত্র

গ্রিমাল্‌ডি মানবের কঙ্কাল ; নারী ও যুবক।

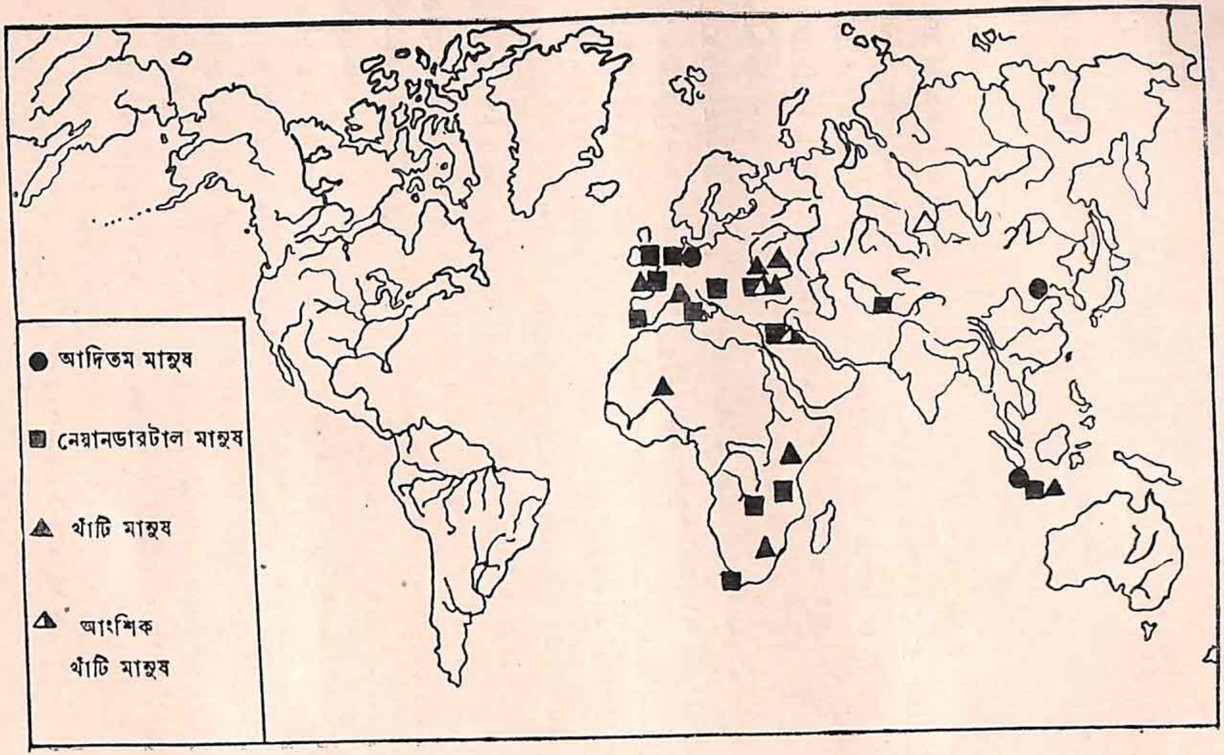
ডারউইনের পরে যখন ক্রমবিকাশের আলোচনা জমে উঠেছিল তখন এঁরা অনেকে এ কথাও বলেছেন যে বিভিন্ন জাতিগুলি শ্রেষ্ঠ মানুষ (অর্থাৎ য়োরোপীয়) সৃষ্টির পথে বিভিন্ন ধারা।

বর্তমান জগতের প্রধান জাতিগুলির উদ্ভব হয়ে গিয়েছে পুরাপ্রস্তর যুগ

শেষ হওয়ার আগেই, এবং এরা সকলে একই প্রজাতির (হোমো সেপিয়েন্‌স) বিভিন্ন প্রকার (variety) মাত্র। দেহের গড়ন আকৃতি বর্ণ চুল ইত্যাদির বিশেষত্ব সবই জাতিগত পার্থক্য, প্রজাতিগত নয়, এবং এই প্রকার-ভেদ প্রধানত ভৌগোলিক ও জলবায়ু জনিত কারণে। নিগ্রো মংগোলীয় শ্বেতাঙ্গদের পার্থক্য নানা জাতের কুকুরের সঙ্গে তুলনীয়।

এটা বোঝা যাচ্ছে যে পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে খাঁটি মানুষকে প্রথম যখন আমরা স্পষ্ট করে চিনতে পারছি তখন থেকেই তার মধ্যে আজকের মত জাতিগত বৈষম্য চোখে পড়ছে। বর্তমান নিগ্রো ও রেড ইণ্ডিয়ানে যতখানি পার্থক্য সে কালের ক্রোমানীয় ও গ্রিমাল্‌ডি মানুষে তার চেয়ে কম নয়। হ্বাইডেনরাইখ প্রস্তাব করেছিলেন যে প্রথম থেকেই পৃথিবীর চারটি পৃথক অংশে মানুষ গড়ে উঠেছে চার ভাগ হয়ে: য়োরোপীয়, মংগোলীয়, নিগ্রো, ও অসট্রেলীয়; তাদের মধ্যে কোনও সম্পর্ক ছিল না। আর এক মতানুসারে প্রায় লক্ষ বছর আগে (তখনও খাঁটি মানুষ সৃষ্টি হয় নি) দুটি প্রধান জাতিভেদ ঘটে, এশিয়ায় উত্তর-পূর্বে দেখা দিল আদি-এশীয় ও আদি-মংগোলীয় জাতি, দক্ষিণ-পশ্চিমে দুই বিভাগে গড়ে উঠল ইউরেশীয় ও নিগ্রো-অসট্রেলীয়। বর্তমানে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ কিন্তু মনে করেন যে খাঁটি মানুষের একটি প্রধান শাখার থেকেই বিভিন্ন জাতির উৎপত্তি। আসলে ঠিক কখন যে বর্তমান জাতিগুলির বিভাগ ঘটেছে তা আমরা এখনও জানি না। সাম্প্রতিক পুরাপ্রস্তর যুগের এই জাতিগত পার্থক্যের মধ্যে আবার এই ইঙ্গিতও থাকতে পারে যে আসলে আরও অনেক আগে, প্লাইস্‌টোসিনের গোড়ার দিকে, হোমো সেপিয়েন্‌সের অদ্বিতীয় পূর্বপুরুষ পৃথিবীতে এসেছে; এই সম্ভাবনার স্বপক্ষে অন্যান্য সাক্ষ্যের কথা আগে বলেছি।

এমন কি ক্রোমানীয় মানুষও সর্বত্র ঠিক এক ছাঁচে ঢালা নয়। সবচেয়ে যারা সুগঠিত তারা ছ ফুট দু ইঞ্চি লম্বা, তাদের মাথার আকৃতি সুন্দর, কপাল ও চিবুক সুস্পষ্ট—আজকের য়োরোপীয়দের ভীড়েও তাদের এক জনের প্রতি সপ্রশংস দৃষ্টি পড়বে সহজেই। সংমিশ্রণের ফলে এদেরই থেকে অন্যান্য শাখার সৃষ্টি হয়েছিল, তাদের কারও কারও সঙ্গে অসট্রেলিয়া মিশর বা ভারতের আদিবাসীদের মিল দেখা যায়। কিন্তু এই সব উপজাতি



২৭নং চিত্র

পৃথিবীর এই নির্দিষ্ট অংশগুলিতে পুরামানবের চিহ্ন মিলেছে।

সে কালে একই পরিবেশে বাস করত, তাদের সাধারণ জীবনযাত্রা রীতি নীতিও ছিল একই রকম।

এই সব পার্থক্য ছাড়া আর একটা জিনিসেও বর্তমানের পূর্বাভাস লক্ষিত হয়—তা হল সামাজিক জীবনের সূচনা। তৎকালীন মানুষের অবশিষ্ট চিহ্ন থেকে বোঝা যায় যে পূর্ববর্তীদের ছোট ছোট পারিবারিক গোষ্ঠীর তুলনায় এদের সম্প্রদায় আরও বড় আরও সংহত হয়ে উঠেছিল। নতুন মানুষের দলীয় শিকার পদ্ধতি আমরা দেখেছি, মোরাভিয়াবাসীরা পাশাপাশি সারিবাঁধা ঘরে বাস করত, হয়তো একত্র রান্না করত, বারোয়ারি হাড়ের স্তূপ যত্নে রক্ষা করত তাও লক্ষ করেছি। ক্রোমানীয়দেরও এক ঘাঁটিতে যে লক্ষ ঘোড়ার হাড় পাওয়া গিয়েছে তার অর্থ এই যে বছরের পর বছর সেখানে একই ঘটনা ঘটত, অর্থাৎ ভ্রাম্যমান মানুষের জীবনে কিছুটা স্থিতিশীলতা এসে গিয়েছিল, যদিও এই ধারার সম্পূর্ণতা এসেছে আরও ১৫,০০০ বছর পরে, চাষ আবিষ্কারের ফলে। কিন্তু ২৫,০০০ বছর আগে যারা ঘোড়ার হাড় জমিয়েছে তারা নিশ্চয় কিছুটা শিখেছে সহযোগিতার গুণ, সাম্প্রদায়িক জীবনের সুবিধা, পারস্পরিক অবিশ্বাসের বা পারিবারিক কলহের দোষ ও অসুবিধা। সে শিক্ষা অবশ্য আজ এই আণবিক যুগেও সম্পূর্ণ হয় নি।

আমাদের সাবেক পূর্বপুরুষদের চেহারা ও জাতিগত কৃষ্টিগত বিভেদ, ব্যবহারের যন্ত্রপাতি অস্ত্রশস্ত্র সাজ সরঞ্জাম, খাদ্য-সংগ্রহ ও সামাজিক জীবনের কিছুটা আভাস দেওয়া হল। এ বার পালা এসেছে সবচেয়ে আশ্চর্য জিনিস যা তারা রেখে গিয়েছে সে সম্বন্ধে দু কথা বলবার। তার জন্য পৃথক এক অধ্যায় দরকার।

১১। আঁধারের ফুল গুহাচিত্র

১৮৭৯ সালে এক স্পেনীয় প্রত্নবিদ, নাম সাউটুওলা, তাঁর ছোট মেয়ের হাত ধরে এক গুহার মধ্যে ঢুকলেন। এর চার বছর আগে আর এক বার তিনি এই গুহার অভ্যন্তর পরীক্ষা করেছিলেন, কিন্তু আশ্চর্য কিছু চোখে পড়ে নি। এ বারও হয়তো ফল তাই হত যদি না তাঁর মেয়ে থাকত সঙ্গে। গুহার ছাত নিচু, হেঁট হয়ে তিনি পাথর খুঁজে চলেছেন, মেয়ে এক বাতি হাতে করে এ দিক ও দিক ঘুরে বেড়াচ্ছে, হঠাৎ সে চীৎকার করে উঠল, "টোরো, টোরো (ষাঁড়, ষাঁড়)!" ঘাড় বেঁকিয়ে তার দৃষ্টি অনুসরণ করে সাউটুওলা দেখলেন এক আশ্চর্য দৃশ্য : গুহার ছাত খিলানের মত গোল, তা জুড়ে নানা রঙে আঁকা বা খোদাই করা বহু পশু-মূর্তি—পরস্পরের গা ঘেঁষে বিবিধ ভঙ্গিতে ষাঁড়, ঘোড়া, হরিণ, বাইসন ইত্যাদি। অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ গুহার অভ্যন্তরে অন্যান্য কক্ষ ও সুড়ঙ্গগুলি পরীক্ষা করলেন, সর্বত্র পেলেন আরও অনেক ছবি। প্রত্নতত্ত্বের আবিষ্কারে যারা নাম রেখেছে তার মধ্যে এই পাঁচ বছরের মেয়েটিই ক্ষুদ্রতম; বোধ হয় এই ক্ষুদ্রতাই ছিল তার প্রধান সহায়, যার ফলে সে সোজা হয়ে ছাতের দিকে তাকাতে পেরেছিল।

এই আলতামিরা গুহার নাম সে দিন খুব কম লোকেই জানত, কিন্তু আজ তা বিশ্ববিখ্যাত। অবশ্য এই আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই যে গুহাটি খ্যাতি অর্জন করেছে তা নয়, বরং বিশেষজ্ঞদের অবিশ্বাসের ফলে প্রসঙ্গটা

বেশ কিছু দিন চাপা পড়ে ছিল। ছবিগুলির শিল্পী যে-প্রস্তর যুগের মানুষ সাউটুওলার এই দাবি অনেকেই হেসে উড়িয়ে দিলেন ; এমন কি এক জন এ কথাও বললেন যে আসলে তাঁর প্রথম ও দ্বিতীয় পরীক্ষার মধ্যে ছবিগুলি কেউ এঁকে রেখে গিয়েছে।

আলতামিরাই যে গুহাশিল্পের প্রথম আবিষ্কার তা নয়। ফ্রান্সের কোনও কোনও অঞ্চলে গুহার গায়ে আঁকা ছবি অনেক আগেই লোকের চোখে-পড়েছে। শুধু আঁকা ছবিই নয়, কোথাও এক খণ্ড হাড়ের গায়ে খোদাই করা হরিণ মূর্তি, কোথাও বা ম্যামথের দাঁতে উৎকীর্ণ ম্যামথেরই মূর্তি বিশেষজ্ঞদের হাতে পর্যন্ত পৌঁছেছে। কিন্তু যদিও উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এ তথ্য নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে এক কালে মানুষ পাশাপাশি বাস করেছে এই ভাবে রূপায়িত অধুনালুপ্ত অনেক পশুর সঙ্গে, তবু মাত্র বর্তমান শতাব্দীর শুরুতে, নানা অঞ্চলে নব নব আবিষ্কার ও প্রমাণের ফলে, পণ্ডিতরা একমত হয়েছেন যে গুহাচিত্র ও গুহাশিল্প হাজার হাজার বছর প্রাচীন মানুষের কাজ। আলতামিরার পৌরাণিকতাও এই সময়ে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হল, এবং তার পর থেকে দু চার বছর অন্তর অন্তর নতুন নতুন চিত্রিত গুহা আবিষ্কার হয়ে চলেছে, আজও চলছে। এর একটা কারণ এই যে ও সব দেশে সম্প্রতি গুহা-অনুসন্ধানের নেশা অনেককে পেয়ে বসেছে, যেমন তারও আগে উঁচু থেকে আরও উঁচু পাহাড় জয় করার বাতিক ছড়িয়ে পড়েছিল। এই নেশা মোটেই বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, অনেক ক্ষেত্রেই প্রত্নতত্ত্বের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই— সব চেয়ে বড় প্ররোচনা বোধ হয় কঠিন কাজ সম্পন্ন করার, দুর্জয়কে জয় করার তৃপ্তি। যাই হক, এই বাতিকের চর্চার থেকে যে সব কৌশল ও কর্মপদ্ধতির সৃষ্টি হয়েছে তা যে পুরাতত্ত্বকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

আর একটি প্রসিদ্ধ সাম্প্রতিক আবিষ্কারের গল্প এখানে বলা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রেও আবিষ্কর্তার বয়স অল্প। মাত্র ১৯৪০ সালের কথা, তারিখ ১২ সেপ্টেম্বর। ফ্রান্সের পেরিগর প্রদেশে (সাম্প্রতিক পুরাপ্রস্তর যুগের পেরিগরদীয় কৃষ্টির কথা আগে বলেছি, এই জায়গার থেকেই তার নামকরণ) এক বনময় মালভূমিতে চারটি বালক ঘুরে বেড়াচ্ছে একদা ;

৩০০ ফুট নিচে ভেজ্রের নদীর উপত্যকা, অদূরে মঁতিনিয়াক (Montignac) শহর। হঠাৎ তাদের পোষা কুকুর এক গর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। কয়েক বছর আগে ঝড়ে একটা গাছ পড়ে যাওয়ায় গর্তটি উন্মুক্ত হয়েছে, কিন্তু ভিতরে কি আছে তা দেখবার কথা কারও মনে হয় নি ; বরং স্থানীয় চাষীরা ডালপালা দিয়ে তার মুখটা ঢেকে দিয়েছে যাতে তাদের পশুরা তার মধ্যে পড়ে না যায়।

কুকুরকে ডাকাডাকি করে কোনও ফল হল না, তখন একটি ছেলে কিছু খোঁচা সহ্য করে নেমে পড়ল গহ্বরে। কিছু ক্ষণ পরে তার পা ঠেকল ভিজে পিছল ঢালু জমিতে, ক্রমে সে এসে দাঁড়াল প্রায় ৫২ ফুট গভীর এক নিচু সুড়ঙ্গে। তত ক্ষণে তার বন্ধুরা ও কুকুরটাও এসে জড়ো হয়েছে, কিন্তু চতুর্দিকে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার—দেশলাই জ্বেলে জ্বেলে সব কাঠিগুলি শেষ হয়ে গেল, কিন্তু কিছুই দেখা গেল না। অগত্যা সে দিনের মত আবার তারা দিবালোকে ফিরে এল গর্তের মুখ বেয়ে।

ভেজ্রের উপত্যকায় চিত্রিত গুহা আগেও পাওয়া গিয়েছে, এবং ঐ অঞ্চলের স্কুলে প্রাগিতিহাস সম্বন্ধে কিছু কিছু শেখানো হয়। সুতরাং খুব উত্তেজিত অবস্থায় ছেলেরা সে রাতটা কাটালে, কাউকে কিছু বললে না। পর দিন দড়ি আর বাতি হাতে নিয়ে আবার তারা ঢুকে পড়ল গর্তে ; সেই নিচু সুড়ঙ্গ পেরিয়ে এক প্রকাণ্ড ডিমাকার কক্ষে উপস্থিত হয়ে যা তারা দেখলে তা তাদের নিঃশ্বাস কেড়ে নিল। প্রতিটি দেয়াল জুড়ে ছাত পর্যন্ত আঁকা অতিকায় ষাঁড়ের মূর্তি, তাদের আশেপাশে ঘোড়া হরিণ ও আরও অন্যান্য প্রাণীর আভাস। ঘরটির থেকে যে আরও দুটি সুড়ঙ্গ বেরিয়ে গিয়েছে তাদের গায়েও লাল হলদে কালো বাদামী প্রভৃতি কত রং ও কত প্রাণীর বন্যা তাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিলে। কেউ একা, কারা আবার সারি বেঁধে চলেছে বা জট পাকিয়ে রয়েছে ; কেউ আঁকা, কেউ বা খোদাই করা। চার বন্ধু ছুটে এল তাদের স্কুলের মাষ্টার মশায়ের কাছে, তিনি এসে স্বচক্ষে দেখে বিশেষজ্ঞদের জানালেন। অল্প দিনের মধ্যে এঁরা এসে পড়লেন, পরীক্ষা করে বললেন যে প্রস্তর যুগের গুহাগুলির মধ্যে এই লাস্‌কো-র স্থান অতি উচ্চে। দেখতে দেখতে খবর ছড়িয়ে পড়ল, ছোট্ট ঘুমন্ত শহর মঁতিনিয়াক উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে উঠল, এল সাংবাদিক ফোটোগ্রাফার

পর্যটক ; যাতে কেউ কোনও ক্ষতি না করে তার তদারক করতে গুহার মুখে পাহারায় বসল সেই চার বন্ধু।

আজ সেখানে সিমেন্টের পথ ও সিঁড়ি তৈরি হয়েছে, বিজলি বাতি বসেছে, প্রতি বছর হাজার হাজার লোক আসে বেড়াতে (তাদের দেখাবার জন্য কাজে বাহাল হয়েছিল সেই ছেলেদের মধ্যে দু জন)। দক্ষিণ-পশ্চিম য়োরোপের এই সব গুহা সুড়ঙ্গ গম গম করে ভীড়ে, উজ্জ্বল আলোয় লোকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে পৌরাণিক মানুষের কারুকাজ, বিস্ময়বিমুগ্ধ হয়ে ফিরে যায়। সে কালের শিল্পীদের ছিল না এত ব্যবস্থা, এত সুবিধা ও সরঞ্জাম ; কিন্তু তাদের মিটমিটে প্রদীপের অস্থির আলোতেই হয়তো এই নিশ্চল পশুর দল প্রাণবন্ত হয়ে উঠত, নির্জন নিঃশব্দ প্রায়ান্ধকার কক্ষে সেই বিরাট শোভাযাত্রা যে বিস্ময় উদ্রেক করত তার অনুভব সম্ভব নয় বৈদ্যুতিক আলোতে, অনেক লোকের ভীড়ে।

এরা কারা? কেন এরা মাটির নিচে জলসিক্ত অন্ধকার কক্ষে সুড়ঙ্গে এত যত্নে এত কষ্টে ছবি এঁকেছে? সেই উদ্দেশ্যে সংকীর্ণ ছিদ্রপথ দিয়ে এরা ক্রমশ ভিতরের দিকে ঢুকেছে—হয়তো হামাগুড়ি দিয়ে ; উঁচু দেয়াল বা ছাতের কাছে পৌঁছাবার জন্য কত বিপদ অগ্রাহ্য করেছে। তা কি শুধু সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রেরণা? এখন বিশেষজ্ঞরা অনেকেই আর তা মনে করেন না। কিন্তু কি তাদের উদ্দেশ্য ছিল তার আলোচনার আগে তাদের কাজের সঙ্গে আর একটু ভাল করে পরিচয় করা দরকার।

গুহাশিল্পের কেন্দ্রস্থল দক্ষিণ-পশ্চিম য়োরোপ, এবং তার ভৌগোলিক পরিধি অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ। অধিকাংশ চিত্রিত গুহা আবিষ্কৃত হয়েছে ফ্রান্স ও স্পেইন দেশে। ফ্রান্সের ভেজ্রের উপত্যকায় লাস্কো ও অন্যান্য গুহায় অনেকগুলি আশ্চর্য ও সুন্দর নিদর্শন অল্প জায়গার মধ্যে অবস্থিত। এ সব অঞ্চল ছাড়া আরও দূরে চার দিকেই কিছু কিছু নমুনা পাওয়া গিয়েছে, কিন্তু সংখ্যায় বা গুণে তা সামান্য—য়ুগোস্লাভিয়ার এক গুহার গায়ে উৎকীর্ণ এক মাছের প্রতিকৃতি, ইটালিতে কিছু প্রাথমিক খোদাইয়ের কাজ, বেলজিয়ামে ক্ষোদিত পাথরের খণ্ড। এই প্রসঙ্গে পাথরের গায়ে তুলি বা খোদাইয়ের কাজ ছাড়া অন্য ধরনের শিল্পের কথাও আমাদের মনে রাখা

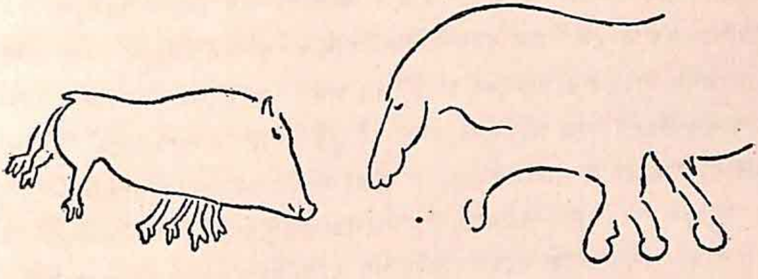
দরকার : ভাস্করের হাতে গড়া ছোট বড় মূর্তি, হাড় গজদন্ত বা শিলাখণ্ডের গায়ে উৎকীরণ অথবা ভাস্কর্য শিল্পের নমুনা (প্রায়ই জন্তু জানোয়ারের রূপায়ণ), অস্ত্র বাতি ইত্যাদি ব্যবহারের বস্তুর গায়ে কারুকাজ। এ সবের নিদর্শন গুহার মধ্যে, মুখে এবং বাইরেও পাওয়া গিয়েছে এবং এদের ও প্রাচীর-শিল্পের ভৌগোলিক অবস্থান সর্বদা এক নয়; যেমন, ওরিনাসীয় কালের যে তথাকথিত ভিনাস মূর্তি বা জননী-দেবীর কথা আগে বলেছি তার নমুনা পাওয়া যায় মধ্য য়োরোপে, এমন কি সাইবেরিয়ায় পর্যন্ত।

গুহাচিত্রের বিষয়বস্তু ও অঙ্কনধারার মধ্যে সাধারণ ভাবে অনেকখানি ঐক্য ও সমরূপতা লক্ষ করা গেলেও সে কালের শিল্পীর মন যে স্বাধীন উদ্ভাবনে দক্ষ ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাদের কাজে কৌশলে অনেক বৈচিত্র্যের চিহ্ন থেকে। তারা কখনও দেয়ালের গায়ে এঁকেছে পশুদেহের বহিরেখাটি শুধু, কখনও সমস্ত দেহটি লেপে দিয়েছে রঙে, কখনও বা সেই লেপনের মধ্যে কিছুটা ফাঁক রেখে দিয়েছে পেশীর বা ধড়ের বাঁকা গড়ন বোঝাবার জন্য—যেমন এ যুগের শিল্পীরাও করে থাকে। কখনও শিলা-পটের ফাঁক, খাঁজ বা ধাপ সে কৌশলে কাজে লাগিয়েছে যাতে তারা হয়ে পড়েছে ছবিরই অঙ্গ; কখনও এঁকেছে পাথর চিরে, কখনও কিছুটা উঁচু করে ফুটিয়ে তুলেছে নকৃশা (যাকে বলে রিলিফ), কখনও বানিয়েছে কাদার মূর্তি; কখনও দেয়াল জুড়ে এঁকেছে প্রকাণ্ড দৃশ্য। আবার কখনও ছোট্ট এক খণ্ড হাড়ে সম্পূর্ণ করেছে সূক্ষ্ম কারুকাজ।

পুরামানবের ছবির বিষয়বস্তু কি? এক কথায় বলা যায়—পশুজগত। কিন্তু সে দিনের মানুষ যত রকম পশু পাখি জানত তাদের সবাইকে রূপায়িত করতে চেষ্টা করে নি, কোনও কারণে বিশেষ কয়েকটির প্রতি তার পক্ষ-পাতিত্ব, তার মধ্যে প্রধান হল গরু ষাঁড় বুনো ঘোড়া হরিণ বলগা-হরিণ বাইসন ম্যামথ; কখনও কখনও সিংহ ভালুক গণ্ডার দেখতে পাওয়া যায়; কদাচিৎ সাক্ষাৎ মেলে হায়েনা নেকড়ে সিল সরীসৃপ মাছ ও পাখির। পাখিদের মধ্যে হাঁস রাজহাঁস সারস বনমোরগ ইত্যাদির সঙ্গে যে তার পরিচয় ছিল তা বোঝা যায়। মাছের নকৃশা যা চোখে পড়ে (কাদায় আঁকা, পাথরে কিংবা হাড়ে খোদাই করা) তার থেকে মনে হয় স্যামন ও ট্রাউট আজকের মতই সে কালের য়োরোপীয়দেরও প্রিয় খাদ্য ছিল।

হয়তো যে সব প্রাণীকে তারা শিকার করত বা যাদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার প্রয়োজন ছিল তারাই মনোযোগ অধিকার করে থাকত সে কালের সমাজে আর তাই ছবিতেও তাদেরই প্রাধান্য। নিজের প্রতিকৃতিও যে মানুষ আঁকে নি তা নয়, কিন্তু প্রায় সর্বত্রই মুখোস বা ছদ্মবেশ ব্যবহার করেছে, অনেক ক্ষেত্রেই সে ছবি যেন সাংকেতিক চিহ্ন মাত্র, মানুষ নয়, মানুষের ইঙ্গিত—পশুদের আশ্চর্য নিপুণ রূপায়ণের পাশে তাতে মনোযোগের অভাব সুস্পষ্ট। প্রায় মনে হয় যেন স্পষ্ট করে নিজের মুখ দেখাতে সে দিনের মানুষ বিশেষ নারাজ ছিল, যেন রীতি নীতির বিরুদ্ধে ছিল এ কাজ। লাস্‌কোর গুহায় এক দৃশ্যে দেখানো হয়েছে এক গণ্ডার আর এক বাইসনের মধ্যে পড়ে আছে এক মৃত ব্যক্তি, বাইসনের দেহ বর্শাবিদ্ধ, পেট থেকে নাড়ি ভুঁড়ি বেরিয়ে এসেছে, মাথা নামিয়ে সে গুঁতো মারতে উদ্যত; এ সবই সযত্নে অঙ্কিত, কিন্তু মানুষটিকে মাত্র কয়েকটি সোজা আঁচড়ে শেষ করে ফেলা হয়েছে—তার চতুষ্কোণ লম্বা দেহ, কাঠির মত হাত পা, আর সবচেয়ে আশ্চর্য, অনেকটা পাখির মত মুখ। হয়তো সে আসলে আধা-মানুষ মাত্র। এই ধরনের কাল্পনিক মূর্তি অন্যত্রও পাওয়া গিয়েছে: মানুষের দেহে হরিণ বাইসন বা ম্যামথের মাথা, কিংবা মুখটা কুকুরের মত সামনে প্রসারিত। প্রাচীন মিশরে দেব দেবীরা এই রকম অর্ধনর মূর্তিতে কল্পিত হত, আমাদের গণেশ এবং নরসিংহ বরাহ প্রভৃতি অবতারের কথাও মনে পড়ে এ প্রসঙ্গে; কিন্নররা অর্ধ-অশ্বদেহী, যেমন গ্রীসীয় পুরাণে সেন্‌টর; তাদের স্যাটার অর্ধেক নর অর্ধেক ছাগ, প্রকৃতিদেব প্যানও এই রকম মিশ্র সৃষ্টি। এই ধরনের অতিমানবিক মূর্তি নিশ্চয় বহু প্রাচীন কাল থেকেই মানুষের মনে দানা বেঁধেছে, কিন্তু গুহাচিত্রের ঐ চেহারাগুলি ছদ্মবেশী মানুষও হতে পারে। সেখানে মানুষাংশ বর্জিত অন্যান্য প্রাণীর যুগ্ম প্রতিকৃতিও দেখা যায়—অর্থাৎ অনেকটা ঐ বকচ্ছপ বা হাঁসজারু গোছের দুঃস্বপ্ন। এ ছাড়া সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত প্রাণীরও দেখা মেলে কোথাও কোথাও—আলতামিরায় আছে এক বুনো শুয়োর, লাস্‌কোয় আছে এক ঘোড়া, তাদের পেটের তলা থেকে গাছের ডালের মত অনেকগুলি পা বেরিয়ে এসেছে। কল্পনার রাশ সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছে শিল্পী লাস্‌কোয় আর একটি প্রাণীর চিত্রে; এর দেহ ঘোড়ার অনুরূপ, কিন্তু পেট ঝুলে পড়েছে থলের

মত, মুখ প্রায় চতুষ্কোণ, আর মাথার থেকে বেরিয়ে এসেছে দুটি লম্বা সোজা



২৮নং চিত্র

গুহাচিত্রে বহুপদী কাল্পনিক জন্তু

শিং। বিশেষজ্ঞরা এর আখ্যা দিয়েছেন ইউনিকর্ন, যদিও এই নামে একটি মাত্র শিং বোঝায়।

জন্তু জানোয়ারের তুলনায় গাছপালার ছবি খুব কম এবং প্রায়ই এত অযত্নে আঁকা যে তাদের উদ্ভিদ রূপ সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। এই অবজ্ঞার কি এই ইঙ্গিত যে সে কালের মানুষ প্রধানত আমিষাশী ছিল? এ ছাড়া নানা রকম সংকেত, চিহ্ন ও বিন্দু প্রায়ই দেখা যায় পশুদের আশেপাশে, তাদের কোনও কোনওটা অস্ত্র বা শস্ত্র, হয়তো চেনা যায় বর্শা বা বল্লম বলে, কিন্তু কোনও কোনও নকৃশার তাৎপর্য সম্বন্ধে এখনও সন্দেহ আছে। যেমন এক ধরনের আঁকা বা খোদাই করা নকৃশা প্রায়ই চোখে পড়ে, সেগুলি চতুষ্কোণ, তার মধ্যে আড়াআড়ি দাগ টেনে আরও ছোট ছোট ঘরে ভাগ করা, সেই ভাগগুলি কখনও আবার বিভিন্ন রঙে ভরা। কেউ কেউ বলেন এই জালকাটা ঘরগুলি ফাঁদ। এর চেয়েও রহস্যময় আর একটি জিনিস অনেক দেয়ালের গায়ে দেখা যায়, তা ছবি মোটেই নয়, জীবন্ত মানুষের হাতের ছাপ—তার মধ্যে শিশুর হাতও দেখতে পাওয়া যায়; লাল, কালো বা হলদে রঙের এই ছাপগুলি প্রায়ই পরস্পরের গা ঘেঁষে ভীড় করে আছে, যেন নিজের স্বাক্ষর রেখে যাবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছিল সে কালের লোকেদের মধ্যে; দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রান্সের গারগাস (Gargas) গহ্বরে এমনি ১৩৮ হাতের ছাপ আছে। কিন্তু আসলে আমাদের পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্য সম্ভবত মোটেই স্বার্থমূলক ছিল না; তার

পরোক্ষ প্রমাণ মেলে আরও এক আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য থেকে : ঐ হাতগুলির প্রায়ই একটা কখনও বা দুটো আঙুল কাটা। এর থেকে অনেকে মনে করেন যে হয়তো সে কালে ধর্মসম্পর্কিত কোনও অনুষ্ঠানে আঙুল বলির প্রথা ছিল এবং হাতের ছাপও সেই অনুষ্ঠানের অঙ্গ। আঙুলের এক একটি গ্রন্থি পর্যন্ত খণ্ড উৎসর্গ করে আত্মা বা দেবতাকে তুষ্ট করার রীতি আজও অনেক বর্বর সমাজে প্রচলিত, অসম্ভব নয় যে প্রস্তর যুগেই এই প্রথার উৎপত্তি।

কিন্তু এ সব কিছুর তুলনায় সে কালের প্রাচীর-চিত্রে অনেক বড় স্থান অধিকার করে আছে কয়েক শ্রেণীর পশু মূর্তি, যাদের নাম আগে করেছি। এদের মধ্যে অনেকে আজ লোপ পেয়েছে, অন্তত পশ্চিম য়োরোপে, সুতরাং প্রস্তর যুগের চিত্রশিল্প থেকে আমরা যে শুধু সে কালের মানুষ সম্বন্ধে অনেক কিছু জেনেছি তাই নয়, সে কালের জন্তুদের চেহারাও ফসিলের সাক্ষ্যের সঙ্গে তুলনা করা সম্ভব হয়েছে। তা ছাড়া এ সব জন্তুরা কি ধরনের জলবায়ু পছন্দ করত তা জানা আছে বলে প্রাক্তন মানুষের প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্বন্ধেও অনেক খবর মেলে।

সে কালের প্রাচীর-চিত্রে যে সব প্রাণীর প্রধান স্থান তাদের সম্বন্ধে আরও দু কথা বলা যেতে পারে। বুনো ঘোড়া আজ পৃথিবী থেকে প্রায় সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন, মংগোলিয়ার প্রান্তরে এখন বেঁচে আছে একটি মাত্র জাতি, যার দাঁত-ভাঙা নাম (Przewalski) উচ্চারণ করতে চেষ্টা করব না। (আজকের সব সাধারণ পালিত ঘোড়ার বন্য পিতৃপুরুষ 'তারপান' দক্ষিণ রুশিয়ায় বেঁচে ছিল ১৮৫১ সাল পর্যন্ত।) আজকের ঘোড়ার তুলনায় এই মংগোলীয় ঘোড়া আকারে ছোট, তার ঝোলা পেট, ঘাড়ের উপর ছোট ছোট কালো চুলের খাড়া কেশর ; এর সঙ্গে আশ্চর্য মিল দেখতে পাওয়া যায় লাস্‌কোয় চিত্রিত কয়েক হাজার বছর পুরনো ঘোড়ার। কেশরের বৈশিষ্ট্য দেখানো হয়েছে যথাযথ। অবশ্য এখানে এবং অন্যত্র অনেক সময়ে এমন ঘোড়ার মূর্তিও দেখা যায় যার সঙ্গে আমাদের জানা কোনও জাতির সাদৃশ্য নেই ; এগুলি কি শিল্পীর অক্ষমতার পরিচায়ক, নাকি ইচ্ছাকৃত বিকৃতি (যেমন আধুনিক শিল্পীদের কাজেও দেখা যায়), নাকি তারা সত্যিই দেখেছিল ঐ জাতের ঘোড়া তা বলা কঠিন।

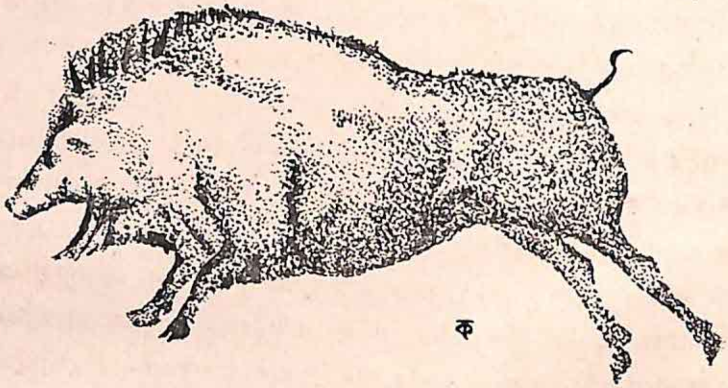
সে কালের প্রকাণ্ড বুনো ষাঁড়ের (অরকৃস) পরিচয় পাওয়া যায়

পুরনো দিনের লেখকদের রচনায় (৩নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। মাটি থেকে ঘাড় পর্যন্ত এর মাপ ছিল সাড়ে ছ ফুট এবং শিং কখনও কখনও তিন ফুটেরও বড় হত। ২০০০ বছর আগে রোমীয় সম্রাট সীজার এক বনে এদের মুখোমুখি হয়েছিলেন, তাঁর লিখিত বর্ণনা অনুসারে হাতির চেয়ে সামান্য মাত্র ছোট এই ষাঁড়। এর শক্তি, হিংস্রতা ও তৎপরতার ফলে জন্তুটির কাছে এগোনো দায় ছিল, তবু বুদ্ধির জোরে পুরামানব কি করে এদের দলকে দল ফাঁদে ফেলে শিকার করেছে সে গল্প আগে বলেছি। লাস্‌কোর গুহাগাত্রে যে ষাঁড় ও গরু চিত্রিত দেখা যায় তাদের সঙ্গে পুরুষ ও স্ত্রী অরকৃসের ঘনিষ্ঠ মিল। এই ভয়ংকর জন্তুটির চরম তিরোধানের এবং 'পুনর্জন্মে'র ইতিহাসও উল্লেখযোগ্য। ৪৮৮ খৃষ্টাব্দেই য়োরোপে এদের সংখ্যা এত কমে এসেছিল যে রাজা ছাড়া আর কারও শিকারের অধিকার ছিল না। একেবারে শেষ অরকৃসটি কবে কোথায় মারা গিয়েছে তার পর্যন্ত দলিল আছে: ১৬২৭ সালে পোলাণ্ডের এক বনে এক বুড়ো গরু সমস্ত প্রজাতির হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিল। কিন্তু প্রায় ৩০০ বছর অবলুপ্তির পরে অরকৃস আবার প্রাণ পেয়েছে প্রাণবিজ্ঞানীর কৌশলে। ১৯৩১ সালে বার্লিন চিড়িয়াখানার অধ্যক্ষ ডকটর হেক্‌ এক পরীক্ষা আরম্ভ করেন, যে সব জাতের গরুর সঙ্গে অরকৃসের কিছু কিছু মিল আছে তাদের নিয়ে, ১৫ বছর ধরে নির্বাচনী প্রজননের ফলে তিনি দাবি করেন যে জন্তুটির সম্পূর্ণ প্রতিকৃতি তিনি নতুন করে বানাতে পেরেছেন।

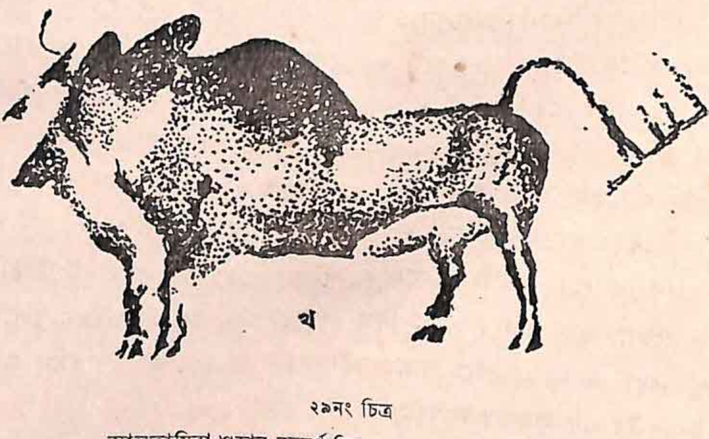
এই ষাঁড়ের মতই শক্তিশালী প্রাণী বাইসন আলতামিরা ও অন্যত্র অনেক গুহায় চিত্রিত হয়েছে, প্রায়ই নানা রঙে। খুব আধুনিক কালে এই প্রাণীটিও প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে এসেছিল, ১৯৪৯ সালে সারা পৃথিবীতে এদের সংখ্যা ছিল মোটে ১১০, কিন্তু য়োরোপ ও আমেরিকায় কর্তৃপক্ষের চেষ্টায় এরা এ যাত্রা বেঁচে যাবে মনে হয়। য়োরোপীয় বাইসন প্রস্তর যুগের জন্তুটির এক ক্ষুদ্রতর বংশধর।

নানা শ্রেণীর হরিণ সে কালের শিল্পীদের (এবং সাধারণ মানুষেরও নিশ্চয়) খুব মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। তাদের শিঙের বাহার ফুটিয়ে তোলার কাজে এরা বারে বারে মগ্ন হয়ে পড়েছে। বস্তুত, লাস্‌কোতে এত হরিণ-মূর্তির মধ্যে হরিণীর ছবি একটিও নেই, এর কারণ কেউ জানে

না—সৌন্দর্যের আকর্ষণ ছাড়া এর আড়ালে ধর্মগত বা ব্যবহারিক কোনও প্রেরণা যে ছিল না তা বলা যায় না। একটি মনোরম দৃশ্যে দেখতে পাই এক দল হরিণ সারি বেঁধে সাঁতরে জল পার হচ্ছে, জলের উপরে শুধু গলা মাথা আর ডালপালা ছড়ানো শিঙের শ্রেণী দেখা যাচ্ছে, সামনের হরিণটির মাথা পিছন দিকে একটু বেশী হেলানো, তাতে মনে হয় জলের নিচে সবে মাটিতে পা ঠেকেছে তার। প্রস্তর যুগের ছবিতে এ রকম বাস্তবিক খুটিনাটি



ক



খ

২৯নং চিত্র

আলতামিরা গুহার বহুবর্ণ চিত্র ; ক, শুয়োর ; খ, বাইসন।

প্রায়ই আমাদের মুগ্ধ ও বিস্মিত করে, এবং এই ধরনের বৈশিষ্ট্য থেকেই সবচেয়ে বেশী প্রতীয়মান হয় যে সেই প্রথম চিত্রকরদের নজর, শিল্পবোধ ও প্রতিভা কিছু কম ছিল না এ যুগের তুলনায়।

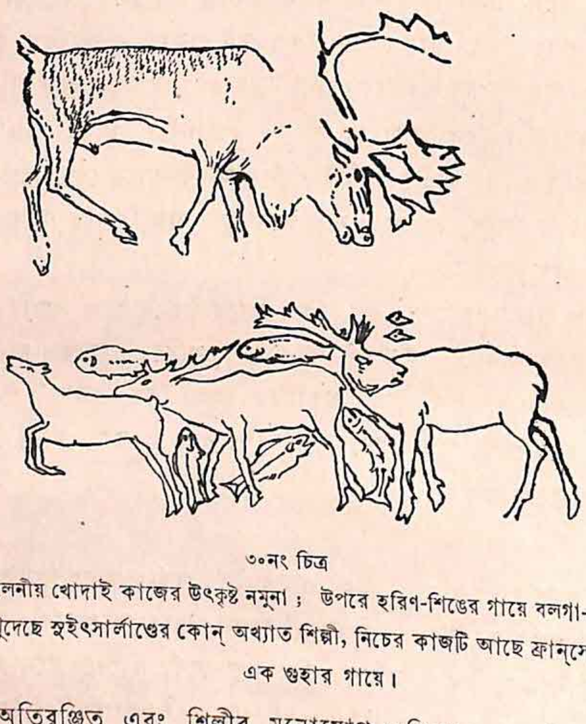
গুহাবাসী সিংহের কথা আগে উল্লেখ করেছি। বিড়াল জাতীয় জন্তুদের মধ্যে একমাত্র এর মূর্তিই মাঝে মাঝে দেখা যায় গুহার গায়ে— প্রায় সর্বত্রই খোদাই করা। শিল্পীরা নিশ্চয় মুখোমুখি পড়েছে এই হিংস্র মাংসাশী পশুর। য়োরোপে অনেক দিন এরা লুপ্ত, এদেরই বংশধর ভারত ও আফ্রিকার সিংহ, এবং আজ তাদেরও বাঁচাবার জন্য বিশেষ যত্নের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সিংহের মত ভালুকেরও ক্ষোদিত মূর্তি কোনও কোনও গুহায় দেখা যায়; এরা কিন্তু সেই প্রকাণ্ড ও ভয়ংকর গুহাভালুক নয় যাদের কথা গত অধ্যায়ে বলেছি—তারা বিদায় নিয়েছে মানুষের মনে ছবি আঁকবার তাগিদ জাগবার অনেক আগেই। ছবির জন্তুটির নাম বাদামী ভালুক, এই নিরীহ প্রাণীটি এখনও টিঁকে আছে য়োরোপের কোনও কোনও অঞ্চলে; ফল মূল খেয়ে, মাছ আর ছোট জন্তু শিকার করে সে বাঁচে, এ দেশের ভালুকেরই মত।

গণ্ডারও আমাদের সুপরিচিত, কিন্তু য়োরোপে সে আজ সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন, বোধ হয় গুহাশিল্পীদের সময়েই তার দিন ফুরিয়ে এসেছিল বলে ছবিতে তার দেখা মেলে কদাচিৎ। এই গণ্ডারের সঙ্গে কিন্তু বর্তমান আফ্রিকার পশুটির সাদৃশ্য বেশী, অর্থাৎ তার দুটি শিং এবং চামড়ায় মোটা ভাঁজ নেই এশিয়ার গণ্ডারের মত।

মোটামুটি সমতল শিলাপটে অঙ্কন ও উৎকীরণ অর্থাৎ প্রকৃত চিত্রশিল্প ছাড়া ভাস্কর্যের নিদর্শন যা পাওয়া গিয়েছে সংখ্যায় তারা অপেক্ষাকৃত অল্প এবং প্রায়ই সেই শিল্পের চরিত্র ও আঙ্গিকও ভিন্ন। ভাস্কর্যের সবচেয়ে মনোরম দৃষ্টান্ত বোধ হয় তুক্‌দোহুবের (Tuc d'Audoubert) গুহায় প্রাপ্ত দুটি বাইসন মূর্তি, তেজে প্রাণবন্ত এদের সমস্ত দেহ, এখন পর্যন্ত সারা বিশ্বে মূর্তি গঠনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এরা। এদের কাছেই আর একটি অসমাপ্ত বাইসন; সঙ্গে কাদার তাল, তাতে শিল্পীর আঙুলের স্পষ্ট ছাপ। কিন্তু এই ধরনের মূর্তির তুলনায় চ্যাপটা পাথরের গায়ে ফুটিয়ে তোলা রিলিফ কাজে ভাস্কর্য শিল্পের বেশী নমুনা আমরা দেখতে পাই। চুনাপাথরের উপর এই শ্রেণীর প্রতিকৃতি দেখা যায় নানা আকৃতিতে—মাত্র আট ইঞ্চি থেকে এক গজ কি তারও বেশী। চমৎকার এক দৃষ্টান্ত কাপ ব্লঁ (Cap Blanc) শিলাশ্রয়ের গায়ে

সাত ফুট লম্বা এক পটে ছটি ঘোড়ার দৃশ্য, এর সামনে পথটি সে কালেই বাঁধানো ছিল।

গরু ঘোড়া ইত্যাদি ছাড়া মানুষের মূর্তিও দেখা যায়, বিশেষ করে স্ত্রী-লোকের। পূর্বোক্ত ভিনাস স্ত্রীমূর্তিগুলির ও তাদের সমতুল্য রিলিফ প্রতিকৃতিগুলির প্রধান বিশেষত্ব এই যে এদের চেহারায় সর্বদা যৌন অঙ্গগুলি



৩০নং চিত্র

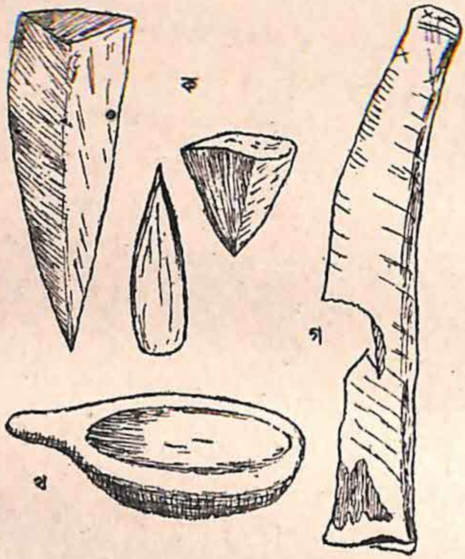
মাদলেনীয় খোদাই কাজের উৎকৃষ্ট নমুনা ; উপরে হরিণ-শিঙের গায়ে বলগা-হরিণ খুদেছে সুইৎসার্লাণ্ডের কোন্ অখ্যাত শিল্পী, নিচের কাজটি আছে ফ্রান্সের এক গুহার গায়ে।

বিশেষ অতিরঞ্জিত এবং শিল্পীর মনোযোগ অধিকাংশে সে দিকেই ব্যয়িত (৩২নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। কোনও কোনও বিগ্রহে মুখ বলতে কিছু নেই, ঘন কোঁকড়ানো চুলে মাথাটি ঢাকা, হাত অস্পষ্ট বা হ্রস্ব—এই বিকৃতাঙ্গিনীদের থেকে সে কালের স্ত্রীলোকের চেহারা কল্পনা করা অবশ্য মস্ত ভুল হবে (সামান্য যে ক'টি পুরুষ মূর্তি পাওয়া যায় তারা কিন্তু স্বাভাবিক)। অনেক হাজার বছর পরবর্তী প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক মানুষের বিভিন্ন সামাজিক কেন্দ্রেও (যেমন মহেনজোদারোতে) এই স্ত্রীমূর্তি পাওয়া গিয়েছে নানা রূপে। অনেকেই মনে করেন মানুষের জন্মের প্রায় গোড়ার থেকেই ইনি

তার সমাজে অধিষ্ঠিতা 'মাতৃ-দেবতা' রূপে, যার মধ্যে জননী বা অন্নদাত্রীর ভাবটাই বেশী উচ্চারিত, যদিও এর সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান ও বিশ্বাসের সঙ্গে নর নারীর যৌন মিলনের যোগ থাকাও আশ্চর্য নয়। ভাস্কর্য শিল্পের চরম বিকাশ সলুত্রীয় কৃষ্টির যুগে। এই যুগের শেষে মানুষ তার অস্ত্র ও সরঞ্জাম সৃষ্টিতে পাথরের তুলনায় ক্রমে হাড়ের দিকে নজর দিয়েছে বেশী, তাই পরবর্তী মাদলেনীয় যুগে হাড় বা গজদন্তের উপরও ভাস্কর্যের অতি সূক্ষ্ম নমুনা অনেক দেখা যায়।

সে কালের রুক্ষ যন্ত্রপাতি ও সামান্য মাল মশলা দিয়ে কি করে এমন সুষ্ঠু ভাবে কার্যোদ্ধার করেছে শিল্পী সে প্রশ্ন স্বভাবতই মনে জাগে। পাথরের গা কুদে বা চিরে দাগ কাটতে ব্যবহার হত চকমকির বিউরিন, যে যন্ত্রের কথা আগে বলা হয়েছে। এই ধরনের উপকরণ এত শত শত পাওয়া যায় যে মনে হয় সে দিনের মিস্ত্রীরা ঘরের বা শিকারের যন্ত্রপাতির দিকে যত সময় দিয়েছে শিল্পীর চাহিদা মেটাতে তার চেয়ে কম ব্যস্ত থাকে নি। চিত্রশিল্পী তার ঘন বা তরল রং লেপনে ব্যবহার করত আঙুল, প্যাড বা বুরুশ, অর্থাৎ দাঁতনের মত থেঁৎলানো কাঠি বা পালকের গোছা; কোথাও কোথাও এমন দু একটি ছবির দেখা মেলে যাতে মনে হয় তার অংশ বিশেষে (যেমন অস্পষ্ট আভাসে ঘোড়ার কেশর বোঝাতে) গুঁড়ো রং ছিটিয়ে লাগানো হয়েছে; এ যুগে ফুৎকার যন্ত্রের ফলে রং লাগাবার এই কৌশলের সঙ্গে আমরা সুপরিচিত, হয়তো সে দিনের মানুষ বানিয়েছিল এই যন্ত্রের কোনও প্রাথমিক ঘরোয়া সংস্করণ; ফাঁপা হাড়ে রং ঢুকিয়ে তাতে ফুঁ দিয়ে এই কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকতে পারে। লাল হলদে আর বাদামী রঙের মশলায় ব্যবহৃত হত 'ওকার' জাতীয় গৈরিক, কালো বা গাঢ় বাদামীর জন্য ম্যাংগানিজ অকসাইড। এ ছাড়া অন্যান্য রং বা রঙের মাত্রা সৃষ্টি হত এদের মিশ্রিত করে। প্রথমে পাথরের ফলকে বা পাত্রে ঘষে মিহি গুঁড়ো রং বানাত শিল্পী, তার পর তার সঙ্গে মেশাত চর্বি। এই চর্বি জল বা আর্দ্র আবহাওয়া থেকে এমন বাঁচিয়েছে রংকে যে অনেক জায়গায় আজও তা সেই প্রথম দিনের মতই উজ্জ্বল। গুঁড়ো রং চেপে রঙিন 'খড়ি'ও তৈরি হত। রং গুঁড়ো করতে বা ঘষতে ব্যবহার হত যে চ্যাপটা নুড়ি এবং পাতলা পাথরের ফলক তা পাওয়া গিয়েছে অনেক গুহাতে, যেমন পাওয়া গিয়েছে অসংখ্য প্রদীপ।

চুনাপাথরের চ্যাপটা বা বাঁকানো টুকরো সংগ্রহ করে সে কালের মানুষ চর্বির বাতি বানিয়েছে, তাদের গায়ে এখনও লেগে আছে কালির দাগ ; এ সব প্রদীপ দেখতে প্রায় বর্তমান এসকিমোদের ব্যবহৃত বাতির মত, তারা শুকনো শেওলা দিয়ে সলতে বানায়, তাদেরও ইন্ধন পশুর চর্বি ; সম্ভবত এই কারণে সে কালের গুহাপ্রাচীরে দীপশিখাজনিত কালির দাগ দেখতে পাওয়া যায় না। এই সব গুহা গহ্বরের অন্তঃপুরে দিন দুপুরেও আলো ছাড়া চলা



৩১নং চিত্র
গুহাশিল্পীদের উপকরণ ; ক, রং খড়ি ; খ, প্রদীপ ; গ, ফাঁপা হাড়ের বর্ণাধার।

ফেরা অসম্ভব, ছবি আঁকা তো দূরের কথা। নিশ্চয় শিল্পীদের আশেপাশে সঙ্গীরা দীপ হাতে করে দাঁড়িয়ে থেকেছে। অনেক গুহার আকৃতি ও দেয়ালের গায়ে ছবির উচ্চতা দেখে মনে হয় সম্ভবত গাছের ডাল দিয়ে মাচার মত কিছু বানিয়ে নিতে হয়েছে।

লাস্‌কোর গুহায় প্রদীপ-স্তূপের সঙ্গে কিছু হরিণ-শিঙের বর্শা আর পাইন জাতীয় গাছের কাঠকয়লাও আবিষ্কৃত হয়েছে। সে কালের লোক যেখানে বাস করেছে সেখানেই তার গৃহস্থালির অনেক জঞ্জাল রেখে গিয়েছে, কিন্তু এই ধরনের চিত্রিত গুহাগুলিতে তেমন কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় না,

সুতরাং এমন জায়গায় বর্শার অস্তিত্ব থেকে মনে হয় যে তা কোনও রকম অনুষ্ঠানে ব্যবহার হয়ে থাকতে পারে; হাজার হাজার বছর আগে এই সব গুহা-গর্ভ হয়তো উন্মত্ত নাচে গানে চীৎকারে গম গম করেছে, দেয়ালের গায়ে পশুর জগত মূক বিস্ময়ে দেখেছে সে দৃশ্য! হয়তো এমনি করেই বাইরের পশুও বশে এসেছে মানুষের—কিন্তু সে কথা পরে।

আর ঐ কাঠকয়লা যে আমাদের শুধু সে কালের গাছপালার নির্দেশ দেয় তাই নয়; কয়লার উপাদান কারবন, তার তেজী অংশ মেপে বয়স নির্ণয় সম্ভব। এই উপায়ে বিজ্ঞানীরা বলতে পেরেছেন যে লাস্‌কোর গুহায় মানুষের আনাগোনা ছিল প্রায় ১৫,০০০ বছর আগে।

এইসব মানুষ যে এক কালে নিতান্তই জীবন্ত ছিল, আচরণে আবেগে ছিল আমাদেরই মত, এক এক সময়ে তার সাক্ষ্য মেলে এদের কাজের মধ্যেই। কোথাও হয়তো শিলাপটের কাছেই পড়ে আছে মাদলেনীয় শিল্পীর তৈরি রঙিন পেনসিল, রং পিষবার জন্য গ্রানিট পাথরের নোড়া, রং মেশাবার জন্য পাথর বা ঘাড়ের হাড় দিয়ে তৈরি পাত্র—তার গায়ে রঙের দাগ এখনও, বর্ণ লেপনের জন্য সোজা এক খণ্ড হাড়, তারও মুখ রঞ্জিত; এবং সবচেয়ে আশ্চর্য, ঠিক আধুনিক শিল্পীর যেমন দরকার হয় তেমন বর্ণাধার, অবশ্য ফাঁপা হাড়ের তৈরি, এখনও অর্ধেক ভরা অব্যবহৃত রঙে। আর যারা এ সব উপকরণ ব্যবহার করেছে, মেঝের বালিতে তাদের সুস্পষ্ট পদচিহ্ন, কখনও বা সেই বালিরই গায়ে অলস মুহূর্তে আঙুল টেনে আঁকা মাছ বা ষাঁড়ের রেখাচিত্র, কোথাও বা কর্দম-মূর্তির গায়ে আঙুলের স্পষ্ট ছাপ। তা ছাড়া সর্বত্র নানাবিধ যন্ত্রপাতি, শিল্পীর কাজ বা ঘরের কাজের উপযুক্ত। এক জায়গায় এক পাথরের তাকে একটি ভালুকের চোয়াল, কে যেন সব দাঁতগুলি বার করে তাকে সেখানে রেখেছে। মঁতেস্‌পাঁ (Montespan) গুহার এক দুর্গম কোণে কয়েকটি অল্পবয়স্ক ব্যক্তির পাছার চিহ্ন, সেখানে তারা বসেছিল কোনও কারণে; কল্পনার রাশ কিছুটা ছেড়ে দিলে বলা চলে হয়তো একদা সেখানে ঘটেছিল যৌবন-দীক্ষা সূচক কোনও অনুষ্ঠান, যেমন আজও দেখা যায় নানা আদিবাসী সমাজে (এর আলোচনা আছে দুই অধ্যায় পরে)।

এর আগে এক পাখিমুখী মানুষের ছবির কথা বলেছি বাইসন আর গণ্ডারের সঙ্গে। গণ্ডারের লেজের নিচে কয়েকটি কালো দাগ দেখা যায়,

তার থেকে মনে হয় শিল্পী বোধ হয় তার রং-মাখা হাতটি অসাবধানে সেখানে রেখেছিল, তার ফলে তার 'স্বাক্ষর' থেকে গিয়েছে আজকের চিত্রকর যেমন ছবিতে তার নাম সই করে। আবার আজকের চিত্রকর যেমন এক টুকরো কাগজ পেলে তার উপর অলস মনে আঁকিবুঁকি আঁকে, তেমনি সে কালের শিল্পী পাথর ও হাড়ের গায়ে অনেক্ বিনা-কাজের খেয়ালী নক্শা রেখে গিয়েছে। কোনও কোনও ছোট নক্শা দেখে মনে হয় প্রধান ছবিতে হাত দেবার আগে তা যেন তার প্রাথমিক স্কেচ ; এই ধরনের রেখাচিত্রের উপর আবার কখনও যেন কেউ হাত চালিয়েছে, স্কুলের ছেলের কপিবুক মাষ্টার মশায় যেমন শুদ্ধ করে দেন। আলতামিরায় এক উৎকীর্ণ হরিণ-মূর্তির কাছেই ছিল হরিণের মাথা আঁকা এক খণ্ড হাড়—হয়তো বনে বনে ঘুরে জীবন্ত জন্তুটির নক্শা তৈরি করে এনেছিল শিল্পী আসল কাজে নিজের স্মৃতিকে সাহায্য করতে, যেমন আজও করা হয়। তা ছাড়া গরজ করে আরম্ভ করা ছবি অসম্পূর্ণ থেকে গেল এমনও অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায়, যেমন উপরোক্ত গণ্ডারের মূর্তিটি। কখনও শিল্পী শুধু তার একেবারে প্রাথমিক রেখাচিত্রটি রেখে গিয়েছে দেওয়ালের গায়ে, ছবি আর হয়ে ওঠে নি। এ ধরনের পরীক্ষামূলক নক্শা যে দরকার ছিল তা অনেক সম্পূর্ণ চিত্রের গঠন থেকেও বোঝা যায়, যেমন যেখানে নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যে কয়েকটি পশুকে সমান্তরাল ভাবে অথবা এক বিশেষ পরিকল্পনা অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। সে কালের শিল্পীর যত্ন ও পরিশ্রমের এ আর একটি নিদর্শন।

এর পাশাপাশি যখন দেখা যায় এক মনোরম ছবি নষ্ট করা হয়েছে তার উপর আর একটি সম্পূর্ণ নতুন ছবি এঁকে, তখন দর্শকের মনে দুঃখ না জেগে পারে না। এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় সব গুহাতেই, রঙিন ছবি এবং খোদাই কাজে।

যত্নে আঁকা ছবির অনাদর, প্রায় অত্যাচার, আরও এক ভাবে কোথাও কোথাও প্রকাশ পেয়েছে ; পটের গায়ে নানা রকম দাগ থেকে মনে হয় পশুর দেহে বারে বারে ঘা বা খোঁচা মারা হয়েছে। সেটা অবশ্য আশ্চর্য নয়, কারণ ছবিতেই কখনও কখনও অস্ত্রবিদ্ধ পশু দেখানো হয়েছে। এর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পরে দু কথা বলব।

গুহাচিত্রের চরিত্র বাস্তবধর্মী। যে জন্তুটি যেমন দেখেছে শিল্পী তাকে

তেমনি সে রূপ দিতে চেষ্টা করেছে—এবং প্রসঙ্গত লক্ষ করবার বিষয় যে এই রূপায়ণ সর্বদা পাশের দিক থেকে, কখনও মুখোমুখী নয়। বাস্তবধর্মী হলেও গুহাচিত্র কোনও মতেই আলোকচিত্রের মত যথাযথ নয়, বরং আধুনিক আর্ট বলতে সাধারণত যে কিছুটা বিকৃত 'অস্বাভাবিক' বস্তু চোখে জাগে গুহাচিত্রের সঙ্গে তার সাদৃশ্য স্পষ্ট; বস্তুত না জানা থাকলে অধিকাংশ লোকে এগুলিকে আধুনিক শিল্পীর কাজ বলেই ভুল করে। চিত্রকলায় বাস্তব বনাম অবাস্তবের যে বিতর্ক তার সঙ্গে এ যুগে আমরা সকলেই অল্প বিস্তর পরিচিত, সে কালের সেরা শিল্পীরা সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থেকেও অবলীলাক্রমে তাদের বাস্তবিকতায় ঠিক এমন পরিমাণ অভিনবত্ব ও 'অস্বাভাবিকতা' মিশিয়েছে যাতে ছবিতে এসেছে বৈশিষ্ট্য, তা ফোটোগ্রাফের পর্যায় অতিক্রম করেছে, আবার দুর্বোধ্য অথবা বিসদৃশ হয়ে পড়ে নি। মাঝে মাঝে যে অতিরঞ্জন এসে পড়েছে—যেমন হয়তো বাইসনের কুঁজে কিংবা হরিণের শিঙে—তা সাধারণত মাত্রা ছাড়িয়ে যায় নি, ছবির উৎকর্ষ ক্ষুণ্ণ হয় নি তাতে। অবশ্য এরও যে ব্যতিক্রম নেই তা নয়—যেমন যেখানে ঘোড়ার মাথাটা দেহের তুলনায় অতি ছোট সেখানে তা পড়েছে অদ্ভুতের পর্যায়ে, সেখানে ছবি আর মনোরম নয়।

এই ধরনের অঙ্গীয় অসাম্যের তুলনায় বেশী দেখা যায় পরিপ্রেক্ষিতের অসাম্য—হয়তো হরিণ ও ম্যামথ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে, দুইয়েরই আকৃতি সমান। কিন্তু এটা যে অক্ষমতার ফল নয় তা ছবি দেখেই বোঝা যায়, বোঝা যায় যে আসলে এখানে পরিপ্রেক্ষিতের প্রতি শিল্পী কোনও নজরই দেয় নি, তার উদ্দেশ্য ছিল এক একটি প্রাণীকে স্বতন্ত্র ভাবে স্বাভাবিক রূপে আঁকা, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা স্বয়ংসম্পূর্ণ। বোধ হয় সেই কারণেই গুহাচিত্রে কখনও গাছপালা, প্রাকৃতিক পরিবেশ বা পটভূমি, এমন কি দিগন্তের রেখা পর্যন্ত দেখা যায় না। যদিও কদাচিৎ পাষাণ পটের কোনও স্বাভাবিক ধাপ বা খাঁজকে শিল্পী কৌশলে কাজে লাগিয়েছে এমনি কিছু বোঝাতে; যেমন পূর্বোক্ত জলপারানী হরিণদলের দৃশ্যে পাথরের একটা ফাটা দাগের সাহায্যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জলের রেখার। এই উৎকৃষ্ট আলেখ্যের আর একটি বিশেষত্ব এই যে একে শুধু কয়েকটি হরিণের প্রতিকৃতি না ভেবে হয়তো একটি সমগ্র দৃশ্যের রূপায়ণ বলে আমরা কল্পনা করতে পারি। এই ধরনের

দৃশ্যের তুলনায় আরও বিরল ছবিতে কোনও ঘটনার বর্ণনা ; একটি দৃষ্টান্ত হয়তো ঐ পাখিমুখী মানুষের ছবিটি, কিন্তু এই শ্রেণীতে ফেলা যায় এমন পটের সংখ্যা নগণ্য।

প্রাণীদের স্বতন্ত্র রূপায়ণ ও শূন্য পরিবেশ থেকে এমন কথা মনে করা মস্ত ভুল হবে যে গুহাচিত্র প্রাণহীন, তার জন্তুগুলি কপিবুকের ছবির মত চরিত্র-বর্জিত। এই ছবির দিকে এক বার মাত্র তাকালে সে ধারণা দূর হয় আর তা না হলে এই শিল্পের প্রসঙ্গে এত কথা বলবারও কোনও অর্থ হত না। পটের পশুরা অনেক সময়েই ছুটছে, লাফাচ্ছে অথবা চরছে, কিন্তু যখন কিছুই করছে না তখনও তারা আড়ষ্ট নয়। অধিকাংশ প্রতিকৃতির মধ্যেই দেহের এমন একটি ভঙ্গি আছে যা সেই প্রাণীটির সম্পূর্ণ নিজস্ব, মুখে চোখে ভাবে তার প্রজাতিগত চরিত্রটি এমন ফুটেছে যেন তাতে প্রকৃতির আপন হাতের ছোঁয়া ; এবং এ সবই হয়েছে রেখার মিতব্যয়িতা ও অসম্পূর্ণতার মাধ্যমে। মাত্র কয়েকটি তুলির টানে এ কালের নিপুণ শিল্পী কি করে শুধু একটি মুখ নয় তার চরিত্রকে পর্যন্ত রূপ দেন তা দেখে আমরা অবাক হই—এ ক্ষমতা প্রস্তর যুগের শিল্পীদের হাতে পূর্ণ মাত্রায় ধরা দিয়েছিল। শুধু মুখ চোখ নয়, অল্প কয়েকটি তেরছা টানে ঘাড়ের বা গলার লোম পরিপাটি ফুটে উঠেছে, সামান্য তুলির আঁচড়ে দ্বিভক্ত খুর বা স্ফীত পেশী প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। শুধু রেখায় নয় রঙেও শূন্যতা সার্থক হতে পারে, সে দিনের শিল্পী তা যে উপলব্ধি করেছিল তা বোঝা যায় যখন চোখে পড়ে ছবির মাঝে মাঝে রং বাদ দিয়ে বা লাগানো রং চেঁছে ফেলে কি সুন্দর ভাবে সে মূর্তি দিয়েছে নাক চোখ ঠোঁট, ফুটিয়ে তুলেছে দেহপার্শ্বের বঙ্কিম ডৌল। মনে রাখতে হবে যে সে কালের শিল্পীদের ছিল না স্কুল বা বই-পড়া বিদ্যা, ছিল না কাগজ পেনসিল—কঠিন শিলাপটে রুক্ষ পাষাণ-ফলক দিয়ে এঁকেছে তারা। গুহার অন্তঃপুরে যখন ছবি আঁকত চিত্রকর তখন চোখের সামনে থাকত না কোনও মডেল, বাইরে দেখা পশুর স্মৃতিই ছিল একমাত্র নির্ভর। তারা যে দেখতে জানত এ তার মস্ত বড় প্রমাণ। আজকের জাপানী চিত্রকররাও নাকি এ ভাবে স্মৃতির থেকে আঁকেন তাদের ছবি, কয়েকটি মাত্র সতেজ সুস্পষ্ট রেখায়। কঠিন পাথরের গায়ে রেখার টানে ভুল হলে তাকে তুলে ফেলে নতুন করে আঁকা সহজ ছিল না, তবু এ ধরনের চেষ্টা বা তার প্রয়োজন প্রায় দেখাই যায় না গুহাচিত্রে।

অল্প কথায় বলতে গেলে গুহাচিত্রের প্রধান প্রাণধর্ম তিনটি : বাস্তব ও অভিনবের অপূর্ব সংমিশ্রণ, চিত্রিত পশুর স্বকীয় সাবলীল ভঙ্গি, এবং অল্প ও অসম্পূর্ণ রেখার সুদক্ষ সংকেত। এই তিন গুণে সে কালের সেরা ছবিগুলি এ কালের কড়া বিচারেও রসোত্তীর্ণ হয়েছে।

প্রস্তর যুগের শিল্পীদের কোনও কোনও কাজ এত সূক্ষ্ম বা এত ক্ষুদ্র যে প্রখর বৈদ্যুতিক আলোয় তা সবে চোখে পড়ে মাত্র (মনে রাখতে হবে যে এগুলি সৃষ্টি হয়েছে মিটমিটে প্রদীপের আলোয়), তবু তাদের সৌন্দর্য কম নয় বৃহত্তর পটের তুলনায়। আবার কখনও বা ছবি এত বড় যে তার সবটা এক সঙ্গে দেখা যায় না, তবু বিভিন্ন অংশের পরিপ্রেক্ষিত নির্ভুল। সবচেয়ে মনোরম পটগুলিতে প্রায়ই তুলি ও খোদাই কাজের আশ্চর্য সম্মেলন দেখা যায়। বহু-রঙা সৃষ্টির উল্লেখযোগ্য নিদর্শন ফঁদগোম (Font-de-Gaume) গুহার আশীটি প্রাচীরপট। অনেক প্রখ্যাত শিল্পী ও শিল্পীজ্ঞ মনে করেন যে গুহাচিত্রের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি (যেমন আলতামিরার বহু-রঙা বাইসন) এ যুগের তুলনায় কোনও অংশে হীন নয়। এবং আঙ্গিকেও আধুনিক ও পৌরাণিকে আশ্চর্য মিল দেখা যায় ; সেটা আশ্চর্য এই কারণে যে এই সব আঙ্গিক এ কালে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে উদ্‌ভাবিত হয়েছে, গুহাচিত্র আবিষ্কারের আগেই তা স্বতঃস্ফূর্ত !

পুরামানবের ইতিহাসে এই আকস্মিক বিস্ময়কর পরিচ্ছেদটিকে ঠিক ফুল ফোটার সঙ্গে তুলনা করা চলে। হঠাৎ এক দিন তার মনে প্রেরণার কুঁড়ি ধরল, সেই যখন রঙে কাঠি বা আঙুল ডুবিয়ে সে পাথরের গায়ে এলোমেলো আঁকিবুকি কাটতে আরম্ভ করলে। ক্রমে ছবি আঁকবার মাতলামি যেন পেয়ে বসল তাকে, সেই উদ্যম ও অধ্যবসায় গুহায় গুহায় কত পরীক্ষার ভিতর দিয়ে শেষে পূর্ণ বিকাশ লাভ করলে বাস্তবতায় মূর্ত প্রকাণ্ড বহু-রঙা প্রাচীরচিত্রে—যেমন লাস্‌কোর গহ্বরে তার পর দেখতে দেখতে ফুল শুকিয়ে উঠল, এক দিন হঠাৎ ঝরে পড়ল, শিল্পীরা সব কোথায় মিলিয়ে গেল—আত্মবিকাশের এই মৌলিক প্রেরণাটি মানব-মনের কোন্ অতলে লুকিয়ে রইল বহু কাল পর্যন্ত !

ঐ পূর্ণ স্ফূর্তির দিকে সে যুগের শিল্পীরা যে সব ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়েছে আঙ্গিকের ক্রমবিকাশে তা লক্ষ করা যায়। প্রথম দিকের ছবিতে

হয়তো শুধু পশুদেহের বহিরেখাটি আঁকা হয়েছে, চোখের জায়গায় মাত্র একটি ফুটকি। ক্রমে সেই সোজা রেখা ভেঙে ছোট ছোট তেরছা দাগে দেখানো হল ঘাড় বা পেটের লোম, ফুটল চোখ কান খুর, দেখা গেল দুটির জায়গায় চারটি পা, দেহের বিভিন্ন অংশ প্রাণবন্ত হয়ে উঠল অল্প কয়েকটি রেখার আঁচড়ে বা রঙের মাত্রায়। শিশু যখন প্রথম আঁকতে চেষ্টা করে তখন যেমন হয়, প্রথম শিল্পীরাও তেমনি আয়ত্ত করতে পারে নি দূর ও নিকটের যুক্ত রূপায়ণ; পেরিগরদীয় ও ওরিনাসীয় কালের ছবিতে দেখা যায় এক পাশের পা বা শিঙে অন্য পাশের অঙ্গগুলি সম্পূর্ণ ঢাকা পড়েছে, কিংবা হয়তো দূরের শিংকে অস্বাভাবিক ভাবে বেঁকিয়ে দুটোকেই সম্পূর্ণ দেখানো হয়েছে। একমাত্র মাদলেনীয় শিল্পীরা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করেছিল কাছের অঙ্গ দিয়ে দূরের অঙ্গকে আংশিক ঢেকে বাস্তবিক চিত্রণের কৌশল। তারও পরে অন্ত যুগে এই বাস্তবিকতা ক্ষয় পেল সাংকেতিক ও আলংকারিক ধারার মধ্যে, যেমন বহু হাজার বছর পরে নানা শিল্পে সভ্য যুগেও ঘটেছে বারে বারে। রেখার বাহুল্য বাড়তে বাড়তে শেষে পরিণত হল অর্থহীন আঁকিবুকিতে, বুদ্ধিদীপ্ত সংযম পথ হারাল গতানুগতিকতার মধ্যে। গুহাচিত্রে এই নিকৃষ্টের অংশ যে কম নয় তাও মনে রাখা দরকার।

অতি আধুনিক শিল্পধারার সঙ্গে সাবেক কালের মিল দেখা যায় এক বৈশিষ্ট্যে যার নাম দেওয়া হয়েছে 'বিকল পরিপ্রেক্ষিত'। বিখ্যাত চিত্রকর পিকাসোর ছবিতে যেমন দেখি মুখ ফেরানো পাশের দিকে অথচ দুটি চোখই দৃশ্যমান, তেমনি গুহাচিত্রে পাশ-ফেরা জন্তুর পায়ে দ্বিভক্ত খুর দেখা যায় সম্পূর্ণ, যেন ঠিক ঐ অংশে পা বেঁকিয়ে দেওয়া হয়েছে সামনের দিকে।

কোনও কোনও ক্ষেত্রে একই ছবিতে বিভিন্ন আঙ্গিকের সংযোগ দেখা যায়, যেমন ঐ পাখিমুখী মরা লোকটির ছবিতে মানুষটি সাংকেতিক, বাইসন ও গণ্ডার বাস্তবিক। এই বৈষম্যের কি কারণ তা জানা নেই—হয়তো এরা বিভিন্ন শিল্পীর বা বিভিন্ন কালের কাজ।

মাদলেনীয় কালে চিত্রে ও ভাস্কর্যে প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ সম্ভবত চার পাঁচ হাজার বছর ধরে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। তার পর শেষ তুষার যুগের একেবারে শেষে বা পরবর্তী উষ্ণ যুগের শুরুতে, খৃষ্ট জন্মের ১০,০০০ বছর আগে কি আরও কিছু দেরিতে, য়োরোপে এই মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

হয়তো দেশত্যাগী হল তারা, নয়তো মিশে গেল নতুন আগন্তুকের মধ্যে ; কিন্তু যাই ঘটে থাকুক, পরবর্তী প্রায় ১৫,০০০ বছরের মধ্যে, অর্থাৎ য়োরোপীয় মধ্যযুগ পর্যন্ত ঐ অঞ্চলে শিল্প সৃষ্টির উদ্যম রইল অসাড় হয়ে। গুহায় গুহায় দীপ নিভে গেল, নিশ্ছিদ্র অন্ধকার আর অখণ্ড শান্তির মধ্যে দেয়ালে দেয়ালে পশুরা ঘুমিয়ে পড়ল বহু হাজার বছরের ঘুমে। মাটির গর্ভে সে ঘুম তাদের যখন আবার ভাঙল মানুষের পায়ের শব্দে আর বিস্মিত চীৎকারে, মাটির উপরে তখন তারা অনেকেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে।

গুহাচিত্রের কি উদ্দেশ্য, কি প্রেরণায় মানুষ হঠাৎ দেয়ালের গায়ে ছবি আঁকতে শুরু করেছিল এ প্রশ্ন অবান্তর মনে হতে পারে ; মনে হতে পারে তার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যবোধ এই সৃষ্টির মধ্যে চরিতার্থ হয়েছে, যেমন আজও হচ্ছে, এবং সে দিনও এর প্রেরণাই ছিল যথেষ্ট। এই ধারণা আপাত-দৃষ্টিতে স্বাভাবিক মনে হলেও আজ কোনও বিশেষজ্ঞই তা বিশ্বাস করেন না। এঁরা মনে করেন নিছক সৌন্দর্য উপাসনা (art for art's sake) বা অবসর বিনোদন এর উদ্দেশ্য নয়, এই শিল্পচর্চা সম্পূর্ণ ব্যবহারিক, যাকে বরং বলা চলে ফলিত কলা (applied art)। এই ধারণার স্বপক্ষে অনেক কারণ আছে, এক বড় যুক্তি এই যে ছবি অনেক সময়ে এমন জায়গায় এমন ভাবে আঁকা হয়েছে যে দর্শকের পক্ষে তার গুণ উপলব্ধি করা এবং তার সৌন্দর্য উপভোগ করা তো দূরের কথা, ছবির মুখোমুখি হওয়াই অত্যন্ত কঠিন ; ছবি কখনও খাড়া দেয়ালের অনেক উঁচুতে অবস্থিত যেখানে দৃষ্টি পৌঁছায় না, কখনও অতি নিচু ছাতের গায়ে (যেমন আলতামিরায়), কখনও বা দুস্তর সংকীর্ণ সুড়ঙ্গ পেরিয়ে কোনও অন্ধকার কোণে, হয়তো দু মাইল গভীর ভূগর্ভে। এ ছাড়া সাধারণ গুহারও অভ্যন্তর ঠাণ্ডা, ভিজে ও অন্ধকার ; আগুন জ্বাললে ধোঁয়ায় দম আটকে আসে, সেখানে বেশী ক্ষণ থাকা সম্ভব নয়।

এই ধরনের গহন গভীর গুহা গহ্বরের আবিষ্কারে ও পরীক্ষায় সে কালের ও এ কালের মানুষের যে অদম্য সাহসিকতা ও উৎসাহ প্রকাশ পেয়েছে কয়েকটি উদাহরণ না দিলে তার সম্যক উপলব্ধি সম্ভব নয়। সে দিনের মানুষ গুহা বা শিলাশ্রয়ের মুখ প্রায়ই চিত্রাঙ্কিত করেছে, কিন্তু কি এক প্রেরণা আবার তাকে ঠেলে নিয়ে গিয়েছে একেবারে অন্ধকারের অন্তঃপুরে,

সবচেয়ে দুর্গম, বিপদসংকুল, ঘোরালো পথ পেরিয়ে; সেই সব আঁধি-কামরায় এঁকেছে সে তার শ্রেষ্ঠ ছবি। ফ্রান্সের দরদইন (Dordogne) বিভাগে কঁবারেল (Combarelles) গুহা ৭২০ ফুট দীর্ঘ, কিন্তু তার ছ ফুট চওড়া সুড়ঙ্গে ছবি আরম্ভ হয়েছে ৩৫০ ফুট ভিতরে ঢুকে, অখণ্ড তমসায়। স্পেইনে লা পাসিয়েগা (La Pasiega) গুহার প্রবেশপথ নদীর ৫০০ ফুট উঁচুতে এক ক্ষুদ্র গহ্বর দিয়ে, ভিতরে চুনাপাথরের মেঝেতে এত সংকীর্ণ এক গর্ত যে কোনও সাধারণ লোকের পক্ষে তার ভিতর দিয়ে নেমে পড়া কঠিন কাজ—কিন্তু এক বার নামলে সে এক আশ্চর্য দৃশ্য ! আরব্যোপন্যাসের প্রাসাদের মত কক্ষের পর কক্ষ, দেয়ালে দেয়ালে বিস্ময়কর ছবি, তাদের সংখ্যা ২৬২। অতি কষ্টে আর একটি ফাটল পার হয়ে আসতে হয় শেষ ঘরটিতে, এর নাম দেওয়া হয়েছে 'সভাঘর', কারণ চুনাপাথরের এক স্বাভাবিক 'সিংহাসন' সেখানে বিরাজমান। ক্রোমানীয় মানুষ যে এই সিংহাসনে বার বার বসেছে তা বোঝা যায় হাতলে তার ময়লা হাতের ছাপ দেখে, এখানে সে ছবি এঁকেছে, রেখে গিয়েছে হাতিয়ার—এ সবের থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান যে এই সব রহস্যময় অলিগলির পথে মানুষের আনা-গোনা ছিল ঘন ঘন, যদিও তারা জানত যে এক বার পা পিছলালেই সর্বনাশ।

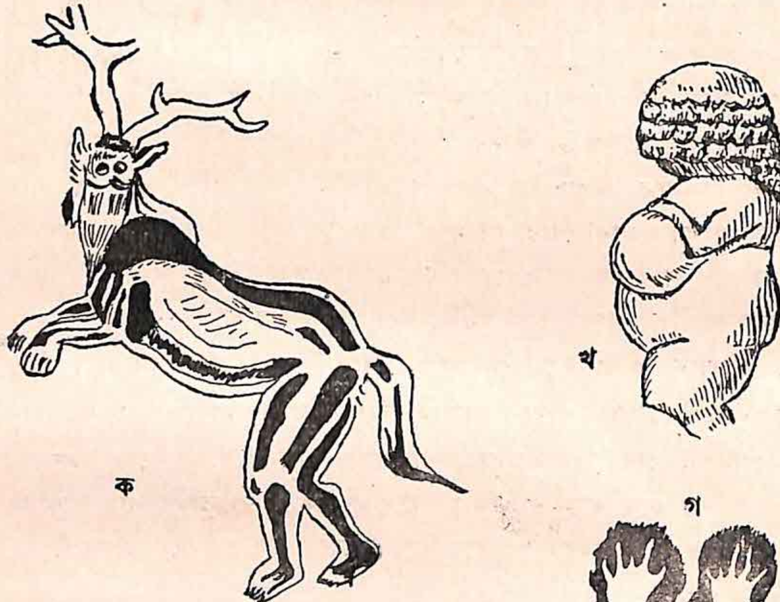
ফ্রান্সের বৃহত্তম গুহা নিও (Niaux) পাহাড়ের ভিতরে ৪২০০ ফুট ঢুকেছে, প্রথমে পথ আটকে দাঁড়ায় ভূগর্ভের এক হ্রদ, তাকে পেরিয়ে দীর্ঘ সুড়ঙ্গ, পথে নানা জায়গায় সাঁতার কেটে জল পার হতে হয়, কোথাও হামাগুড়ি দিয়ে কোনও গতিকে শ্বাসরোধকারী সংকীর্ণ বর্ত্ম অতিক্রম করেই হয়তো দেখা যায় উত্তুঙ্গ পাথরের চাপ পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে। তবু ক্রোমানীয় মানব যে নিয়মিত এ পথে চলাফেরা করেছে কাদায় তাদের স্পষ্ট পদচিহ্ন তা প্রমাণ করে।

এক ফরাসী সাঁতারু, নাম কাস্তেরে (Casteret), ১৯২৩ সালে যে আশ্চর্য সাহস ও সহনশীলতার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন তা অমর হয়ে থাকবে গুহা-আবিষ্কারের ইতিহাসে। লাস্কোর কাছেই ওরিনিয়াক নামক জায়গা (যার থেকে ওরিনাসীয়), তার মাইল কয়েক দূরে মতেস্পাঁ গুহা ; গুহার ভিতর দিয়ে এক জলধারা বয়ে গিয়েছে, জল কোথাও কোথাও ছাত পর্যন্ত ঠেকে, সে

জন্য এর ভিতরে ঢোকার সব চেষ্টা ইতিপূর্বে ব্যর্থ হয়েছে। অবশেষে কাস্তেরে স্থির করলেন তিনি সাঁতরে পার হবেন রাস্তা। কিন্তু আরম্ভ করে দেখা গেল জল আর শেষ হয় না; পাহাড়ের গর্ভে নদী ঢুকেছে তিন চার মাইল, তার সবটাই পার হতে হল বরফের মত কনকনে জল সাঁতরে বা হেঁটে, দু জায়গায় ছাতে মাথা ঠেকে গেল, তখন ডুব সাঁতার ছাড়া উপায় নেই—কিন্তু কত ক্ষণ পরে মাথা তুলে শ্বাস নেওয়া যাবে তা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত! এ ভাবে এত বাধা বিপত্তি লঙ্ঘন করে অবশেষে যা পুরস্কার তিনি পেলেন তাতে অবশ্য সার্থক হল সব শ্রম আর দুঃসাহস, কিন্তু তার চেয়েও বিস্ময়কর এই যে হাজার হাজার বছর আগেও মানুষ ঠিক এই বিপদই অগ্রাহ্য করেছে, তারও বুকে ছিল এতখানি সাহস; বরং আরও বেশী, কারণ তার ছিল না বৈদ্যুতিক আলো, কৃত্রিম শ্বাস-ব্যবস্থা, আধুনিক বিজ্ঞানের নানা উপকরণ। এই পথেই কবে প্রথম কে এক অসমসাহসী প্রাণ হাতে করে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সম্পূর্ণ অজানা ঘোর তিমিরে, হিমশীতল জলে কখনও ভেসে কখনও ডুবে পিছল পাথরের গা বেয়ে এগিয়ে চলেছে গভীর থেকে গভীরে, পিছনে দাঁড়িয়ে প্রদীপ হাতে তার সঙ্গীরা অপেক্ষায় অধীর হয়েছে···ফিরে আসবে কি, অভিযান সফল হবে কি, পাওয়া যাবে তো ছবি আঁকবার ঘর? এই কল্পনা-চিত্রটি চোখের সামনে থাকলে বিংশ শতাব্দীর মানুষের যত অভিমান ও অহমিকা, তার হিমালয় জয়, তার মেরু আবিষ্কার, এ সবের উজ্জ্বলতা কিছুটা ম্লান হয়ে যায় না কি? মনে হয় যে যে কৌতূহল উদ্যম ও সাহস মানুষকে আজ এতখানি এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে প্রগতির পথে তা মানুষেরই সমান প্রাচীন।

সে দিন মঁতেস্পাঁ গুহার অনুসন্ধানীরা যা চেয়েছিল তা তারা পেয়েছিল। কাস্তেরে অবশেষে যে কক্ষে গিয়ে পৌঁছালেন তার মেঝেতে এক কালে ছিল বহু পশুমূর্তি, এখন ঝরা জলে তার অনেকগুলি নষ্ট; কয়েকটি ঘোড়া চেনা যায়, আর ঘরের মাঝখানে এক বেদীর উপর সাড়ে তিন ফুট লম্বা আর দু ফুট উঁচু এক বিমুণ্ড ভালুক মূর্তি; তার ঘাড়টা সমান করে কাটা, মধ্যে এক গর্ত, হয়তো শিক ঢুকিয়ে সত্যিকারের মাথা জুড়বার জন্য—এ ধারণার সাক্ষী স্বরূপ এক ভাঙা খুলি পড়ে আছে সামনে। এ ছাড়া পাঁচ ফুট দীর্ঘ তিনটি সিংহী মূর্তিও পাওয়া গেল; প্রতিটি মূর্তি বারে বারে বর্শাবিদ্ধ করা হয়েছে।

শুধু দুর্গম গুহা গহ্বরের আবিষ্কারেই নয়, ছবি আঁকার কাজেও সে যুগের শিল্পীদের অনেক কষ্ট অনেক বিপদ অগ্রাহ্য করতে হয়েছে। হয়তো কখনও আর কারও কাঁধে দাঁড়িয়ে, কখনও শুয়ে পড়ে সে হাত পেয়েছে নির্ধারিত স্থানে। আলতামিরার নিচু ছাতের কথা আগে বলেছি, তার চিত্রণে শিল্পী-দের নিশ্চয় চিত হয়ে পড়তে হয়েছে, এ কালে মিকেলান্‌জেলোকে যেমন হতে হয়েছিল রোমের সিস্‌টিন ভজনালয়ের ছাত আঁকতে। ত্রোআ ফ্রের (Trois Freres) গুহার গভীর গর্ভে এক মুখোস-পরা ছদ্মবেশী নর্তকের



৩২নং চিত্র

ক, ত্রোআ ফ্রের গুহার মুখোস-পরা নর্তক ; খ, 'ভিনাস' বা জননী দেবীর মূর্তি ; গ, গুহার গায়ে হাতের ছাপ।

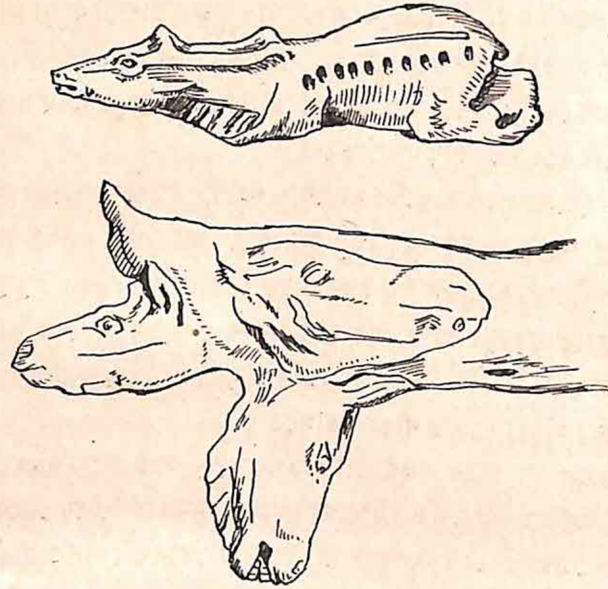
প্রসিদ্ধ ছবি আছে, তার মাথায় হরিণের শিং, পিছনে লেজ ; এই ছবির কাছাকাছি যাওয়ার একমাত্র উপায় হল জানালার মত এক খুপরির থেকে ঝুলে পড়ে পায়ের আঙুল দিয়ে প্রসারিত চুনাপাথরের এক স্ট্যালাকটাইটের উপর ভর করা। (এতখানি কৃচ্ছ্র সাধনের থেকে মনে হয় মূর্তিটি কোনও সম্মানিত ব্যক্তির—হয়তো সর্দার জাদুকর বা যাজকের, অথবা ছদ্মবেশী শিকারীর—কিন্তু সে কথা একটু পরে।) নানাবিধ সংকেত ও চিহ্নের প্রতিও

যে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হত তাও অনেক সময়ে বোঝা যায় এ সবের অবস্থিতি থেকে; কতগুলি সংকেত দেখা যায় খুব উঁচু এক খুপরির মধ্যে যেখানে চড়তে হয় প্রাণ হাতে করে। আরও কতগুলি চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে ভূগর্ভের এক তমসাবৃত হ্রদের ধারে, পাথরের এক তাকের উপর যা দেখে মনে হয় যেন বেদী; অন্যত্র এক খুপরির ছাতে যে সংকেত চিহ্নিত হয়েছে তা দেখতে হলে শুয়ে পড়া ছাড়া উপায় নেই।

দূর ও দুর্গমের সঙ্গে মানুষের মন বোধ হয় পবিত্রতাকে জড়িত করতে চায় (আমাদের অনেক তীর্থস্থানই তার প্রমাণ), তাই এমন মনে হওয়া আশ্চর্য নয় যে গুহাচিত্রের সঙ্গে কোনও রকম অনুষ্ঠানের যোগ ছিল। তুক্‌দোদুবের গুহার মেঝেতে শুধুমাত্র গোড়ালির ছাপ অনেক দেখা যায়, যেন সাম্প্রদায়িক নাচের ইঙ্গিত। কোনও কোনও ছদ্মবেশী মূর্তিও (যেমন উপরোক্ত হরিণ-বেশী ব্যক্তি) আঁকা হয়েছে নাচের ভঙ্গিতে।

তা ছাড়া যে ভাবে একই পটের উপর নতুন করে এঁকে পুরনো ছবিকে নষ্ট করা হয়েছে তাতেও সুন্দরের প্রতি মমতার চেয়ে কোনও একটা ব্যবহারিক প্রেরণাই বেশী প্রকাশমান। অবশ্য কোনও কোনও ছবির আলংকারিক ভাবটা এত স্পষ্ট যে অন্য উদ্দেশ্যের সঙ্গে সৌন্দর্যসৃষ্টির প্রেরণা যে কিছুটা মিশে ছিল না এমন কথা জোর করে বলা যায় না। উপরন্তু হাড় বা হাতির দাঁতের তৈরি যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রের হাতলে প্রায়ই যে কারুকাজ ও পশুমূর্তির রূপায়ণ দেখা যায় মনে হয় তাও নিঃস্বার্থ সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা থেকেই স্ফূর্ত; এই ধরনের ভাস্কর্যে স্বাভাবিকতা ও ব্যবহারিক সুবিধার যে সাযুজ্য ও সমন্বয় চোখে পড়ে তা সত্যিই চমকপ্রদ, সন্দেহ থাকে না যে অনেক চিন্তায় অনেক যত্নে শিল্পী এমন একটি পশু ও তার এমন একটি ভঙ্গি বেছে নিয়েছে যা তার যন্ত্রটির সঙ্গে ঠিক খাপ খায়। এই চেষ্টার মধ্যে নিশ্চয় সব কিছু উদ্দেশ্যের উপরে নিছক নিরঙ্কুশ শিল্পানুরাগই স্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান। শ্রেষ্ঠ গুহাচিত্রগুলিতেও পশুর প্রাণবন্ত চেহারার থেকে বোঝা যায় যে ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে সত্ত্বেও শিল্পীর মনে সৌন্দর্যের উদ্দীপনা জেগে উঠেছিল। এই যুগেই সে সৌন্দর্যবোধের প্রথম উন্মেষ তাও নয়, লক্ষ বছরাধিক প্রাচীন পাথুরে উপকরণে, অর্থাৎ নেয়ানডারটাল কালে কি তারও আগে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত যত্নের চিহ্ন যে দেখা যায় তা আগে বলেছি।

গুহাচিত্রের প্রধান উদ্দেশ্যকে বলা হয়েছে যোজক জাদু (sympathetic magic) ; অর্থাৎ, পণ্ডিতদের মতে, মন্ত্র বা আচার অনুষ্ঠানের সাহায্যে



৩৩নং চিত্র
হাতিয়ারের হাতলে শিল্পীর কাজ।

শিকারের পশুকে বশে আনবার চেষ্টা করা হত, যাতে সে কাছে আসে, সহজে ধরা দেয়—এবং গুহাচিত্র এই অনুষ্ঠানেরই অঙ্গ। তাই মাঝে মাঝে দেখা যায় অস্ত্রবিদ্ধ আহত পশুর ছবি, কখনও বা ছবির গায়ে সত্যিকারের অস্ত্রের বা হাতের আঘাতের চিহ্ন, তাই পটে পটে এমন প্রাণীর প্রাধান্য যারা মানুষের ভোক্ষ্য বা শত্রু। তা ছাড়া এ ধরনের বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান বর্তমান জগতের আদিবাসীদের মধ্যেও দেখা যায় ; শুধু বর্বর সমাজে কেন, মাত্র গত শতাব্দীতে ইংলণ্ডে পর্যন্ত অনেকেরই মনে এই সংস্কার ছিল, শত্রুর মোম-মূর্তি বানিয়ে তাকে কাঁটাবিদ্ধ করে এরা তার মৃত্যু বা অনিষ্ট ঘটাতে চেষ্টা করেছে। আজও সে দেশে গাই ফকৃস-এর প্রতিকৃতি দাহনে, এ দেশে রাবণের প্রতিকৃতি দাহনে প্রস্তর যুগের বিশ্বাসই প্রতিফলিত ; সে দিনের জাদু আজ হয়তো সম্পূর্ণ রূপকে পরিণত, কিন্তু আনুষ্ঠানিক যোগসূত্রটি আজ পর্যন্ত সভ্য জগতেও অনুধাবন করা যায়।

শিকারে জাদুর ব্যবহার ও মন্ত্রশক্তির উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে ফিনল্যাণ্ডের এক পুরাকাহিনী থেকে। ব্যাধ লেমিনকাইনেন বনে ঢুকে সুর করে গাইছে, "হে বনদেব টাপিও, আমার সহায় হও, শিকারের কাছে নিয়ে চল আমাকে।" বনদেবীকে বলছে, "আমার দিকে শিকার পাঠিয়ে দাও, যদি নিজে কষ্ট করতে না চাও তো তোমার দাসীদের বল আমাকে সাহায্য করতে।" তার মেয়ের উদ্দেশ্যে বলছে, "পশুদের পিছনে বেত মেরে তাদের পাঠিয়ে দাও এ দিকে, আমি অপেক্ষা করে আছি।" মন্ত্রবলে কাজ হল, দেব দেবী ও কন্যারা খুশী হয়ে হরিণ পাঠিয়ে দিলে শিকারীর দিকে, হরিণ মেরে সে এ বার গাইলে কৃতজ্ঞতার গান, তার পর তাদের জন্য সোনা রূপা ছড়িয়ে রেখে ঘরে ফিরল।

কিন্তু জাদুকে মেনে নিলেও গুহাচিত্রের সব সমস্যা মেটে না। হতাহত পশুর তুলনায় অক্ষত পশুর এবং শান্তিপূর্ণ ভঙ্গিতে রূপায়িত পশুর সংখ্যা অনেক বেশী। তা ছাড়া, পশু পাখির মাথাযুক্ত ঐ আধা-মানুষগুলি কি? কেউ কেউ বলেছেন এরা আসলে জাদুকরেরই মূর্তি, সে মুখোস পরে আত্ম-গোপন করেছে যাতে সহজে শিকারের কাছে এগোতে পারে। মুখোসের এই ব্যবহার নাকি ব্যাধ সমাজে এখনও চলতি আছে অনেক জায়গায়, যেমন আমেরিকার ইণ্ডিয়ান ও দক্ষিণ আফ্রিকার বুশম্যানদের মধ্যে। কিন্তু এই ব্যাখ্যায় অন্যান্য অদ্ভুত মূর্তির রহস্য মেটে না—যেমন সম্পূর্ণ কাল্পনিক কোনও পশু বা বকচ্ছপ জাতীয় কোনও সংকর, যাদের কথা আগে বলেছি।

এখনও পৃথিবীর অন্ধকারাচ্ছন্ন কোণে কোণে এমন অনেক ধর্মবিশ্বাসের সাক্ষাৎ মেলে যাদের প্রধান উপজীব্য হল কোনও এক পবিত্র পশু, গাছ, এমন কি জড়বস্তু। এই সব টোটেম-তন্ত্রী সম্প্রদায়ের বিশ্বাস যে একই আদি-পুরুষ থেকে তারা এবং তাদের বিশেষ টোটেম উদ্ভূত। টোটেম-তন্ত্রের বিস্তৃতির থেকে মনে হয় তার উৎপত্তি অতি প্রাচীন, এবং কেউ কেউ বলেছেন যে গুহাচিত্রের পশুরা টোটেমেরই রূপায়ণ। এতে অবশ্য এই আধা-মানুষ-গুলির ব্যাখ্যা হয় (যাদের টোটেম পশু তাদের আদি পুরুষ পশু-মানব), কিন্তু সব সমস্যা মেটে না। পবিত্র টোটেমকে আহত অবস্থায় কেন দেখানো হবে? একই গুহায় একাধিক প্রাণীর ছবিই বা কেন থাকবে যদি তা ব্যবহার করে থাকে কোনও এক বিশেষ সম্প্রদায়?

এ ছাড়া আরও নানা রকম চমকপ্রদ ব্যাখ্যা প্রস্তাবিত হয়েছে। যেমন কেউ কেউ বলেন যে ঐ মানুষ জাতীয় চেহারাগুলি আসলে পরলোকগত পিতামহদের বা প্রেতাত্মার প্রতিমূর্তি, এবং ঐ যে জালকাটা জ্যামিতিক নক্‌শার কথা আগে বলেছি সেগুলি হল বিরুদ্ধ আত্মাকে ধরে ফেলবার ফাঁদ, যাতে সে শিকারে বাধা দিতে না পারে। এই ধরনের ফাঁদ নাকি মালয়ে আজও ব্যবহার হয়। পিতৃপুরুষের ভীতি মানুষের সমাজে বোধ হয় বহু প্রাচীন কাল থেকে বদ্ধমূল ; নেয়ানডারটাল কালে যখন কবর প্রথার সূচনা হল মনে হয় তখন থেকেই মানুষ অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছে—এরই ফলে সম্ভবত সে খুলির পূজা করেছে, মৃতের মুণ্ডচ্ছেদ করেছে। পক্ষান্তরে আবার এমন মতও প্রকাশ করা হয়েছে যে গুহাচিত্রের প্রায়-মানুষরা আসলে পূর্বপুরুষ নয়, পুরাণ বা রূপকথার কাল্পনিক জীব তারা, সম্ভবত দেবতা। তথাকথিত মাতৃ-দেবতার কথা এই প্রসঙ্গে মনে করা যেতে পারে।

এর আগে নানা রকম সংকেতের কথা বলেছি ; ফুটকি বা সোজা দাগ কোনও রকম স্মারকচিহ্ন হতে পারে, সংখ্যা গণনায় যেমন ব্যবহার হয়। অন্যান্য চিহ্ন মালিকানার সংকেত হয়ে থাকতে পারে। কোনও কোনওটির অবস্থিতি এমন যে মনে হয় যেন জাদুর মন্ত্র ছবির ভাষায় লেখা।

গুহাচিত্র পৌরাণিক কাহিনীর রূপায়ণ এমন কথাও বলা হয়েছে ; তা হলে, মানুষ যে চির কাল গল্প বলতে ভালবাসে এই তার প্রাচীনতম নিদর্শন। আবার মাঝে মাঝে দু একটি ছবি দেখে মনে হয় যেন শিল্পী সত্যিকারের কোনও দৃশ্য ধরতে চেষ্টা করেছে তার তুলিতে বা ছুরিতে। কেউ বা বলেছেন যে ছবিগুলি আসলে শিকারে নিহত পশুদের প্রতিকৃতি।

কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য যে ব্যাখ্যা তাতে বলে যে আসলে গুহাচিত্র এ সব প্রাণীর সৃষ্টি-আলেখ্য ; সে কালে নাকি বিশ্বাস ছিল যে পৃথিবী মাতার গর্ভে জন্ম নিয়ে প্রাণীরা এই সব সুড়ঙ্গ আর গহ্বরের পথে মাটির উপর উঠে আসত।

কোনও ব্যাখ্যাতেই সব প্রশ্নের জবাব মেলে না, তবে সর্বাধিক সমস্যার মীমাংসা হয় শিকারী জাদুর থিওরি দিয়ে। এবং সে কালের জীবনে শিকার এত জরুরী ব্যাপার ছিল যে নৃতত্ত্ববিদরা মনে করেন দেয়ালে দেয়ালে যারা

এই মায়ার জাল বিস্তার করেছে, মাদলেনীয় সমাজে তাদের স্থান ছিল বিশেষ প্রতিষ্ঠাপূর্ণ ; জীবন্ত পশুর পিছনে তাড়া না করেও তারা মাংসের ভাগ পেত, অন্যান্য দিনগত শ্রমেও তাদের শক্তিক্ষয় করতে হত না। তা যদি হয় তো শিল্পীর সেই স্বর্ণযুগ আজ পর্যন্ত আর ফিরে আসে নি—যদিও শিল্পের প্রতিষ্ঠা এত বেড়েছে !

১২। আফ্রিকার শিল্পীদল

গুহাচিত্র সম্বন্ধে এত কথা জানার পর স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে য়োরোপে ছাড়া মানুষ কি আর কোথাও ছবি আঁকে নি ? য়োরোপীয় খাঁটি মানুষ আমাদের সবচেয়ে সুপরিচিত হলেও অন্যত্র যে তাদের বসবাস ছিল তা আমরা জানি— তাদের মনে কি কখনও এই নেশা ধরে নি ? অন্তত আফ্রিকায় যে ধরেছিল তার প্রমাণ আছে, এবং এই শিল্প আরও উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে এর বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক দুইই য়োরোপীয় অঙ্কনশিল্পের তুলনায় অনেকাংশে বিভিন্ন।

মধ্য ও দক্ষিণ আফ্রিকায় খাঁটি মানুষ আবির্ভূত হয়েছে খুব প্রাচীন কালে, তা বোঝা যায় বিভিন্ন অঞ্চলে যে সব হাতিয়ার তারা রেখে গিয়েছে তার থেকে। এর অনেক পরে দেখা দিয়েছে চিত্রশিল্প, যদিও তাকে গুহাচিত্র আখ্যা দেওয়া ঠিক হবে না। মধ্য ও দক্ষিণ আফ্রিকায় এই শিল্পের সূচনা য়োরোপের মাদলেনীয় কালেই, কিন্তু শেষ অনেক পরে। শিল্পীর যন্ত্র পাথরের গায়ে পাখির মত ঠুকরে ঠুকরে মূর্তির রূপ দিত, ছবির কোনও নির্দিষ্ট বহির্রেখা টানা হত না—য়োরোপের ক্ষোদিত চিত্রের থেকে এই তার মৌলিক পার্থক্য। ট্রান্সভাল অঞ্চলে মাটির থেকে মাথা তুলে আছে ধাতুতুল্য কঠিন প্রকাণ্ড পাথরের পাটা, তার উপরে এই কাজের চমৎকার দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায় ; গণ্ডার ম্যাস্টোডন ইত্যাদির আশ্চর্য প্রাণময় প্রতিকৃতি—শ্রেষ্ঠ চিত্রগুলির গুণ যে কোনও কালের উৎকীর্ণ পশু-

মূর্তির সমান। এক ছবিতে গণ্ডারের গায়ে পাখিরা বসেছে পোকার খোঁজে, বিরক্তি ভরে সে মাথা তুলেছে, লেজ ঘুরিয়ে তাদের তাড়াতে চেষ্টা করছে—চোখ নাসারন্ধ্র গায়ে চামড়ার ভাঁজ সব একেবারে নিখুঁত। এ শুধু অনেকের মধ্যে একটি দৃষ্টান্ত। এ ধরনের ছবি দেখলে মনে হয় পশুটি যেন শিল্পীর চোখে দেখা, শিকারীর চোখে নয়।

সবচেয়ে চমকপ্রদ ব্যাপার এই যে এ সব ছবিতে অন্তত দশ রকম প্রাণীর প্রতিকৃতি দেখা গিয়েছে যারা সম্পূর্ণ অবলুপ্ত বলে তখন পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল। হাতির ও ম্যামথের পূর্বপুরুষ ম্যাস্টোডন মানুষের আবির্ভাবের অনেক আগেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে এমন কথাই জানা ছিল; বিস্মিত বিশেষজ্ঞরা এ বার মানতে বাধ্য হলেন যে আফ্রিকার গহন গর্ভে আরও অনেক দিন তারা বেঁচে ছিল। বিজ্ঞান যে কলার কাছে ঋণী হতে পারে তার এমন সুন্দর দৃষ্টান্ত নিশ্চয় বিরল।

রোডিসিয়া, টাঙানীকা ইত্যাদি অঞ্চলেও আঁকা ও ক্ষোদিত ছবি পাওয়া গিয়েছে। এই সব আলেখ্যের অনুকৃতি দেখালে বৃদ্ধ বুশম্যানরা এখনও উত্তেজিত হয়ে ওঠে, বলে এ তাদের শিল্প, তাদেরই আপন জনের সৃষ্টি—পুনর্বার মনে জাগে স্মৃতির অন্ধকারে প্রায়াবলুপ্ত কোন্ দূর অতীতের গল্পগাথা আচার অনুষ্ঠান নাচ গান…।

ওরিনাসীয়-মাদলেনীয় কালে উত্তর আফ্রিকায় টিউনিস ও পশ্চিম সাহারা এবং য়োরোপে স্পেইনের পূর্বাঞ্চল জুড়ে এক স্বতন্ত্র কৃষ্টি ছিল, তার নাম ক্যাপ্সীয় (Capsian)। এখানেও লোকে ছবি আঁকতে আরম্ভ করেছিল যখন য়োরোপে মাদলেনীয় কাল প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধারায়। য়োরোপীয় গুহাচিত্রের প্রায় নিষ্ক্রিয় ও স্থির পশুমূর্তির সঙ্গে পরিচয় করার পরে ক্যাপ্সীয় ছবিতে সবচেয়ে বেশী নজরে পড়ে মানুষের প্রাধান্য এবং মানুষ ও পশুর তৎপরতা, চাঞ্চল্য। এ সব ছবিরও প্রধান উপজীব্য শিকার—সাহারা তখন ছিল বিবিধ পশুর বাসভূমি এবং প্রকৃষ্ট মৃগয়াক্ষেত্র—এবং ছবি দেখে মনে হয় সেখানে মানুষের প্রধান কাজ ছিল শিকার তাড়া করে বেড়ানো। মানুষগুলির চেহারা অনেকটা ব্যঙ্গচিত্রের মত, দেহটি তৈরি যেন কতগুলি কাঠি জোড়া লাগিয়ে, পা হয়তো বেলুনের মত ফোলা

কিংবা অসম্ভব লম্বা, কোমর বোলতার মত সূক্ষ্ম। এরা সর্বদাই কোনও একটা কাজে ব্যস্ত—হয়তো তীর ছুঁড়ছে (য়োরোপীয় গুহাচিত্রে ধনুকের রূপায়ণ নেই), কিংবা লম্বা লম্বা পা ফেলে শিকারের পিছনে ছুটছে। পুরুষের দেহে অলংকার দেখানো হয়েছে, কিন্তু তা ছাড়া তারা প্রায় সম্পূর্ণ উলঙ্গ; মেয়েদের গায়ে আঁটো বডিস, নিচে ঘণ্টার মত স্কার্ট, মাথায় উঁচু



৩৪নং চিত্র

ক্যাপ্‌সীয় শিল্পের নমুনা ; ক, চাক থেকে মধু সংগ্রহ ; খ, শিকার।

চোখা টুপি। পূর্ব ভূমধ্য সাগরে ক্রীট্ দ্বীপে প্রত্নবিদরা যে ঐতিহাসিক রাজপ্রাসাদ আবিষ্কার করেছেন তার প্রাচীরচিত্রে প্রায় ১৬০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে সে দেশের মেয়েদের বেশভূষার পরিচয় মেলে, তার সঙ্গে পূর্ববর্তিনী ক্যাপ্‌সীয় ললনার ফ্যাশানের আশ্চর্য মিল দেখা যায়। আবার এদের পোশাকের পরিকল্পনা কখনও কখনও আদি মিশরী (৪০০০ বিসি) মৃৎপাত্রে অঙ্কিত নকশার সম্পূর্ণ অনুরূপ। সম্ভবত প্রাগৈতিহাসিক কালেই এ সব দেশের মধ্যে যোগাযোগ ঘটেছিল, কিন্তু কে কার থেকে নিয়েছে তা বলা যায় না। ক্যাপ্‌সীয় শিল্পের কাল সম্বন্ধে শুধু জানা আছে যে তার স্ফূর্তি নবপ্রস্তর যুগের আগেই, এবং ঐ অঞ্চলে এ যুগ আরম্ভ হয়েছে মধ্য প্রাচ্যের অনেক পরে, ২৫০০ বিসির কাছাকাছি।

এই সব আবিষ্কার ঘটবার পরে উত্তর আফ্রিকায় সাহারাতে বহু আঁকা ও খোদাই ছবি পাওয়া গিয়েছে। সাহারা তখন ছিল সরস উর্বর ভূমি—ছবিগুলিতে দেখা যায় জিরাফ সিংহ উটপাখি বুনো গরু গাধা ইত্যাদি, অর্থাৎ এমন সব প্রাণী যারা তৃণপ্রান্তরে চরে বেড়ায়। পানীয় জলের কাছাকাছি,

হয়তো হ্রদ বা জলধারার ধারে, শিল্পীরা এঁকেছে অতিকায় পশুমূর্তি, কখনও বা আসল জন্তুটির চেয়েও বড় তা। কিন্তু বিশেষ কয়েকটি ছবি ছাড়া উত্তর আফ্রিকার শিল্প প্রাণহীন, বিষয়বস্তু আড়ষ্ট—দক্ষিণ আফ্রিকার স্ফূর্তি ও চাঞ্চল্য বা য়োরোপের লালিত্য ও ব্যঞ্জনা নেই এদের মধ্যে।

আফ্রিকায় প্রাগৈতিহাসিক শিল্পসম্ভার যেন অফুরন্ত মনে হয়। সম্প্রতি সাহারাতেই তাসিলি অঞ্চলে ফরাসীরা উদ্‌ঘাটন করেছে এক নতুন শিল্প-কৃষ্টি। বিষয়বস্তু জন্তু জানোয়ার এবং মানুষ (স্ত্রী ও পুরুষ), পাথরের গায়ে নানা রঙে আঁকা, নবপ্রস্তর কালের সৃষ্টি। এই নতুন আবিষ্কার বিশেষজ্ঞরা এখনও ভাল করে পরীক্ষা করে উঠতে পারেন নি, তবে উৎসাহী ব্যক্তিরা এই চিত্রসম্পদকে লাস্‌কোর সঙ্গে তুলনা করেছেন।

১৩। সে যুগের লোক এ যুগে

পুরাপ্রস্তর যুগের সমাপ্তি ও নবপ্রস্তর যুগের সূচনা মানুষের ইতিহাসে এক বৃহৎ সন্ধিক্ষণ—এই নতুন যুগে নব নব আবিষ্কার ও শিক্ষার মধ্য দিয়ে মানুষ দ্রুত অগ্রসর হয়েছে সভ্যতার দিকে। কিন্তু এ প্রসঙ্গে একটা কথা সর্বদা মনে রাখা দরকার : পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে এ সন্ধিক্ষণ দেখা দিয়েছে বিভিন্ন কালে। এমন নয় যে একদা স্কুলের ঘণ্টার মত এক ঘণ্টা বাজল, জগতের সব লোক একই সঙ্গে পুরনো ক্লাস ছেড়ে নতুন ক্লাসে এসে বসল। নবপ্রস্তর যুগের সবচেয়ে বড় শিক্ষা, সবচেয়ে মৌলিক নিশানা হল কৃষি ও পশুপালনের আবিষ্কার—যার ফলে মানুষের খাদ্যসমস্যা অনেক সহজ হয়েছে, সত্যিকারের ঘর বাঁধা সম্ভব হয়েছে তার পক্ষে, এক কথায় জীবনযাত্রার ধারায় এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। কিন্তু আজকের দিনের মত এ আবিষ্কার সে দিন তারে বেতারে এক দণ্ডে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে পারে নি, খবর পৌঁছেছে ধীরে, দূরান্তরের দেশকে হয়তো স্বাধীন ভাবে শিখতে হয়েছে; এ যুগের এত রকম আবিষ্কারের হোতা অগ্রগামী পশ্চিম য়োরোপই সে যুগে কয়েক হাজার বছর পিছিয়ে পড়েছিল মধ্যপ্রাচ্যের*

*মধ্যপ্রাচ্য বলতে মোটামুটি বোঝায় বর্তমান তুরস্ক ও আফগানিস্থানের মধ্যবর্তী অঞ্চল—অর্থাৎ প্রধানত মিশর, সিরিয়া, ইরাক ও ইরান, যদিও সাংবাদিক ও লেখকরা কখনও কখনও ঐ অঞ্চলকে বোঝাতে নিকট-প্রাচ্য শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন; আসলে নিকট-প্রাচ্য প্রধানত তুরস্ক।

তুলনায়। নবপ্রস্তর বিপ্লব শুরু হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যে, কিন্তু জার্মেনিতে তার প্রথম চিহ্ন দেখা দিতে দিতে কেটে গেল প্রায় ৩৫০০ বছর; কাঁসা আবিষ্কারের পরে মধ্যপ্রাচ্যের লোক যখন হাজার বছর ধাতুর সুখ সুবিধা উপভোগ করেছে, ব্রিটেন তখনও নবপ্রস্তর যুগের পাথুরে অস্ত্র ছাড়া কিছু জানে না। এই যুগ ডেনমার্কে শেষ হয়েছে খৃষ্ট জন্মের মাত্র ১৫০০ বছর আগে। এ দিকে পৃথিবীর অপর প্রান্তে নিউজিল্যাণ্ডে মাওরিদের জীবনে পাথরের অস্ত্র, বনের পশু আর ফল মূল ছাড়া প্রাণ ধারণের আর কোনও সঙ্গতি ছিল না ইংলণ্ডে যখন স্টিম এনজিনের আবিষ্কার হয়ে গিয়েছে। এবং এদেরই প্রতিবেশী অসট্রেলিয়ার ৪৭,০০০ আদিবাসী আজও রয়েছে পুরাপ্রস্তর যুগে। অন্যত্র দক্ষিণ আফ্রিকার বুশম্যান ও উত্তর আমেরিকার এসকিমোদেরও গৃহস্থালি এর চেয়ে বেশী অগ্রসর নয়।

এই প্রসঙ্গে অসট্রেলিয়ার এই স্বল্পপরিবর্তিত প্রাচীন গোষ্ঠীর আর একটু বিশদ আলোচনা করা যেতে পারে, কারণ আগেই বলেছি যে এ ধরনের পৌরাণিক সমাজ আজও সাবেক মানুষের সামাজিক ধারা নানা ভাবে রক্ষা করে রেখেছে বলে নৃতত্ত্ববিদরা মনে করেন। তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে এরা আমাদের পৌরাণিক পিতৃপুরুষদের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি; ভৌগোলিক ও জলবায়ু জনিত পার্থক্যের ফলে অন্তত অনেক ক্ষেত্রে তা হওয়া সম্ভব নয়, যেমন অসট্রেলিয়ার আদিবাসীরা অনেকে বাস করে আভ্যন্তরিক মরুদেশে আর য়োরোপের যে প্রথম খাঁটি মানুষদের সঙ্গে আমরা পরিচয় করেছি তারা বাস করেছে তুষার যুগে, এমন গাছপালা পশু পাখির মধ্যে বর্তমানে যাদের মেলে সুমেরু অঞ্চলে, যেমন উত্তর ক্যানাডা ও সাইবেরিয়ায়। এরা গায়ে মোটা পশুচর্ম চাপিয়েছে, গুহায় ঘর বানিয়েছে, আর আজ অসট্রেলীয় আদিবাসীরা একটুখানি ল্যাঙট পরে, ঘাস পাতার তৈরি অস্থায়ী কুঁড়েতে কিংবা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে দিন কাটায়। কিন্তু এই ধরনের পার্থক্য সত্ত্বেও বিজ্ঞানীদের সাধারণ মত এই যে এদের জীবনযাত্রার মৌলিক ধারা, এমন কি সামাজিক রীতি নীতি ও ধর্মবিশ্বাস অন্ধকারাচ্ছন্ন দূর অতীত থেকে আজ পর্যন্ত অনেকাংশে অপরিবর্তিতই থেকে গিয়েছে।

কি করে তা সম্ভব হল? কি করে বাইরের সংখ্যাবর্ধিষ্ণু সন্ধানী মানুষের ছোঁয়া বাঁচিয়ে এরা এমন একঘরে হয়ে রইল? হয়তো হাজার

হাজার বছর আগে এদের পূর্বপুরুষরা এশিয়ার থেকে এখানে এসে ঘর বেঁধেছিল, তখনও দুই মহাদেশের মধ্যে স্থলের যোগ ছিল; যানবাহনের বহু আগেই পুরামানবের জীবনে এই ধরনের দূর অভিযানের ইঙ্গিত আমরা ইতিপূর্বেও লক্ষ করেছি। তার পর পৃথিবীর আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে মেরু পর্বতের বরফ গলে যখন জল হল, তখন সাগর গ্রাস করল ঐ সংকীর্ণ স্থলপথ, অসট্রেলিয়া হয়ে পড়ল মহাদ্বীপ, তার অধিবাসীরা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে রইল বাহির বিশ্বের থেকে। আবার অনেকে মনে করেন তারা এসেছে জলপথে, হাজার দশেক বছর আগে। যাই হক, পাথরের কুড়াল, চকমকির বর্শা-ফলক, কাঠের থালার চেয়েও সুযোগ্য হাতিয়ার ও উপকরণ যে হতে পারে এ খবর হাজার হাজার বছরেও তাদের কাছে পৌঁছাল না; সাম্প্রতিক কালে যন্ত্র-সভ্যতার বাহন হয়ে শ্বেতাঙ্গরা সে দেশে উপস্থিত হয়েছে বটে, কিন্তু তারা ঘাঁটি বেঁধেছে প্রধানত উপকূলাঞ্চলে এবং ইচ্ছা করেই আদিবাসীদের আলাদা করে রেখেছে। তাতে অন্তত একটা সুবিধা হয়েছে এই যে এরা 'সভ্য' হয়ে উঠবার আগেই পণ্ডিতরা এদের সমাজ দর্শন পরীক্ষা করবার সুযোগ পেয়েছেন।

নবপ্রস্তর কৃষ্টির প্রধান অবলম্বন কৃষি ও পশুপালন যে এরা কখনও আবিষ্কার করতে পারে নি তা হয়তো এই কারণে যে অসট্রেলিয়ার রুক্ষ অন্তর্দেশে প্রকৃতি ছিল নির্দয়, চাষের যোগ্য উদ্ভিদ, পোষার উপযুক্ত পশু এরা বড় একটা পায় নি। আজও তাই এদের দিনের অধিকাংশ কাটে অন্নচিন্তায়, যেমন অন্যত্র কেটেছে পুরাপ্রস্তর মানুষের। আজও এদের পুরুষরা দূর দূরান্তরে ঘুরে শিকার করে আনে ক্যাঙারু, এমু পাখি, কুমির ও ক্ষুদ্রতর অন্যান্য সরীসৃপ, মাছ ইত্যাদি, মেয়েরা বনে প্রান্তরে ঘোরে বুনো ফল, মূল, মিষ্টি আলু, বীজ, বাদাম, গুটি, জলপদ্ম, শামুক আর মধুর খোঁজে; শিকারীরা শুধু হাতে ফিরলেও গৃহিণীরা কিছু ঘরে আনেই তাদের শ্রান্ত দেহের ক্ষুধা মেটাতে।

কিন্তু তা বলে দেহের ক্ষুধাই একমাত্র তাগিদ নয় এদের জীবনে, তা হলে আর মানুষ কি! এদের গৃহস্থালি সরল, শরীর উলঙ্গ হলেও ভাবের জগত পরিপূর্ণ, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জটিল টোটেম-তন্ত্রে এক সূত্রে গ্রথিত সব কিছু; শিক্ষা, যৌবনাভিষেক, বিবাহ, যুদ্ধ বিগ্রহ, সবই বহুপুরাতন কড়া

আচার অনুষ্ঠানের অধীন। যৌবনের আরম্ভে সামাজিক ভাবে পূর্ণ পুরুষত্ব অর্জন করতে কিশোরদের অনেক কৃচ্ছ্র করতে হয়; ব্যবহারের রীতি নীতি, পুরাণ ইতিকথার কাহিনী ইত্যাদি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে থাকে সুন্নত অনুষ্ঠান, দাঁত ও চুল উৎপাটন, দেহ বিক্ষত করে উলকি গ্রহণ, রক্ত স্নান; এই শেষোক্ত অনুষ্ঠানে টোটেমী ধর্মপিতা নিজের শিরা কেটে বালকের মাথার উপর ধরে যেন প্রাণশক্তি দান করে তাকে।

এই সব আচার অনুষ্ঠানের জটিলতা লক্ষ করে প্রত্নবিদ গর্ডন চাইল্‌ড মন্তব্য করেছেন যে যদিও অস্ত্র-উপকরণে ও খাদ্য সংগ্রহের পদ্ধতিতে আধুনিক আদিবাসীরা পুরাপ্রস্তর কৃষ্টির থেকে বেশী দূর এগোতে পারে নি, তবু এর থেকে এমন কথা মনে করা ভুল হবে যে সেই সঙ্গে মানুষের চিন্তা ও কল্পনা-শক্তিও অচল হয়ে থেকেছে, এ কালের মননও সে কালের গণ্ডির মধ্যে সম্পূর্ণ সীমাবদ্ধ। এ যুক্তি অবশ্য যথার্থ, পুরামানব হয়তো এতখানি জটিল কাঠামো গড়ে তুলতে পারে নি, কিন্তু এই কাঠামোর দার্শনিক ভিত্তির দিকে লক্ষ রাখলে মনে হয় যে অন্তত প্রাথমিক যোগসূত্রটা সে দিন থেকেই চলে এসেছে, পরবর্তী মানুষ জট পাকিয়েছে সেই সুতোয়। অসট্রেলীয় অদিবাসীর ধর্মবিশ্বাসের গোড়ার কথাটা সরল, যা সহজেই সেদিনের দুর্বোধ্য—প্রায় বিরুদ্ধ—জগতে বিহ্বল সন্ত্রস্ত মানুষের মনে রূপ নিতে পারত। সে কথাটা এই যে এই দৃশ্যমান জগতের আড়ালে আছে এক আত্মা-লোক, সব প্রাণী সেখান থেকে আসে, আবার সেখানেই ফিরে যায়। এই অদৃশ্য জগতের বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট শক্তির হাতে মানুষ ও পশুর ভাগ্য রক্ষিত, এরাই নিয়ন্ত্রিত করে প্রকৃতির সব রকম খেলা। নতুন জন্মের ব্যবস্থা করতে এদেরই প্রসন্ন করতে হয়, এদেরই সাহায্যে প্রকৃতিকে বশ করা সম্ভব। এই তুষ্টি বা পূজার কাজে শুধু ভক্তি হলে চলবে না, পবিত্র সংকেত ও পবিত্র স্থানও দরকার এবং সবচেয়ে বেশী দরকার জটিল অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপ। এই ধরনের ক্রিয়াকলাপের প্রাধান্য শুধু বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়েই নয়, আমাদের পূজা পার্বণেও চোখে পড়ে। বেদের সংহিতা অংশে যজ্ঞের মন্ত্র, ব্রাহ্মণ অংশে সেই সংক্রান্ত ক্রিয়াকাণ্ডের প্রাধান্য—কোন্ যজ্ঞের কি আহুতি, কি পদ্ধতি, যেমন কখন কি ভাবে আগুন জ্বালতে হবে, কুশ কোথায় কি ভাবে রাখতে হবে ইত্যাদির সম্পূর্ণ নির্দেশ। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য

দেবতাদের আরাধনা হল হব্য, পিতৃগণের তর্পণকে বলা হয় কব্য—এই কব্যের অনেকটা অবৈদিক। আজকের অন্যান্য আধুনিক ধর্মেরও ব্যবহারিক দিকটা অনুষ্ঠান-ভারাক্রান্ত; এ সব ক্রিয়াকলাপের মধ্যে প্রাগৈতিহাসিক সূত্র অনুধাবন করা যায় কিনা, বা কত দূর পর্যন্ত করা যায় তা পণ্ডিতরা বলতে পারেন।

১৪। জলে জঙ্গলে : মধ্যপ্রস্তর পর্ব

ভূতত্ত্বের হিসাবে পৃথিবীর শেষ যুগ পরিবর্তন ঘটেছে প্রায় ১০,০০০ বছর আগে, যখন প্লাইস্‌টোসিন অধিযুগ (মহা তুষার যুগ) বিদায় নিল, এল হলোসিন বা 'সম্পূর্ণ সাম্প্রতিক' অধিযুগ। কিন্তু নৃতত্ত্বের হিসাবে নব-প্রস্তর যুগ যে সর্বত্র এক কালে আরম্ভ হয় নি তা আমরা এই মাত্র দেখেছি, হলোসিনের মধ্যে অল্পবিস্তর আগে পরে তার শুরু। অনেকটা মহা তুষার যুগ ও পুরাপ্রস্তর যুগের সাময়িক মাপ মোটামুটি সমান রাখবার জন্য প্রত্নবিদরা প্রায়ই আর একটি ভাগের উল্লেখ করে থাকেন, তার নাম মধ্যপ্রস্তর বা মেসোলিথিক (mesolithic)। আসলে এই ভাগ পুরা-প্রস্তর যুগেরই অংশ, এবং উত্তর য়োরোপে এর সবচেয়ে স্পষ্ট বিকাশ ও চিহ্ন দেখা যায়। এই সব চিহ্নের থেকে জানা যায় যে ইচ্ছাধীন খাদ্যোৎপাদনের গুরুতর রহস্যটি শিখতে না পারলেও এই সময়ে কয়েকটি বিশিষ্ট উদ্‌ভাবনের সাহায্যে মানুষ বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়েছে, জীবনযাত্রা আরও সহজ হয়েছে তার। ভূতত্ত্বের দিক থেকে বলা যেতে পারে যে পৃথিবীর যে ভৌগোলিক চেহারাটা আমরা আজ জানি তা এই সময়ে রূপ নিতে আরম্ভ করেছে—মাত্র ৭০০০ বছর কি তারও কম সময় আগে ইংলণ্ড ও মহাদেশীয় য়োরোপের মধ্যেই স্থলের যোগ ছিল।

চতুর্থ ও শেষ তুষার যুগের শীত যখন মৃদু হয়ে এল, বরফ সরে গিয়ে তখন য়োরোপের বন্ধ্যা প্রান্তর প্রথমে বার্চ ও উইলো এবং পরে পাইন ওক

এল্‌ম ইত্যাদির বনে আচ্ছন্ন হল। প্লাইস্‌টোসিন ও হলোসিনের অন্তর্বর্তী পার্থক্যের প্রধান চিহ্ন এই বন, তার মধ্যে মধ্যে বরফ-গলা জলে সৃষ্টি হল হ্রদ আর স্রোতস্বিনী, মানুষও গুহা গহ্বর থেকে বেরিয়ে এসে ঘর বাঁধল সাগর নদী আর হ্রদের পারে পারে। এই অস্থায়ী ঘরের উপাদানও বন আর জলের দান—গোল করে খুঁটি পুঁতে তার উপর নলখাগড়ার ছাউনি হয়তো। উত্তর য়োরোপের, বিশেষত ফিনল্যাণ্ডের অনেক পুরাকাহিনীর পটভূমি বন আর হ্রদ। গুহা ও প্রান্তরের পশুরা তখন উত্তরে পালিয়েছে, এসেছে বনের পশু—লাল হরিণ, বুনো শুয়োর ইত্যাদি। এক দিকে এরা, অন্য দিকে বুনো হাঁস ও আরও নানা রকম জলা পাখি মানুষের খাদ্য জোগাত। তা ছাড়া মাছ তো ছিলই ; মাছ ধরতে জাল ব্যবহার হত, বড়শি উন্নত হল, তিনমুখী বর্শা আবিষ্কার হল। অস্ত্রের ব্যবহার ছাড়াও ফাঁদের সাহায্যে এই সব রকম শিকার ধরায় মানুষ পারদর্শী হয়ে উঠল। নিরামিষ খাদ্যেরও বৈচিত্র্য ও পর্যাপ্তি বাড়ল গাছপালা বৃদ্ধির সঙ্গে—মধ্যপ্রস্তর যুগে য়োরোপের হাওয়া ক্রমে আজকের চেয়েও উষ্ণ হয়ে উঠেছিল, তার ফলে উদ্ভিদ জগতের অভূতপূর্ব প্রসার ঘটল। মাটি খুঁটে খুঁটে মূল, ঝোপ ঝাড় থেকে 'বেরি' জাতীয় ক্ষুদ্র ফল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এলোমেলো ঘোরাঘুরির দিন চলে গেল যখন মানুষ শিখল যে কোনও কোনও ফল, বাদাম, বন্য বীজ ইত্যাদি ঋতু অনুসারে একই জায়গায় প্রতি বছর মেলে। এই দূরদর্শিতা ও নিয়মিত সংগ্রহের ফলে অধিকতর স্থিতিশীল ও নিশ্চিন্ত হল জীবন। তখনও অবশ্য ঋতুচক্রের অনুসরণে প্রতি বছর স্থান পরিবর্তনের পালা আসত, কিন্তু বসতি-গুলিতে কিছুটা যেন গ্রামের ভাব এল এই সময়ে। সেই কোন্ অতীতে শিকারের উদ্দেশ্যে মানুষ প্রথম দল বেঁধেছিল হয়তো তিন চারটি আত্মীয় পরিবার মিলে, তার পর গোষ্ঠী গ্রাম শহর মহানগর ইত্যাদির ধাপে ধাপে ক্রমেই বৃহত্তর জটিলতর সামাজিক সমষ্টি সৃষ্টি করে চলেছে।

এই সব মধ্য প্রস্তর বসতিতে মানুষের আশেপাশে আর একটি প্রাণীর চিহ্ন আমরা সর্ব প্রথম দেখতে পাই—তার 'শ্রেষ্ঠ বন্ধু' এবং প্রথম পালিত পশু কুকুর। এ যাবৎ কত পশুরই নাম করেছি পুরামানবের সঙ্গে যাদের যোগাযোগ ঘটেছে, কিন্তু কুকুর কোথায় যেন লুকিয়ে ছিল। হয়তো তার বন্য পূর্বপুরুষ মানুষের ঘাঁটির চার পাশে গা ঢাকা দিয়ে

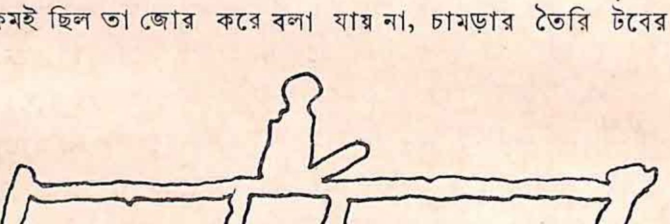
ঘোরাঘুরি করেছে, খাদ্য ও উচ্ছিষ্ট চুরি করেছে ; জঞ্জালনাশক বলে মানুষ সম্ভবত সহ্যও করেছে তার উৎপাত। কিন্তু এই সময়েই কুকুর বন্ধু, রক্ষক ও অংশীদার হয়ে দাঁড়াল। সে কালের বন্য শিকার খুঁজতে, শুয়োর হরিণ খরগোস ইত্যাদি ধরতে কুকুরের চেয়ে বড় সহায় আর কিছু হতে পারত না, তা ছাড়া তার স্নেহপ্রবণ বিশ্বস্ত স্বভাব নিশ্চয় মানুষকে মুগ্ধ করেছে ; এই সব কারণে তাকে খাবারের ভাগ দিতে সে দ্বিধা করে নি। কুকুরের দিক থেকেও সুবিধাজনক হয়েছে এই যৌথ ব্যবস্থা, কারণ প্রভুর উন্নত অস্ত্র ও বুদ্ধির সহযোগে তার পক্ষে শিকার ধরা সহজ হয়েছে আরও। পারসীক পুরাণে দেখা যায় হোশাং দেব মানুষের হয়ে কুকুরকে শিকার বিদ্যা শিখিয়ে দিয়েছে। অবশ্য এমন বন্ধুর মাংসও যে মানুষ খেয়েছে চীনের নানা নবপ্রস্তর ঘাঁটিতে তার চিহ্ন আছে।

প্রথম পালিত এই পশুর সঙ্গে আজ পর্যন্ত ঘনিষ্ঠ যোগ প্রথম স্থলযানের —তার নাম স্লেজ, তাও ঐ সময়ের আবিষ্কার। এই শকটের সাহায্যে বরফের চলাফেরার সমস্যা সমাধান করেছে মানুষ। প্রথম দিকে সে নিজেও হয়তো স্লেজ টেনেছে পায়ের নিচে স্কি লাগিয়ে। মধ্যপ্রস্তর যুগের ফিনল্যাণ্ডের জলাভূমিতে স্লেজের নিম্নাংশ পাওয়া গিয়েছে। এ রকম একটি বাহন বানাতে যে কিছুটা জটিল ও সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির দরকার তা সহজে অনুমেয়। সে যুগে অরণ্যচর মানুষের প্রধান কাঁচামাল ছিল কাঠ (বস্তুত মধ্যপ্রস্তর যুগকে কাষ্ঠ যুগও বলা চলে), তাই ছুতারের শিল্প দ্রুত গড়ে উঠেছে। কাঠ চিরতে হরিণ-শিঙের ধারালো গোঁজ পুরাপ্রস্তর যুগের শেষেই য়োরোপীয়রা কোথাও কোথাও ব্যবহার করেছে, এ যুগের কারিকররা তাতে লাগাল ঘষে ধার দেওয়া চকমকি বা অন্য পাথরের পাত, তাতে তার কার্যকারিতা বাড়ল। এ ভাবে কাটবার চিরবার খুবলাবার বিবিধ যন্ত্রশ্রেণী দেখা দিল। কুড়ালের গায়ে হাতল বসল। আর খুব ছোট ছোট চকমকির খণ্ড যোগ করে এক বিশিষ্ট নতুন অস্ত্রশ্রেণীর সৃষ্টি হল ; এই ধারালো খণ্ডগুলি সাধারণত ত্রিকোণ, কিছু চাঁদের কলা বা অন্য আকৃতিও দেখা যায় ; এগুলি দিয়ে তীর বা বর্শার মুখ বা তার পাশের কাঁটা তৈরি হত। এদের নাম মাইক্রোলিথ, আমরা বলতে পারি অণুশিলা।

য়োরোপে ধনুর্বাণের প্রথম নিঃসন্দেহ ব্যবহার দেখা যায় এই মধ্যপ্রস্তর

যুগে ; ধনুর গুণ পশুর পেশীতন্তু দিয়ে তৈরি, বাণের মুখে সাধারণত চকমকির তীক্ষ্ণ ফলা, কিন্তু কখনও বা ভোঁতা কাঠের মাথা, তার উদ্দেশ্য পাখিকে অক্ষত রেখে শুধু অচেতন করে ফেলা। কিসের থেকে ধনুর্বাণের (অথবা ইতিপূর্বে বর্শার) ধারণা মানুষের মাথায় খেলেছে তা বলা কঠিন, প্রতিভার আকস্মিক বিকাশে অনেক উদ্ভাবন ঘটে থাকে। যাই হক, বহু সহস্র বছর পর্যন্ত যুদ্ধ বিগ্রহের প্রধান নির্ভর হয়ে রইল এই অস্ত্রটি।

বনের প্রাচুর্য ও চঞ্চল সতর্ক পশুশ্রেণীর থেকে যদি ধনুর্বাণের উদ্ভব হয়ে থাকে তো জলের পর্যাপ্তির থেকে তেমনি নৌকার জন্ম। ধনুর্বাণে বুনো হাঁস ধরতে ব্যাধরা জলে বিলে ঘুরে বেড়িয়েছে যে ধরনের ডোঙাতে চড়ে তাকে বলা হয় ক্যানু (canoe)— এই বাহন ও তার বৈঠাও এই সময়ের আবিষ্কার। আজও প্রশান্ত মহাসাগরে ও অন্যান্য জায়গায় এই জাতীয় ডোঙার যথেষ্ট ব্যবহার আছে। বস্তুত, বাংলায় ডোঙা বা ডিঙি এমন কি ভেলা শব্দটি পর্যন্ত প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চল থেকেই আমদানি, আদি অসট্রেলীয়দের তথাকথিত অসট্রিক ভাষায় এগুলির উৎপত্তি ; বাঙালীর জাতিগত গঠনে এই আদি অসট্রেলীয় উপাদান আছে অনেকখানি। বৃক্ষকাণ্ডের শাঁসাংশ খুবলে ফেলে ক্যানু তৈরি হয়, সে কালে হয়তো খুবলাবার কাজে আগুন ব্যবহার হয়ে থাকতে পারে। অবশ্য মানুষের প্রথম জলযানের চেহারা যে এই রকমই ছিল তা জোর করে বলা যায় না, চামড়ার তৈরি টবের মত



৩৫নং চিত্র

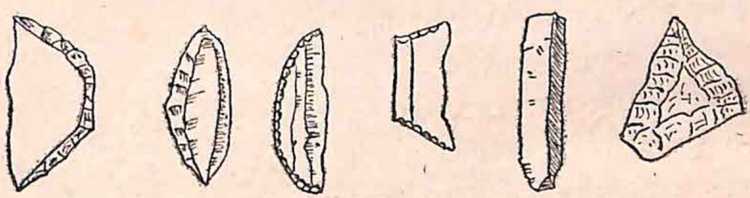
চামড়ার নৌকায় মানুষ ; পাথরের গায়ে ক্ষোদিত এই চিত্র নরওএ দেশে পাওয়া গিয়েছে।

গোল এক ভেলার ঐতিহ্য য়োরোপে বহু পুরনো। খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের শেষ দিকে হেরোডোটাস লিখে গেছেন এই ধরনের নৌকা প্রাচীন ব্যাবিলনের ঘাটেও ভিড়ত ইউফ্রেটিস নদী বেয়ে।

এ যুগের মানুষও কোথাও কোথাও পাথরের গায়ে ক্ষোদিত বা অঙ্কিত ছবি রেখে গিয়েছে, কিন্তু পূর্ববর্তী গুহাচিত্রের সঙ্গে তার কোনও তুলনা হয় না।

আজ মধ্য ক্যানাডায় এক হ্রদের ধারে বাস করে ক্যারিবু এসকিমোরা, এখনও এদের জীবনযাত্রা অনেকাংশে মধ্যপ্রস্তর। এরা চাষ জানে না, পশু পাখি আর মাছ ধরে খায়, নিরামিষের মধ্যে একমাত্র খাদ্য বেরি জাতীয় ফল। এদের হাতিয়ার ও উপকরণের প্রধান উপাদান হাড়, হরিণ-শিং ও কাঠ; মামুলি অস্ত্র বর্শা, ধনুর্বাণ, বড়শি ও মাছ ধরবার বহুমুখী বল্লম। বাহন নৌকা, একমাত্র পালিত পশু কুকুর। ক্যারিবু জাতীয় বলগা-হরিণকে ঘিরে এদের জীবনযাত্রা—শুধু মাংস নয়, সংসারের আরও অনেক কিছু যোগায় এই প্রাণীটি।

ভারতে মধ্যপ্রস্তর কাল বলে কিছু এখনও খুব স্পষ্ট না হলেও অণুশিলাকে কেন্দ্র করে পুরাপ্রস্তর যুগের শেষ পর্যায়ের এক অংশ ঐ রকম একটা বিশিষ্ট রূপ নিয়ে থাকতে পারে। এ দেশে অণুশিলার প্রধান ক্ষেত্র হল বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণে, অর্থাৎ মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে। অনেক জায়গায়, যেমন নর্মদার তীরে কোথাও কোথাও, অতি সহজে এদের সংগ্রহ করে পকেট ভরে ফেলা চলে; এগুলি প্রায়ই ক্যালসিদনি, আগেট বা অন্য কোনও আধা-দামী



৩৬নং চিত্র
ভারতীয় অণুশিলা।

জহরের তৈরি, পাথরগুলি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কুড়িয়ে নিতে ইচ্ছা করে। অধিকাংশই সম্ভবত সে কালের মিস্ত্রিদের বিবর্জিত মাল, যেগুলি কাজে লাগিয়েছে তারা তা নিশ্চয় কাঠ বা হাড়ের সঙ্গে জুড়ে তীর বা ঐ রকম যৌগিক অস্ত্র বানিয়েছিল কিছু। $\frac{৩}{৪}$ থেকে ১$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি লম্বা ছোট ছোট

১২

চন্দ্রকলা ভারতে, এবং আফ্রিকায়, খুবই সাধারণ। ভারতীয় অণুশিলা আফ্রিকা ও য়োরোপের মত উৎকৃষ্ট নয়, যদিও কোথাও কোথাও এর ব্যতিক্রম আছে; এর একটা কারণ এই যে বিদেশীদের মত খাঁটি চকমকি ও অবসিডিয়ান ছিল না ভারতীয় কর্মীর হাতে।

পশ্চিমের তুলনায় ভারতীয় অণুশিলা অনেক সাম্প্রতিক (এ দেশে পুরাপ্রস্তর কৃষ্টি তুষার যুগের পরেও বহু কাল টিকে ছিল)। এদের তারিখ নির্ণয় সম্বন্ধে এখনও অনেক কাজ বাকি, এ যাবৎ তার চেষ্টা হয়েছে আনুষঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের (মৃৎপাত্র, কৃষি ইত্যাদি) সঙ্গে তুলনা করে। প্রায় সর্বত্রই অণুশিলা প্রাথমিক মৃৎপাত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দেখা যায়, এগুলি সম্ভবত খৃষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রকের বেশী প্রাচীন নয়। শুধু দু জায়গায় পোড়া মাটির চিহ্ন মেলে নি—মাদ্রাজের তিনেভেলি জেলায় এক ঘাঁটিতে (মনে হয় এখানে বাস করত ব্যাধ বা জেলের দল যারা তখনও চাষ বাস শেখে নি) এবং কাথিয়াবাড়ে রংপুর নামক জায়গায়, যেখানে অণুশিলা ব্যবহার হয়েছে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রকে।

অণুশিলার ঘাঁটি হিসাবে গুজরাটের লংঘনাজ প্রসিদ্ধ; এখানে যে শুধু কয়েকটি মানুষের কঙ্কাল (সম্ভবত কবরের) পাওয়া গিয়েছে তাই নয়, নানা প্রাণীর অবশিষ্টও মিলেছে—যথা গরু, গণ্ডার, নীলগাই ও অন্যান্য হরিণ, শুয়োর, ঘোড়া, কুকুর কিংবা নেকড়ে, কচ্ছপ, মাছ—কিন্তু এখন পর্যন্ত পশুপালনের কোনও চিহ্ন মেলে নি। কৃষিরও কোনও স্পষ্ট নিদর্শন নেই—শস্য বা মসলা গুঁড়ো করবার জন্য চুনাপাথরের পাটা ব্যবহার হয়েছে, কিন্তু এই শস্য বুনো ঘাস থেকে সংগৃহীত হয়ে থাকতে পারে। মৃৎপাত্রের চিহ্নও খুব প্রাথমিক। একশিঙা গণ্ডারের ঘাড়ের হাড় একটি পাওয়া গিয়েছে, তাতে অন্তত আটটি গর্ত দেখা যায়, মনে হয় যেন অণুশিলা বানাবার জন্য নেহাই হিসাবে ব্যবহার হয়েছে তা। ১৮ মাইল দূরে সবরমতী নদী, সম্ভবত সেখান থেকে এরা সংগ্রহ করেছে পাথর (স্ফটিক-শিলা, জ্যাস্‌পার, চার্ট), ছোট ছোট পাত বানিয়ে কাঠ বা হাড়ের সঙ্গে জুড়ে তৈরি করেছে অস্ত্র; প্রধানত শিকারের উপরই জীবনধারণ, কিন্তু তার সঙ্গে বুনো শস্য ও উদ্ভিজ্জও স্থান পেয়েছে কিছুটা। মৃতদেহকে এরা হাত পা গুটিয়ে উত্তর দক্ষিণ বরাবর কবর দিত।

এ দেশে অণুশিলা এত সাম্প্রতিক হলেও যারা তা ব্যবহার করেছে অন্তত প্রথম দিকে তারা সম্ভবত য়োরোপীয়দের মতই প্রধানত মৃগয়াজীবী ছিল, যদিও উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে কৃষিবিদ্যা আয়ত্ত হয়ে গিয়েছে বহু শতাব্দী আগে। কোথাও কোথাও অণুশিলার ধারা অন্তত আদি ঐতিহাসিক কাল পর্যন্ত লক্ষিত হয়, সে সময়ে অবশ্য কৃষি জানা ছিল। অণুশিলার আরম্ভের দিকে স্থানীয় পুরাপ্রস্তর কৃষ্টির সঙ্গে তার সম্পর্ক এখন অনিশ্চিত, এরই এক পরিণত ও উন্নত অভিব্যক্তি হিসাবে ভারতেও অবশ্য অণুশিলার উদ্ভব হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু যেমন হাত কুড়াল সম্বন্ধে দেখা গিয়েছে আরও প্রাচীন কালে তেমনি অণুশিলাও বিভিন্ন দেশের মধ্যে কৃষ্টিগত সাদৃশ্য ও ভাবের আমদানির নির্দেশ দেয়। য়োরোপীয় অণুশিলা শিল্পের সঙ্গে উত্তর আফ্রিকার যোগ আছে (ক্যাপ্‌সীয় কৃষ্টি) এবং আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে কিনিয়াতেও এর অস্তিত্ব ছিল। এ দিকে গুজরাটে প্রাপ্ত কঙ্কালের মধ্যে নিগ্রো বৈশিষ্ট্য কেউ কেউ লক্ষ করেছেন। এদের এই নিগ্রো রক্তের দাবি যথার্থ নাও হতে পারে, কিন্তু উত্তর আফ্রিকার থেকে যে পুব দিকে মানুষের অভিযান ঘটেছিল অন্যত্র তার সাক্ষ্য আছে এবং এর সঙ্গে ভারতীয় অণুশিলা শিল্পের যোগ থাকা আশ্চর্য নয়; এই শিল্পের উৎপত্তি নতুন আগন্তুকদের থেকে ঘটেছে বলেই মনে হয় এবং সম্ভবত তারা পশ্চিমের লোক। পূর্ব এলাকায় অণুশিলা বিরল—যেমন উত্তর-পূর্ব ভারতে (বাংলা আসাম উড়িষ্যা) তেমন সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। এই শিল্পের বিস্তারে এক দিকে উত্তর আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়া, অন্য দিকে ভারতের মধ্যে আরব হয়তো যোগসূত্র স্থাপন করেছিল এমন ইঙ্গিত নাকি পাওয়া গিয়েছে।

ইংলণ্ডের ইয়র্কশায়ার প্রদেশে এক মধ্যপ্রস্তর ঘাঁটি আবিষ্কৃত হয়েছে মাত্র ১৯৪৯-৫১ সালে। এখানে এক হ্রদের ধারে জলাভূমির উপর প্রায় ১০,০০০ বছর আগের মানুষ এক প্রকাণ্ড মঞ্চ বানিয়েছিল কয়েক স্তর গাছের ডাল পেতে তার উপর কাদা ও পাথর চাপিয়ে। জায়গাটিকে অস্ত্র ও উপকরণ তৈরির এক কারখানা বলা চলে, তার তিন দিকে জল থাকায় কারিকরদের কাজেরও সুবিধা হত। আধুনিক কালের যেমন রীতি তেমনি তারাও সম্ভবত কাজ ভাগ করে নিয়েছিল; কেউ হয়তো বার্চ

গাছের ছাল খুলে এনেছে, আর এক জন তা আগুনে সেঁকে তার থেকে আলকাতরা বা পিচ্ বার করেছে, তৃতীয় ব্যক্তি তা বর্শার মুখে মাখিয়ে তার সাহায্যে চকমকির সূক্ষ্ম কাঁটা জুড়েছে—এই অণুশিলা অবশ্য তৈরি হয়েছে অন্য এক নিপুণ প্রস্তর-কর্মীর হাতে। কেউ আবার বর্শার মুখ বানিয়েছে হরিণ-শিঙের থেকে, সেই শিং আগে নরম করে নেওয়া হয়েছে হ্রদের জলে ডুবিয়ে রেখে। শেওলা কুড়িয়ে এনেছে হয়তো কোনও মেয়ে, তার আগুনে শিং সেঁকার কাজটা ভাল হয়। এই সমবায় শিল্পকেন্দ্রটি গড়ে উঠতে নিশ্চয় কয়েকটি পরিবারের যুগ্ম প্রচেষ্টার দরকার হয়েছিল—এরা সমষ্টির স্বার্থে কাজ করেছে, শ্রম ও পুরস্কার দুইই ভাগ করে নিয়েছে।

দলীয় সহযোগিতার এই উন্নত দৃষ্টান্তের পাশাপাশি অন্য ধরনের আর একটি মধ্যপ্রস্তর সম্প্রদায়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। এরা বাস করেছে ডেনমার্কে, প্রায় ৬৫০০ বছর আগে। এদের পরিত্যক্ত জঞ্জালের মধ্যে পাওয়া গিয়েছে চিরে চেঁছে পরিষ্কার করা মানুষের হাড়, মানুষের খুলির খণ্ড—তার গায়ে ছুরির দাগ ; এ সবের থেকে বোঝা যায় যে নিজেদের মজ্জা ও মগজ খেতে এদের আপত্তি ছিল না, যদিও প্রধান খাদ্য যে ছিল ঝিনুক এবং ঐ জাতীয় সামুদ্র খোলক প্রাণী তার প্রমাণ মেলে পরিত্যক্ত খোলের প্রকাণ্ড স্তূপে। হয়তো এই একঘেয়ে খাবারে ক্রমে অরুচি ধরেছিল এবং কোনও কারণে বনের পশুও বিরল হয়ে এসেছিল, তাই স্বজাতি-ভক্ষণের কথা ভাবতে হয়েছে। শুধু ঝিনুকের আহারে দেহের সম্পূর্ণ পুষ্টি সম্ভব নয়, তজ্জনিত রোগ মাংসাহারে যে সারে তা হয়তো এক দিন এরা আবিষ্কার করেছিল—যদিও অন্যান্য সাক্ষ্য থেকে মনে হয় না যে নিতান্ত প্রয়োজনের তাড়নায় এবং অনেকটা 'অহিংস' ভাবে এরা মানুষ মেরেছে।

নরমুণ্ডের যে ধর্মসংক্রান্ত বা আচারগত সাংকেতিক মূল্য থাকতে পারে তার ইঙ্গিত মেলে আর একটি য়োরোপীয় সম্প্রদায়ে—এদের ঘাঁটি ছিল আরও দক্ষিণে, আরও কিছু কাল আগে ; ব্যাভেরিয়ার এক গুহার মেঝেতে এরা জড়ো করে রেখে গিয়েছে নরকপালের সংগ্রহ, মুণ্ডগুলির উপর এরা গৈরিকের রং ছিটিয়েছিল, জায়গাটাকে ঘিরেছিল বিচিত্র অলংকারে। আজকের কাপালিক জাতিরা (head-hunters) খুলি সংগ্রহ করে দেবতাকে

উৎসর্গ করতে অথবা নিজেদের সামরিক মর্যাদা বাড়াতে। সে কালে এর পিছনে যে অনুপ্রেরণাই থেকে থাক, এটা বোঝা যায় যে মধ্যপ্রস্তর যুগে মানুষ এক দিকে যেমন সামাজিক সহযোগিতার পথে কয়েক ধাপ উঠেছে, অন্য দিকে তেমনি দলগত সংঘর্ষ ও রক্তপাতও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তার সমাজে, যুদ্ধের কালো মেঘ প্রথম দেখা দিয়েছে আকাশে। সে দিন থেকে আজ পর্যন্ত মানুষ যুগপৎ এই দুই পথে চলেছে, দুইয়ের মধ্যে পার্থক্যটা বিস্ফারিত হয়েছে মাত্র—সে দিনের প্রায় গ্রামতুল্য বসতির জায়গায় আজ মহানগর, সে দিনের দলীয় হানার পরিবর্তে আজ মহাসমর !

*　　　*　　　*

মানুষের ইতিহাসে প্রথম বৃহৎ বিপ্লবের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি এ বার আমরা। বিংশ শতাব্দীর সঙ্গে তুলনা করলে পুরাপ্রস্তর যুগের এই প্রায় দশ লক্ষ বছরে মানুষ বেশী দূর অগ্রসর হতে পারে নি। এক মাত্র আগুনের আবিষ্কারই অনেকটা সহজ করেছে তার জীবন—দূর অতীতের অন্ধকার গহ্বরে এই একটি জলন্ত নিশানার লালাভ কম্প্র আলোই আমরা দেখতে পাই। জন্মাবধি প্রাণীমাত্রেরই প্রধান চিন্তা অন্নচিন্তা, খাদ্য সংগ্রহের নিরন্তর সংগ্রামে এই দীর্ঘ কাল মানুষ বিশ্রাম পায় নি মোটেই, নিজের বল কৌশল এবং অস্ত্রের সাহায্যে প্রকৃতির থেকে যেটুকু আদায় করে নিতে পেরেছে তাতে কখনও খুব নিশ্চিন্ত হতে পারে নি সে ; মাত্র কয়েক হাজার বছর আগে পর্যন্ত যে মানুষের চিত্রটি মনে জাগে সে নিয়ত সন্ধানী যাযাবর, নিয়ত যুদ্ধরত ভাগ্যের সঙ্গে—এই যুদ্ধে অযোগ্যরা ঝরে পড়ল একে একে। আহারের পরেই আশ্রয়, সে ক্ষেত্রে শেষের দিকে সে আর প্রাকৃতিক গুহা গহ্বরের উপর নির্ভর করে থাকে নি, কিন্তু মাটির নিচে বা উপরে অস্থায়ী আস্তানা বা আখড়া যা বানিয়েছে তাকে ঠিক ঘর বলা চলে না। তবু কিছুটা সংহতি এসেছে তার সমাজে, পারিবারিক গণ্ডির বাইরে সহযোগিতা যে সহজ করতে পারে জীবনযাত্রা তা বুঝতে আরম্ভ করেছে সে। তার ভাবের জগত তার ধ্যান ধারণাও স্বভাবতই গড়ে উঠেছে নিরন্তর জীবনসংগ্রামের প্রভাবে, প্রতিকূল প্রকৃতির আওতায় নিজের ঠাঁই বজায় রাখতে তার মনে মূর্তি পেয়েছে ভাল মন্দ নানা অদৃশ্য অলৌকিক শক্তি—তার থেকে জাদু ও আচার অনুষ্ঠান। কিন্তু আহার অন্বেষণ ও জীবন ধারণের অব্যবহিত সমস্যা

বহু কাল তার মন জুড়ে থাকলেও কোনও মতে বেঁচে থাকতেই যে মানুষ পৃথিবীতে আসে নি তার ইঙ্গিতও মাঝে মাঝে দেখা যায়, বিশেষ করে শেষের দিকে খাঁটি মানুষের স্পষ্ট আবির্ভাবের সঙ্গে—যেমন গুহা অনুসন্ধানের দুঃসাহসী কাজে, অথবা প্রায় অজ্ঞাতসারে মহান চিত্র সৃষ্টিতে ; এ সময়ে তার বাঁচার আনন্দ লীলায়িত হয়েছে দেহসজ্জায়, নিছক প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তুর আকাঙ্ক্ষায়, অথবা প্রয়োজনের বস্তুতে সৌন্দর্যের ছোঁয়ায়। এই সন্ধিক্ষণে মানুষকে দেখলে মনে হয় যেন অনেক সম্ভাবনা আছে তার মধ্যে, শুধু সুযোগের অপেক্ষা। সেই সুযোগ এ বার দেখতে দেখতে এসে গেল।

তৃতীয় খণ্ড

•

ঘরের মানুষ

নবপ্রস্তর যুগ

"Will they not produce corn, and wine, and clothes, and shoes, and build houses for themselves ?...They will feed on barley and wheat, baking the wheat and kneading the flour, making noble puddings and loaves....And they and their children will feast, drinking the wine which they have made, wearing garlands on their heads, and having the praises of the gods on their lips."

Plato

১৫। আবিষ্কার ও নিষ্কৃতি

মানুষের (এবং অন্যান্য প্রাণীরও) বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির সঙ্গে খাদ্যের পর্যাপ্তি ও প্রাপ্তি সম্ভাবনার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক চির দিন লক্ষিত হয়েছে। কৃষি আবিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত এ সমস্যা কোনও দিন স্থায়ী ভাবে মেটে নি, 'দিন আনি দিন খাই' করে ক্রমাগত অন্নচিন্তায় বহু লক্ষ বছর মানুষের দিন কেটেছে। এর মধ্যে প্রকৃতি যখন সদয় হয়েছে তখন অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত মনে সে অন্য দিকে দৃষ্টি দিয়েছে; জলে অপর্যাপ্ত মাছ, স্থলে সহজলভ্য শিকার পেয়ে য়োরোপে মাদলেনীয়রা বসন ভূষণ প্রসাধনে দেহ সাজিয়েছে, নানা ধারায় নানা উপাদানে শিল্প সৃষ্টি করেছে। কিন্তু প্রকৃতি চির দিনই খেয়ালী, ভাগ্যে পাওয়া ভোক্ষ্যও অফুরন্ত নয়, জাদুর ইন্দ্রজালে শিকার বাড়ানো সম্ভব হল না, তাই একদা এদেরও বিদায় নিতে হল। মানুষ যদি খাদ্য-সংগ্রাহক থেকে খাদ্য-উৎপাদক হতে না পারত তা হলে আজও পৃথিবীতে বড় জোর বিরল প্রাণীর পর্যায়ে বেঁচে থাকত। জগতের বিভিন্ন 'সংগ্রাহক' আদিবাসীদের সংখ্যার দিকে তাকালেই তা বোঝা যায়।

ইতিহাসের অন্তহীন পথে মানুষের মিছিল নবপ্রস্তর যুগের চৌকাঠ পার হল তখন যখন খাদ্য-সংগ্রহের উপর পূর্ণ নির্ভরতা ত্যাগ করে সে উৎপাদন শুরু করলে। আবহমান কাল যে ছিল ভাগ্যের হাতের পুতুল সে এ বার হঠাৎ প্রকৃতির উপর অনেকখানি কর্তৃত্ব লাভ করলে। কিন্তু শুধু অন্নসমস্যার সমাধানে নয়, শুধু উদ্ভিদ ও পশুর বশীকরণে নয়, আরও নানা ক্ষেত্রে বহুবিধ

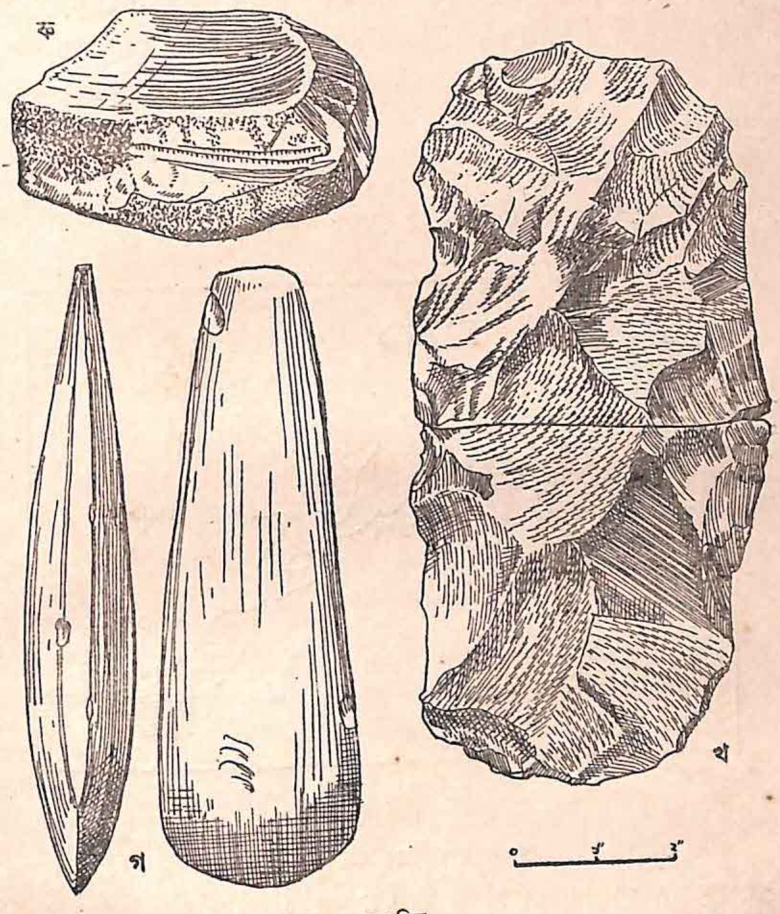
মৌলিক আবিষ্কারে এই যুগটি সমৃদ্ধ ; সহস্র সহস্র বছরের অন্ধকার পটভূমির সামনে মাত্র হাজার চার পাঁচ বছরের মধ্যে মানুষ একের পর এক জ্বেলেছে উজ্জ্বল আবিষ্কারের আলো : কৃষি, পশুপালন, মৃৎপাত্র, বস্ত্র, ধাতু-শিল্প, চক্র, চক্রযুক্ত যান, যান ও বাহনে পশুর ব্যবহার, নৌকার পাল, সেচ, সৌর বর্ষপঞ্জী বা ক্যালেনডার। এগুলির অনেক কিছুই এখনও বর্তমান সভ্যতার ভিত্তি ; বস্তুত বলা চলে যে নবপ্রস্তর যুগের তুলনায় পরবর্তী বহু শতাব্দীর দান নগণ্য—খৃষ্টপূর্ব ঐতিহাসিক যুগে এমন কি আধুনিক সভ্য যুগেও গ্যালিলিওর কাল (ষোড়শ শতক) কি তারও পরে শিল্প-বিপ্লব পর্যন্ত এত দ্রুত বা গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার আর দেখা যায় নি।

নবপ্রস্তর কথাটির তাৎপর্য কি ? নামটি এসেছে এক নতুন ধরনের পাথুরে কুড়াল থেকে, নতুনত্ব শুধু ধার দেওয়ার পদ্ধতিতে। মানুষের তৈরি একেবারে প্রথম উপকরণ সম্ভবত কুড়াল জাতীয় বস্তু, পুরাপ্রস্তর যুগে অবশ্য তার গায়ে হাতল ছিল না এবং তার মুখ তৈরি হত পাথরের গায়ে ঘা মেরে পাত খসিয়ে। মধ্যপ্রস্তর যুগে কুড়ালের সঙ্গে হাতল যুক্ত হল, আর নবপ্রস্তর যুগে চলতি হল ঘষে ধার দেওয়ার কৌশল। সূক্ষ্ম-দানাযুক্ত পাথরের পাত বা নুড়ির এক দিক ঘষে তীক্ষ্ণ করে তার সঙ্গে কাঠের লাঠি বা হরিণের শিং জুড়ে তৈরি হত কুড়াল এবং কুড়ালি বা বাস, ধার দেওয়ার পদ্ধতিই এদের বিশেষত্ব। প্রথমে পাত খসিয়ে রুক্ষ মাথাটি বানিয়ে আর একটি ভিজে পাথরের গায়ে ঘষে পালিশ ও ধার আনা হত। এর ফলে কুড়ালের কার্যকারিতা অনেক বাড়ল, কয়েক ঘা'তেই তা আর ভোঁতা হয়ে যায় না, সহজে চল্টা খসে না—কঠিন সহনশীল যন্ত্র তা এখন। গাছ কাটতে, কেটে কাঠের খণ্ডে বিভিন্ন রূপ দিতে এই কুড়াল ও কুড়ালির মত সহায় ছিল বলেই পরে লাঙল, চাকা, তক্তার নৌকা বা বাড়ি বানানো সম্ভব হয়েছে।

ডেনমার্কে সে কালের কুড়াল নিয়ে এ কালে এক পরীক্ষা হয়েছে ; এক শো'রও বেশী বার্চ গাছ কাটা হয়েছে একটি মাত্র যন্ত্র দিয়ে যার গায়ে গত ৪০০০ বছর ধার পড়ে নি। বন পরিষ্কার করতে এই সব হাতিয়ার এত দরকার হয়ে পড়েছিল সে কালে যে তা নিয়ে কোথাও কোথাও বেশ একটা শিল্প ও বাণিজ্য গড়ে উঠেছিল ; য়োরোপের নানা জায়গায় ও মিশরে খনির থেকে চকমকি তোলা হত। কর্মকার ও বণিক বিভিন্ন সম্প্রদায়ে ভাগ হয়ে

গিয়েছিল। কোথাকার পাথর কোথায় পাওয়া গিয়েছে তা দেখে সে দিনের বাণিজ্যপথ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা গিয়েছে।

ঘষা কুড়াল যে সোজাসুজি পুরাকালের পাত-খসানো পাথর বা চকমকির থেকেই উদ্ভূত তা মনে হয় না, কিন্তু তা বলে একে সম্পূর্ণ নবপ্রস্তর যুগের



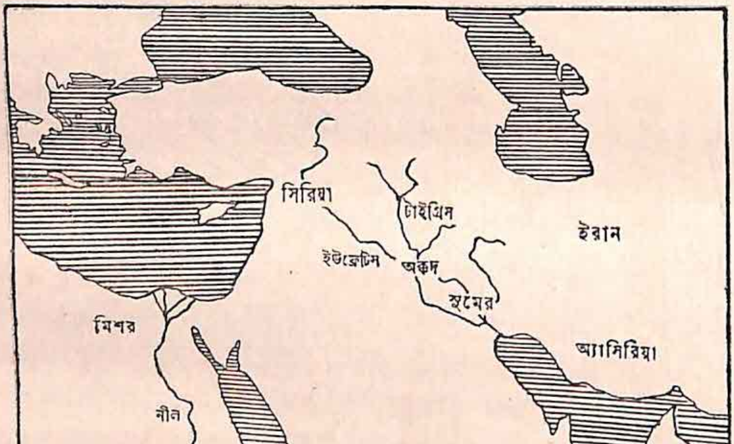
৩৭নং চিত্র

ক, কুড়ালের মাথা পালিশ করার পাথর ; খ, কুড়াল বানাবার উদ্দেশ্যে পাত খসাতে গিয়ে এই পাথরটি ভেঙে গিয়েছে ; গ, পালিশ করা কুড়ালের মাথা।

নিজস্ব বলেও দাবি করা চলে না। উত্তর য়োরোপের বনে মধ্যপ্রস্তর মানুষ যে পশুপালন বা কৃষির আগেই কাঠ কাটতে শিঙের গায়ে ঘষা পাথরের ফলা

ব্যবহার করছে তা আগে বলেছি, এমন কি অসট্রেলীয় আদিবাসীদের পর্যন্ত ছিল ঘষা হাত-কুড়াল। পক্ষান্তরে প্যালেসটাইনের নাটুফীয় (Natufian) সম্প্রদায়ের কুড়াল ছিল না যদিও তারা কাস্তে রেখে গিয়েছে, সুতরাং নব-প্রস্তর মানুষ। তবু এই যন্ত্রটির সম্মানেই এই যুগের নামকরণ হয়েছে এবং সম্পূর্ণ যথার্থ না হলেও নামটি টিকে গিয়েছে। সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য অনুসারে নাম দিতে গেলে আখ্যাটি হওয়া উচিত কৃষি ও পশুপালনের যুগ, কিন্তু তার পরেও বোধ হয় মৃৎপাত্রযুগ বা বস্ত্রযুগ বেশী উপযুক্ত নবপ্রস্তর নামটির তুলনায়।

মধ্যপ্রাচ্যে অর্থাৎ পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার সঙ্গম স্থলে একাধারে নবপ্রস্তর ও ঐতিহাসিক যুগের শুরু। প্রকৃত ইতিহাসের সূচন



৩৮নং চিত্র

মধ্যপ্রাচ্য, নবপ্রস্তর বিপ্লবের জন্মক্ষেত্র।

করেছে লিপির আবিষ্কার ও লিখিত পাঠের ব্যবহার। ৩০০০ বিসির কাছাকাছি, হয়তো অল্প আগে পরে, সুমের (ইরাক) ও মিশরে লেখার আরম্ভ, ক্রমে তার সাহায্যে রাজকুলের বংশাবলী তৈরি হয়—সেইখানো যথার্থ অর্থাৎ লিখিত ইতিহাসের গোড়াপত্তন। অবশ্য এই সব দলিলের সব কিছুই বিশ্বাসযোগ্য নয়, যেমন সুমেরীরা ২০০০ বিসির আগে কোনও এক

সময়ে রাজ-তালিকা বানাতে আরম্ভ করে বিস্মৃতির অন্ধকারে এত দূর পিছিয়ে গিয়েছে যে প্রথম দিকের আট রাজার যুক্ত রাজত্বকাল দাঁড়িয়েছে ২,৪১,২০০ বছর। এ যুগে এক ভারতীয় লেখক মেগাস্থিনিসের এক মন্তব্যের উপর রং চড়িয়ে এক রাজ-তালিকা বানিয়েছেন তাতে নাকি প্রমাণ হয় আর্যরা এ দেশে এসেছে ৬৭৭৭ বিসিতে। অতিশয়োক্তি মানুষের মজ্জাগত প্রবৃত্তি, বিশেষত মাতৃভূমির ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে—যেমন এ কালে তেমন সে কালে। কিন্তু প্রায় ২৮০০ বিসি থেকে সুমেরের মোটামুটি সুসংলগ্ন ইতিহাস মেলে। তেমনি মিশরের ইতিহাসে প্রথম রাজকুল ধরা হয় ৩২০০ বিসিতে মেনেস রাজার আধিপত্য কাল থেকে।

এই প্রসঙ্গে লিপির পাঠোদ্ধারের প্রশ্নও ওঠে। ভারতেও সিন্ধুনদের উপত্যকায় হরপ্পা-মহেনজোদারোতে খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রকে লিপির ব্যবহার আরম্ভ হয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত তা পড়া সম্ভব হয় নি। এই লিপি ব্যবহার হয়েছে প্রায় ১৫০০ বিসি পর্যন্ত, তার পর আর্যরা আসাতে ঐ সভ্যতা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, আর্যরা লেখার পক্ষপাতী ছিল না, বেদ লিখলে নরকে যেতে হত ('বেদানাং লেখকাশ্চৈব তে বৈ নিরয়গামিনঃ'), তাই আর্য ধর্ম ও দর্শনের প্রকাণ্ড বাক্যভার শ্রুতিরূপে মুখ পরম্পরায় চলে এসেছে শত শত বছর ধরে, বস্তুত খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের মাঝামাঝি অশোকের শিলালিপির আগে ভারতে আর লিখিত পাঠ দেখা যায় না। সুতরাং সে দিক থেকে সিন্ধু-সভ্যতা ও আর্যসভ্যতা প্রাগৈতিহাসিক, যদিও সে কালের লোক নিরক্ষর বা অসংস্কৃত ছিল না কোনও মতেই। বলা বাহুল্য ইতিহাস-প্রাগিতিহাসের সন্ধিরেখাটি কোথাও অনড় নয়, নতুন গবেষণার সঙ্গে ক্রমে পিছিয়ে যেতে পারে তা। এবং নবপ্রস্তর যুগের আধিপত্য দেশ হিসাবে অনেক জায়গায় অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ হলেও সারা পৃথিবীর পটে তা অনেক বেশী বিস্তৃত—গর্ডন চাইল্ড এক জায়গায় লিখেছেন ৬০০০ বিসি থেকে ১৮০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত, যদিও এখনও কোনও সম্প্রদায় প্রায় সেই যুগেই বাস করছে বলা চলে। আদি পুরাবৃত্তের বিচারে স্থান কাল ও অবস্থা ভেদে তার এই নানাবিধ আপেক্ষিকতা সর্বদা মনে রাখা দরকার।

নবপ্রস্তর যুগকে আমরা দুই ভাগে আলোচনা করব—দ্বিতীয় ভাগের আরম্ভ ধাতুর ব্যাপক ব্যবহার থেকে।

আজ খাদ্যের জন্য মানুষ যত রকম শস্য বা বৃক্ষ রোপন করে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রত্যেকটি নবপ্রস্তর যুগের বর্বররা আবিষ্কার করেছে, কিন্তু মানুষের খেতে একেবারে প্রথম শস্য গম আর যব। (সব দেশে অবশ্য তা নয়, বিভিন্ন কিংবদন্তীতেই তার ইঙ্গিত মেলে—মিশরী পুরাকাহিনীতে যদি দেখা যায় যবের সমাদর তো মধ্য আমেরিকায় মকাইর আধিপত্য।) গম ও যব দুইই পার্বত্য তৃণ থেকে উদ্ভূত, এ তৃণ মধ্যপ্রাচ্যের দেশে দেশে এখনও গজায়, মিশর থেকে ইরান পর্যন্ত অঞ্চলে এদের স্বাভাবিক ঘর, এবং অল্প বৃষ্টিতেই বাড়তে পারে এমন তাদের স্বভাব। কেউ কেউ বলেন যে পশ্চিম এশিয়ায় যে কৃষির জন্ম তার কারণ ঐ সময়ে সেখানে জলবায়ু শুষ্ক হয়ে উঠে খাদ্যসংকট বাড়িয়ে তুলেছিল। উৎকৃষ্ট গাছের বীজ সংগ্রহ ও ব্যবহার এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে মিশ্র-প্রজননের ফলে বন্য শস্য ক্রমে গার্হস্থ্য রূপ ধারণ করল, তার দানার আকৃতি ও পুষ্টিকরতা বাড়ল। এই সাবেক শস্য দুটির কতগুলি বিশেষ গুণ আছে: এরা জমিতে বেশী আয় দেয়, এদের সহজে জমা করে রাখা চলে, এদের তৈরি খাদ্য অতি পুষ্টিকর; অবশ্য জমি তৈরি থেকে ফসল ঘরে আনা পর্যন্ত কৃষকের ও পরিবারবর্গের পরিশ্রম অনেক, কিন্তু তা সাংবৎসরিক নয়, মাঝে মাঝে যথেষ্ট ছুটি, তখন তারা অন্য দিকে মন দিতে পেরেছে; সেই তুলনায় ধানচাষীর বিশ্রাম অনেক কম। যব হয়তো প্রথমে আগাছা রূপে দেখা দিয়েছিল একেবারে প্রাথমিক গমের খেতে। এ সব শস্য ছাড়াও বরবটি, মটর, মুশুর ও অন্যান্য ডাল নানা জায়গায় ফলানো হয়েছে নবপ্রস্তর কালে। এদের মধ্যে প্রোটিন বেশী, কারও কারও দানা বড়, কোনওটা বা সহজে জমিয়ে রাখা সহজ, এই সব সুবিধা নিশ্চয় তখনই চোখে পড়েছে। নানা রকম ফল মূল ছাড়াও তিসির চাষ হয়েছে; তার তেল কাজে লেগেছে খাদ্যে ও আলো জ্বালতে, আঁশ থেকে কাপড় তৈরি হয়েছে।

ঠিক কোথায় কোন্ দেশে যে কৃষির জন্ম, অথবা অল্প বিস্তর একই সময়ে বিভিন্ন জায়গায় কিনা, এ প্রশ্নের পূর্ণ নিষ্পত্তি এখনও হয় নি। এখন যে অঞ্চলে বুনো যব ও গম দেখা যায় আবিষ্কারটি সেখানেই ঘটে থাকা সম্ভব। কিন্তু সে কালেও যে এ সব দেশেই এরা জন্মাত বা অন্যত্র জন্মাত না সে সম্বন্ধে

সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। যাই হক, আপাতত মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় মধ্যবর্তী দেশ ইরাকের দাবি বোধ হয় সবচেয়ে প্রবল। ইরাকের বুক চিরে মোটামুটি উত্তর দক্ষিণে দুটি নদী বয়ে গিয়েছে, নাম টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস, তাদের উপত্যকায় পলির প্রান্তর। ও দেশের সব প্রাগৈতিহাসিক ঘাঁটি নদী জোড়ার মধ্যবর্তী উর্বর ফালিটুকুতে স্থাপিত হয়েছিল, বহু পুরা কাল থেকেই ঐ অঞ্চলের নাম মেসোপটেমিয়া (অর্থাৎ দুই নদীর অন্তর্বর্তী ভূমি), প্রাবাদিক ইডেন কাননও ঐ খানেই অবস্থিত। দেশটিকে বোঝাতে আমরা কিন্তু সংক্ষিপ্ত ও আধুনিক নামটিই ব্যবহার করব। ইরাকের পশ্চিমাঞ্চলে মরুভূমি, দক্ষিণ-পূর্বে পারস্য উপকূল এলাকা অত্যন্ত উষ্ণ, কিন্তু উত্তরে পাহাড়—এই পার্বত্য অঞ্চলই কৃষির জন্মস্থান বলে আজ অনেকের বিশ্বাস, পরে কৃষকরা নেমে এসেছিল পলি-উর্বর নদীকূলে। সে সময়ে এখানে জলবায়ু আজকের চেয়ে আর্দ্র ছিল সম্ভবত, প্রকৃতি-কন্যার শ্যামল আঁচলে তখনও মানুষের হাত পড়ে নি, তার রূপ ছিল অন্য রকম। পাহাড়ের গায়ে ঢেউ-খেলানো উর্বর প্রান্তরে মাঝে মাঝে বুনো শস্যের মাঠ কাঁচা সবুজ আর সোনালি নক্শা বুনেছে, এ দিকে ও দিকে দুটি চারটি মাত্র গাছ—জঙ্গল নেই যে চাষের জন্য কেটে পরিষ্কার করতে হবে। শুধু গম আর যবেরই স্বাভাবিক ক্ষেত্র নয় জায়গাটা, নবপ্রস্তর বিপ্লবে যে সব পশুদের প্রধান অংশ তাদেরও বাস সেখানে। তা ছাড়া প্রত্নতত্ত্বের সাক্ষ্যও প্রবল। পক্ষান্তরে প্যালেস-টাইনবাসী নাটুফীয়দের যন্ত্রপাতি দেখে মনে হয় তারাই প্রথম কৃষির সুবিধা উপলব্ধি করে থাকতে পারে, যদিও তাদের ঘরে শস্যের দানা পাওয়া যায় নি।

এ পর্যন্ত প্রাগৈতিহাসিক কৃষিজীবী বসতি যা আবিষ্কার হয়েছে তার মধ্যে প্রাচীনতম বোধ হয় জেরুসালেমের অদূরবর্তী জেরিকো নামক জায়গা এবং উত্তর ইরাকের কুর্দিশ পর্বতশ্রেণীতে অবস্থিত জারমো গ্রাম। ৮০০০ বিসির অল্প পরেই জেরিকো এলাকায় মধ্যপ্রস্তর যুগের লোকের (নাটুফীয়) আনাগোনা ছিল। ৭৫০০ বিসিতে জায়গাটা নবপ্রস্তর বসতির রূপ ধারণ করে থাকতে পারে, এর পরবর্তী ৭০০ বছরে প্রায় শহরের ভাব এসে গিয়েছিল সেখানে। স্তরে স্তরে যে টিলাটি গড়ে উঠেছিল তার উচ্চতা ৪৫ ফুট। প্রাচীনতম ঘর যা চিনতে পারা যায় তার বয়স ৬৮০০ বিসি, মাঝখানটা ফোলা এক রকম মাটির ইট দিয়ে তৈরি; বাড়ির আকৃতি

গোল, দেয়াল ভিতর দিকে হেলানো, তাতে মনে হয় ছাত ছিল গোল করা, হয়তো ডালপালা লেপে বানানো। এর পরে চৌকোণ বাড়ি এল ৬২৫০ বিসিতে, রান্নার ব্যবস্থা ঘেরা উঠানে, কিন্তু ঠাকুরঘরের ইঙ্গিত মেলে। মাটির পাত্র বানাবার আগেই জেরিকোর লোকে পর পর পাঁচটি পাথরের দেয়াল তুলেছিল, দেয়ালের সঙ্গে এক প্রস্তরস্তম্ভ এখনও দাঁড়িয়ে আছে ৩০ ফুট পর্যন্ত, তার ভিতরের সিঁড়ি পৌঁছে দেয় এক সুড়ঙ্গে। স্তম্ভের সামনে ২৮ ফুট চওড়া আট ফুট গভীর পরিখা খোঁড়া হয়েছিল আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে। জেরিকোর আকৃতি তখন আট দশ একর, লোকসংখ্যা হয়তো ২০০০। এই অবস্থার সঙ্গে প্রকট পার্থক্য দেখা যায় পরবর্তী মৃৎপাত্র যুগে, এই সময়ের লোক ঐ রকম স্থায়ী কিছু গড়ে নি, বরং মনে হয় এই জায়গার 'শহুরে' সভ্যতা যেন খানিকটা পিছনে হটেছিল।

তেজী-কারবন মেপে জারমোর বয়স স্থির হয়েছে প্রায় ৭০০০ বিসি। ২৫ ফুট খুঁড়ে উদ্ধার করা হয়েছে এই গ্রাম। এখানে প্রায় তিন একর জমির উপর বেশ প্রশস্ত মাটির কুটীরে বাস করত ২৫ ঘর কৃষক, তাদের সংখ্যা দেড় শো'র কম নয়, যব ও দুই শ্রেণীর গম চাষ করত এরা—বুনো জাতের সঙ্গে তাদের পার্থক্য সবে ধরা যায় মাত্র; চকমকির কাস্তে, পাথরের শিল নোড়া ছিল এদের, মেঝের মধ্যে গড়া উনান ছিল, উনানের নিচে শস্যের দানা বা তার ছাপ পাওয়া গিয়েছে ৮০০০ বছর পুরনো। মাটির তৈরি চৌকোণ বাড়ি। ছাগল তো বটেই, সম্ভবত ভেড়া শুয়োর কুকুর এবং গরুও ছিল ঘরে। নানা রকমের বিচিত্র বালা, চমৎকার পাথর বাটি ও মাটির মূর্তি রেখে গিয়েছে এরা। এখানেও মৃৎপাত্র তৈরি হয়েছে শেষের দিকে। প্রধানত মার্কিন প্রত্নবিদদের উদ্যোগে এই অঞ্চলে প্রায় প্রতি বছরই প্রাচীনতর ঘাঁটি উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে, যথা করিম শারির—যেখানে নাকি ৯০০০ বিসিতে চাষের সূচনা।

তেজস্ক্রিয় পদার্থের ক্ষয় মেপে প্রাচীন বস্তুর বয়স নির্ণয়ের কথা এ বইয়ের প্রথম খণ্ডে বলেছি। আদিম পাথরের ইউরেনিয়ম ক্ষয় পৃথিবীর বয়স নির্ধারণে সাহায্য করেছে, তেজী-কারবন কাজে লেগেছে অপেক্ষাকৃত অল্প-প্রাচীন জিনিসের পরীক্ষায়। এই পদ্ধতিটির উল্লেখ আগেও বার কয়েক করা হয়েছে, এবং এর বৈজ্ঞানিক নীতিটি আসলে খুব সহজ: প্রাণীদেহের

প্রধান উপাদান কারবন, তার প্রায় লক্ষ কোটি ভাগের এক ভাগ তেজস্ক্রিয় ; মৃত্যুর পরে এই তেজী-কারবন নষ্ট হতে আরম্ভ করে, অর্ধেক ক্ষয় হয় প্রায় ৫৬০০ বছরে,* তিন-চতুর্থাংশ তার দ্বিগুণ সময়ে, ইত্যাদি। সুতরাং যে কোনও প্রাণীজাত বস্তুর মধ্যে কতখানি তেজী-কারবন বাকি আছে তা মেপে তার বয়স নির্ণয় করা যায়, অতীতে ৪০,-৫০,০০০ কি বড় জোর ৭০,০০০ বছর পর্যন্ত (এর কার্যকারিতা সবচেয়ে বেশী ৫০০০ বিসি থেকে খৃষ্টাব্দের শুরু পর্যন্ত)। আরও দীর্ঘ কাল মাপবার যে সব পদ্ধতিতে উপাদানের (যেমন ইউরেনিয়মের) ক্ষয় কাজে লাগানো হয় তার সঙ্গে এতে পার্থক্য হল যে এতে ক্ষয়িষ্ণু উপাদানটিকেই মাপা হয়, ক্ষয়ের ফলে যা দাঁড়ায় তাকে নয়। পটাসিয়ম-আরগন পদ্ধতি সম্প্রতি খুব ব্যবহার হচ্ছে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন কাল নির্ণয় করতে (দশ লক্ষ থেকে তিন লক্ষ বছর আগে পর্যন্ত)। বলা বাহুল্য, শুধু সাধারণ ফসিল নয়, অন্যান্য জিনিস যেমন কাঠ বা কয়লাও এ ভাবে পরীক্ষা করা চলে। বস্তুত এ ধরনের জিনিস পরীক্ষা করতে হাড়ের চেয়ে অনেক কম মাল দরকার হয়।

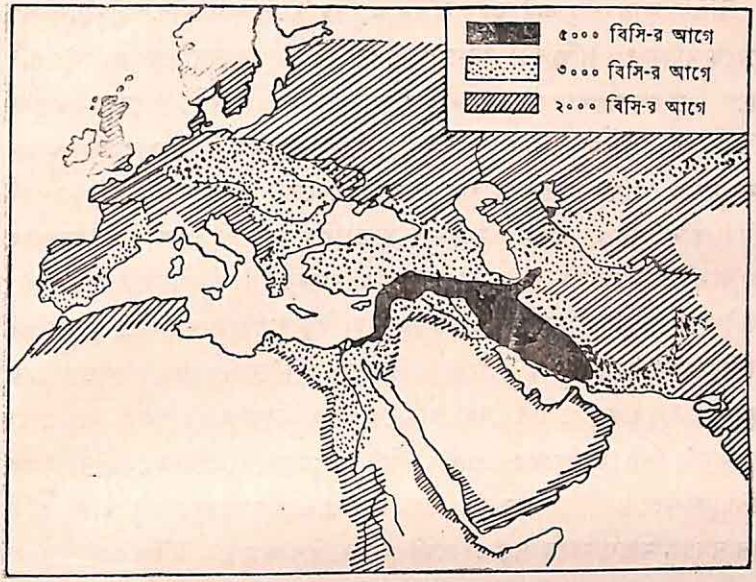
১৯৪৯ সালে আবিষ্কৃত এই তেজী-কারবন পদ্ধতি অবশ্য প্রত্নতত্ত্বের অনেক সুবিধা করে দিয়েছে, কিন্তু নবপ্রস্তর বা ঐতিহাসিক বসতির বয়স নির্ণয়ে মাটির নিচে স্তর গণনার সনাতন পদ্ধতি প্রত্নবিদরা তা বলে এখনও ত্যাগ করেন নি, সে সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। সে কালের ঘর বাড়ি নলখাগড়া ডালপালা ও কাদার তৈরি, কিছু কাল পরেই তা ভেঙে পড়ত, তখন তারই ধ্বংসের উপর আবার নতুন করে ঘর তোলা হত। আবর্জনার মধ্যে থেকে যেত সমসাময়িক ব্যবহারের জিনিস—তার মধ্যে অধিকাংশই ক্রমশ পচে নিশ্চিহ্ন হবে, কিন্তু কিছু কিছু, যেমন মাটির পাত্র, টিকে থাকবে বহু সহস্র বছর। এ ভাবে স্তরে স্তরে ক্রমে এক একটি ছোট খাটো পাহাড় বা টিলা গড়ে উঠত—একে ইংরেজীতে বলে টেল্ (tell)। দূর অতীতের মূক সাক্ষী রূপে আজ এ রকম হাজার হাজার টিলা মাথা তুলে আছে ভূমধ্য সাগরের পূর্বাঞ্চলের অনেক দেশে— গ্রীসের উপকূলে, তুরস্ক ও ইরানের উপত্যকায়, সিরিয়া ও তুর্কিস্থানের প্রান্তরে (ভারতের অসংখ্য টিলার

* আমেরিকায় খুব সাম্প্রতিক এক নির্ধারণ অনুযায়ী ৫৭৬০ বছরে।

উপর এখনও কোদালের ঘা পড়ে নি)। অনেক জায়গায় প্রায় ৫০০০ বছর আগে ঐতিহাসিক কালের শুরু, সে সময়ের চলতি জিনিস পত্র প্রায়ই সহজে চেনা যায়, সুতরাং এই স্তরটিকে সনাক্ত করতে অসুবিধা হয় না। এর নিচের স্তরগুলির বয়স মোটামুটি অনুমান করা চলে ঘরগুলি কত দিন টি঳ঁকে থাকতে পারে তার আন্দাজ থেকে। যথা, পারস্য মরুভূমির পশ্চিম প্রান্তে সিয়াল্‌ক নামক জায়গায় টিলার নিচে সতেরটি প্রাগৈতিহাসিক স্তর উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, সবশুদ্ধ ৯১ ফুট উঁচু। ঘরগুলি ছিল কাদার তৈরি, বর্তমান ইরানে এ ধরনের ঘর প্রায় ১২৫ বছর টেঁকে, সে কালে হয়তো ৭৫ বছরের বেশী নয়—তা হলে প্রথম বসতির তারিখ ৪৩০০ বিসি। (পরবর্তী অধ্যায়ে এই ঘাঁটির বিভিন্ন কৃষ্টি সম্বন্ধে আরও বিশদ ভাবে আলোচনা করব।) উত্তর ইরাকে মোসুলের কাছে ১০৪ ফুট উঁচু এক টিলা এমনি ছাব্বিশটি ধ্বংসস্তূপকে ঢেকে রেখেছে, সর্বনিম্নটি প্রায় ৭০০০ বছর পুরনো বলে ধরা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এক একটি স্তরের জঞ্জাল আজ বহুমূল্য বস্তু, সে সব দিনের মানুষদের সম্বন্ধে আমরা যা কিছু জানি তা এরই থেকে। সে কালে কেউ হয়তো জল খেয়ে মাটির পাত্র ছুঁড়ে ফেলেছে দূরে, আজ তারই ভগ্নাবশিষ্ট সংগ্রহ করতে শাবল কোদাল নিয়ে পণ্ডিতরা আসেন দূর দূরান্তর থেকে অনেক টাকা খরচ করে।

কৃষিবিদ্যা পশ্চিম এশিয়া থেকে ক্রমে মিশরে ও য়োরোপে প্রবেশ করেছে, সে মহাদেশে নবপ্রস্তর কৃষ্টি পৌঁছাতে অন্তত ৩০০০ বছর লেগেছে। য়োরোপে গাছের অভাব ছিল না, সুতরাং অনেক জায়গায় কাঠ দিয়ে বাড়ি বানানো হয়েছে সে কালে, কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব য়োরোপে মাটির ঘর তৈরি হত, সুতরাং তার থেকে টিলার সৃষ্টি হয়েছে ; তেজী-কারবন মেপে এমন এক টিলার বয়স দাঁড়িয়েছে ৪৫০০ বিসি। কৃষি জার্মেনিতে পৌঁছেছে ৪০০০ বিসির আগে, সুইৎসার্লাণ্ডে ৩০০০ বিসি নাগাদ, ইংলণ্ডে ২৫০০ বিসিতে। আমেরিকায় কৃষি-বিদ্যা সম্ভবত স্বাধীন আবিষ্কার, খুব দেরি করে ধরলেও ২০০০ বিসিতে তা সুপ্রতিষ্ঠিত ; কিন্তু সম্প্রতি তেজী-কারবনের সাক্ষ্য থেকে নিউ মেকসিকোর এক গুহায় প্রাচীন যবের বয়স নাকি ধরা হয়েছে ৪০০০ বিসিরও বেশী, এবং আর একটি খবরে প্রকাশ মেকসিকো অঞ্চলে ৬০০০-৭০০০ বিসিতে মকাইয়ের চাষ হয়ে থাকতে পারে, এবং সেই সময়েই শিম, মিষ্টি আলু ও কুমড়াও নাকি ফলানো হয়েছে। মরিচ, টোমাটো, কোকো,

চিনাবাদাম, তামাক, পেপে, পেয়ারা, আনারস ইত্যাদির নজির থেকেও মনে হয় কৃষি স্বাধীন ভাবে গড়ে উঠেছে আমেরিকায়। মধ্যপ্রাচ্যের শস্য যেমন



৩৯নং চিত্র

নবপ্রস্তর কৃষ্টির ক্রমিক বিস্তৃতি।

গম ও যব, এ অঞ্চল তেমনি মকাইয়ের কেন্দ্র, সে কালের ধান্যপ্রধান তৃতীয় কেন্দ্রের কথা পরে বলছি।

কৃষির জন্ম ঠিক কোথায় ঘটেছিল এই প্রশ্নের চেয়ে কি ভাবে ঘটেছিল এই জিজ্ঞাসা বোধ হয় বেশী রোমাঞ্চকর এবং এ সম্বন্ধে অনুমানের অভাব হয় নি। আবিষ্কারের মর্যাদা সম্ভবত স্ত্রীলোকের প্রাপ্য; তারা মাঠে মাঠে ঘুরে যে সব উদ্ভিজ্জ খাদ্য সংগ্রহ করে আনত তার মধ্যে হয়তো ছিল এই বন্য তৃণগুলির বীজ। তার কিছু কিছু পড়ল ঘরের আঙিনায়, ঘাস দেখা দিল কিছু কাল পরে, আবার ঐ বীজই ধরল তাতে; দেখে কারও সন্ধানী মনে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার অঙ্কুর উঁকি দিল, এ বার হয়তো অল্প একটু খুঁড়ে মাটিতে বীজ বুনে দিল সে, যথাকালে আবার একই ফল পাওয়া গেল।

ঋতুচক্র স্পষ্ট হল, তার তালে তালে প্রকৃতির পুনর্জন্ম ধরা পড়ল, জননী নারী জননী বসুন্ধরার রহস্য উন্মোচন করলে, দুইয়ের মধ্যে স্থাপিত হল এক প্রচ্ছন্ন মিতালি।

উদ্ভিদ আর পশু এই দুই শ্রেণীর প্রাণীর মধ্যে কোন্‌টিকে আগে বশ করেছে মানুষ? পণ্ডিতরা অনেকে এখন বিশ্বাস করেন যে সর্বত্রই কৃষি আগে এসেছে পশুপালনের। আবার কারও কারও ধারণা যে কোথাও যখন কৃষির শুরু হয়েছে তখনই অন্যেরা করেছে পশুপালন। সামান্য কয়েক জন এমন মতও পোষণ করেন যে পশু শিকার থেকেই পালনের উদ্ভব, সর্বত্রই কৃষির স্থান পরে। প্রথম সম্ভাবনাই স্বাভাবিক মনে হয়; আজও কোথাও কোথাও এমন কৃষক দল পাওয়া যায় যাদের কোনও পালিত পশু নেই। প্রাচীনতম নবপ্রস্তর সমাজে চাষ ও কিছু কিছু পশুপালনের মিশ্র গৃহস্থালিই আবিষ্কৃত হয়েছে। মধ্য য়োরোপ ও পশ্চিম চীনে যে সব চিহ্ন প্রত্নবিদরা উদ্‌ঘাটন করেছেন তাতে দেখা যায় যে প্রথম দিকে জমির ফসল আর বোধ হয় কিছুটা শিকারই এদের উপজীব্য ছিল। পক্ষান্তরে আরব্য বেদুইন বা মধ্য এশিয়ার মংগোলীয়দের মধ্যে এমন দল পাওয়া যায় যাদের সংসারে কৃষির স্থান নগণ্য, মাঝে মাঝে পশু চরিয়েই এদের দিন কাটে। কিন্তু এই ধরনের যাযাবর সম্প্রদায় বোধ হয় কখনও সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর হয় না।

কুকুর বাদ দিলে ভেড়া ছাগল গরু ও শুয়োর মানুষের প্রথম পালিত পশু, শেষের দুটি এসেছে অল্প পরে। কৃষির জন্মস্থান বলে যে সব দেশকে সন্দেহ করা হয় তাদের প্রায় সর্বত্রই বাস করত এদের পূর্বপুরুষরা, বিশেষ করে ভেড়ার। সুতরাং কৃষি ও পশুপালন নিশ্চয় অল্প দিনের মধ্যেই মিশ্রিত হয়ে গিয়েছে, যেটারই উদ্ভব হয়ে থাকুক আগে। ঐ ক'টি প্রাথমিক জন্তু ছাড়া চাষীর ঘরে পরে আর সামান্য যে ক'টি বনের প্রাণী আশ্রয় পেয়েছে তার মধ্যে প্রধান হল মুরগী; এই উপাদেয় পাখিটি বিশ্বকে দিয়েছে ভারত, গাঙ্গেয় উপত্যকায় সম্ভবত প্রথম সে পোষ মেনেছে। মহিষও এখানে বশীভূত হয়ে থাকতে পারে, অথবা এশিয়ার পূর্ব প্রান্তে, দক্ষিণ চীনে কি ফিলিপিন দ্বীপে, হয়তো ১৫০০ বিসির কিছু আগে, প্রায় ধান চাষের সঙ্গে। অন্যান্য পশুকে বশ মানাতেও নিশ্চয় চেষ্টা হয়েছে, মিশরীরা হরিণ, ব্যাবুন ও হায়েনা পুষতে চেয়েছে, কিন্তু বিশেষ ফল পায় নি। প্রাচীনতম পালিত ছাগলের চিহ্ন এ

যাবৎ মিলেছে জেরিকো (৬০০০ বিসি) ও জারমোতে, ভেড়ার জারমোতে, ও শুয়োরের পারস্থে।

বনের পশু খেতের শস্যের লোভে মানুষের সান্নিধ্যে এসে থাকতে পারে ; মানুষ তাকে নিজের খাবারে ভাগ বসাতে দেয় নি, কিন্তু তার কাটা খেতে চরতে দিয়েছে। ঐ সব অঞ্চলে সে সময়ে বৃষ্টিপাত কমে যাওয়ার ফলেও পশুর দল মানুষের ঘর ও খেত খামারের কাছাকাছি সরে এসে থাকতে পারে। আবার এমন মতও প্রকাশ করা হয়েছে যে বন্য জন্তুকে খাদ্য দিয়ে বশ মানাবার উদ্দেশ্যেই শস্যের আবাদ হয়েছে প্রথম।

অবশ্য পশু মানুষে বন্ধুত্বের সম্পর্ক যে এ যুগেই শুরু তা নয় ; সম্ভবত এর অনেক আগেই মানুষের ঘরে পশুর প্রবেশ ঘটেছে, বহু প্রাচীন কাল থেকেই পশুর বাচ্চা (বিশেষত কুকুরের) হয়তো তার আদরের বস্তু বা খেলার সামগ্রী। এবং এর থেকেই যদি নিয়মিত পশুপালন গড়ে উঠে থাকে তো এ ক্ষেত্রেও বোধ হয় মেয়েরাই পথ দেখিয়েছে, তারাই বেশী স্নেহপ্রবণ। অবশ্য এমন যদি হয় যে শিকারের থেকেই সেই জন্তুদের পোষ মানাবার বুদ্ধি প্রথম খেলেছে মানুষের মাথায়, যেমন একটু আগে বলেছি, তবে গৌরবের ভাগী পুরুষ, সেই তো এর আগে তার শিকারের সঙ্গী কুকুরকে স্থান দিয়েছে নিজের ঘরে।

ছাগল এবং ভেড়া অবশ্য সহজেই পোষ মানে, কিন্তু বুনো ষাঁড় বা শুয়োরের মেজাজ মোটেই সুবিধার না, তারা কি করে বশ্যতা স্বীকার করল তা দুর্বোধ্য। বিশেষ হিংস্র প্রকৃতির জন্তুগুলিকে সম্ভবত মেরে ফেলা হত, সুতরাং নির্বাচনের কাজ চলেছিল শান্ত স্বভাবের দিকে। পরে আক্রমণাত্মক প্রবৃত্তির অব্যবহারে আজ তাদের স্বভাব একেবারে বদলে গিয়েছে, মানুষের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে তারা। যাই হক, সে সময়ে ছোট খাটো এক দল পশু নিজের সংসারের অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ মানুষ পেয়েছে, এ ব্যবস্থার সুবিধাও সে বুঝেছে।

সুবিধা অনেক। বহু পুরা কাল থেকেই অবশ্য মানুষ তার প্রয়োজন মেটাতে বনের পশুর উপর নির্ভর করেছে—শুধু খাদ্যের মাংস নয়, অস্ত্র উপকরণের হাড় ও শিং, শীত নিবারণের চামড়া যুগিয়েছে তারা। কিন্তু নবপ্রস্তর বিপ্লবের পর পশুদের উপকারিতার আরও অনেক দরজা দেখতে

দেখতে খুলে গেল। ঠিক খেতের শস্যের মতই ঘরের পশুও মজুদ খাদ্য—শিকারের শ্রম বিপদ অনিশ্চয়তা এড়ানো যায় এ ব্যবস্থায়; এবং শুধু মাংস নয়, পরম উপাদেয় দুধের নিয়মিত উৎস তারা। দুধ দোহানোর বুদ্ধি নিশ্চয় মানুষের মাথায় খেলেছে নিজের আঙিনায় বাছুর বা ছাগল-ছানার দুধ খাওয়া দেখে, এবং তখন থেকে তা তার অন্যতম প্রধান খাদ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্নের পর বস্ত্র, সে ক্ষেত্রেও রুক্ষ পশুচর্ম বা বল্কলের চেয়ে উন্নততর কিছুর অর্থাৎ বোনা কাপড়ের নির্দেশ দিল ভেড়া ও ছাগলের পশম। বুনো ভেড়ার গায়ে কিন্তু ছাগলের মত লোমই প্রধান, তার ফাঁকে ফাঁকে আসল পশম লুকিয়ে থাকে সূক্ষ্ম আঁশের মত; পালিত ভেড়ার গায়ে ক্রমশ এগুলি বেড়েছে, যে সব প্রাণীর পশম অপেক্ষাকৃত বেশী তাদের থেকে বংশ পরম্পরায় বাচ্চা আদায় করে নিকৃষ্টদের কেটে খাওয়া হয়েছে—এ ভাবে একই প্রাণী যুগিয়েছে অন্ন ও বস্ত্র। এই নির্বাচন নীতি ব্যবহার করে নবপ্রস্তর কৃষক অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃতির উপর টেক্কা দিয়েছে—যে উপায়ে ভেড়ার পশম বেড়েছে সেই উপায়েই গরুর দুধ বেড়েছে, খোঁয়াড়ের পশু যেমন উন্নত হয়েছে তেমনি খেতের শস্যও। সে কালের প্রগতিশীল মিশরীরা কিন্তু ৩০০০ বিসির আগের পশম জানত না, যদিও ইরাকে এর আগেই পশমের জন্য ভেড়া পালিত হয়েছে।

ফসল কাটার পর সেই খেতে এ সব পশুরা চরেছে, তাদের গোবরে যে মাটির উর্বরতা বাড়ে তা মানুষ নিশ্চয় এক দিন লক্ষ করেছে। এই খেতের চাষেও আবার সে পশুকে কাজে লাগিয়েছে লাঙল টানতে, কিন্তু সে বুদ্ধি তার মাথায় এসেছে নবপ্রস্তর যুগের সাম্প্রতিক অংশে, গাড়ি টানতে বা ভার বইতে এদের কাজে লাগাবার পরে। পালিত পশুর বিবিধ সুবিধা, বিচিত্র উপকারিতা মানুষের জীবনে ও চিন্তায় যে কত বড় বিপ্লব এনেছিল তা সহজেই অনুমেয়।

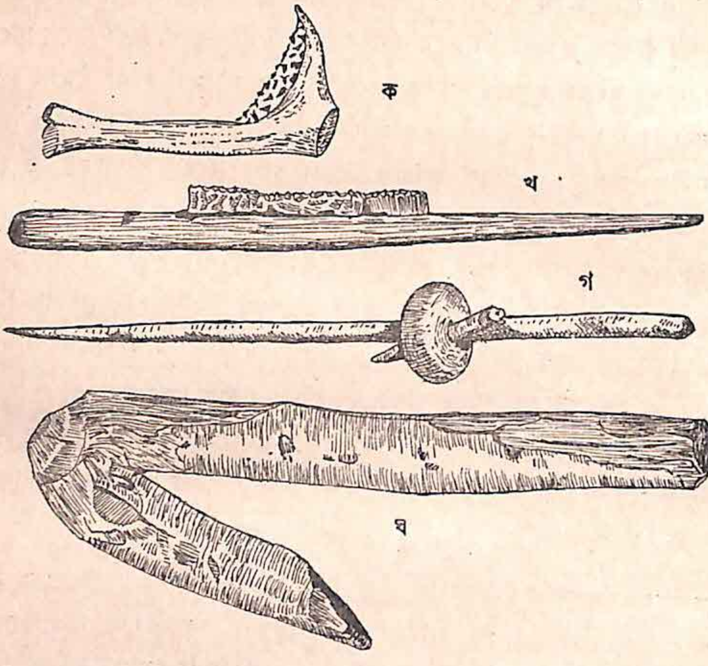
কৃষি ও পালন বিদ্যা হাতে পেয়ে মানুষের খাদ্যসমস্যা যে মিটে গেল তা নয়—এ সমস্যা আজও মেটে নি, যদিও আজ আমরা বিজ্ঞান-সম্মত চাষ শিখেছি। জমির যত্ন ও সংরক্ষণ, সারের ব্যবহার ইত্যাদি প্রথম চাষীরা নিশ্চয় জানত না। তারা এক খণ্ড জমি থেকে জঙ্গল সাফ করে হয়তো কোনও রকম এক চোখা লাঠি দিয়ে তা খুঁড়ে বীজ বুনত, যেমন এশিয়া

আফ্রিকা দক্ষিণ আমেরিকার কোথাও কোথাও আজও করা হয়। এই অবস্থায় অবশ্য অল্প দিনেই ফসল কমে আসত, তখন ঘরের কাছেই নতুন কোনও জমিতে চলত ঐ পদ্ধতিরই পুনরাবৃত্তি। অবশেষে বসতির কাছে সব জমি ফুরিয়ে গেলে পোঁটলা পুঁটলি বেঁধে তারা বেরিয়ে পড়ত স্থানান্তরে নতুন ঘর বাঁধতে। এই রীতিকে বলা হয়েছে উদ্যান-কৃষি, এরই ফলে চাষের রহস্য এত সহজে ছড়িয়ে পড়তে পেরেছে। আসামের ধানচাষীদের মধ্যে এই ধরনের যাযাবর-বৃত্তি অল্প দিন আগেও ছিল, হয়তো এখনও আছে।

নদীতীরের সরস উর্বর ভূমিতে যারা চাষ করেছে তাদের জীবনে স্থায়িত্ব ছিল বেশী। মিশরকে হেরোডোটাস বলেছেন 'নীল নদীর দান', নদী নিয়মিত যোগাত জল ও সার, প্রতি বছর তার দুই তীর ভেসে যেত বন্যার জলে ও পলির পাঁকে। এই স্বাভাবিক সেচের ও সারের সুযোগ নিয়ে এখানেই কৃষির শুরু হয়েছে বলে এক পণ্ডিত যুক্তি দেখিয়েছেন। আর যদি এমন হয় যে সে সময়ে পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকা এত শুষ্ক ছিল না, তবে বৃষ্টির জলই চাষীর প্রধান সহায় হয়ে থাকতে পারে। যে ভাবেই প্রকৃতি জল যুগিয়ে থাকুক প্রথমে, কৃষি বিদ্যা নিশ্চয় দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়েছিল ঐ অঞ্চলে।

যাযাবর কৃষিবৃত্তির প্রত্যক্ষ চিহ্ন প্রাথমিক নবপ্রস্তর ঘাঁটিতে অনেক জায়গায় দেখা যায়। প্যালেসটাইনের নাটুফীয় সম্প্রদায়ের নাম করেছি একটু আগে। এদের ঘাঁটিগুলি সম্ভবত ৫০০০ বিসিরও বেশ কিছু পুরনো, তার একটির থেকে এদের নামকরণ। এরা ছিল প্রধানত শিকারী, জীবনযাত্রা অনেকটা মধ্যপ্রস্তর ধারা অনুযায়ী; এরা ঘর বাঁধত গুহার মুখে, সম্ভবত ঋতু অনুসারে, সেখানেই কবর দিয়েছে মৃত ব্যক্তিদের; এরা ব্যবহার করেছে সনাতন চকমকির ছুরি কাটারি চাঁছনি, তার সঙ্গে হাড়ের বর্শা-ফলক, কাঁটা-বসানো অস্ত্রের মুখ, মাছ ধরবার উপকরণ, উপরন্তু আর একটি আশ্চর্য বস্তু: হাড়ের গায়ে লম্বা খাঁজ কেটে তার মধ্যে আঠা দিয়ে একের পর এক বসানো ছোট ছোট চকমকির ফলা, তাদের মুখে সূক্ষ্ম ধাপ কাটা, সবটা মিলে যেন করাতের মুখ; হাড়ের এক দিক হাতল, হয়তো পশুর মাথার মত করে ক্ষোদিত। এই নতুন যন্ত্রগুলি আসলে কাস্তে—শস্যতৃণ-সংশ্লিষ্ট সিলিকা বা স্বাভাবিক কাঁচের ঘষায় ঘষায় পাথরের

গা যে চকচকে হয়ে উঠেছিল তা এখনও দেখা যায়। তা ছাড়া গুহার সামনে পাষাণ-প্রাঙ্গণ গর্ত হয়ে গিয়েছে শস্যের দানা গুড়ো করতে করতে, ঐ কাজে ব্যবহৃত পাথরের নোড়াও পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু এই শস্য



৪০নং চিত্র

আদি চাষীদের উপকরণ; ক, প্যালেসটাইনে প্রাপ্ত হাড় ও চকমকির তৈরি নাটুফীয় কাস্তে; খ, কাঠ ও চকমকির কাস্তে, প্রাপ্তিস্থান ফাইয়ুম, মিশর; গ, বীজ বোনার আগে মাটি খুঁড়তে দক্ষিণ আফ্রিকার বুশম্যানরা এই ভার-বসানো লাঠি ব্যবহার করে; ঘ, গাছের ডাল থেকে তৈরি আর এক রকম প্রাথমিক কোদাল, কাহুন, মিশর, প্রায় ২০০০ বিসি।

কৃষিজাত না সম্পূর্ণ বন্য তা ঠিক বলা যায় না, যদিও ঐ সুগঠিত কাস্তে দেখে কৃষির শুরু হয়ে গিয়েছিল বলেই মনে হয়।

উত্তর ইরাকে মোসুলের অদূরে এক ঢিবির নাম হাস্সুনা, তার নিম্নতম বা প্রাচীনতম স্তরে মনে হয় এমনি এক অস্থায়ী গোষ্ঠী বাসা বেঁধেছিল, সম্ভবত তাঁবুর বাসা। কিন্তু তখনই পশুপালন ও চাষ দুইই জানা ছিল তাদের—শুধু যে গরু ও ভেড়ার হাড় অপর্যাপ্ত পাওয়া গিয়েছে তাই নয়,

খেতের মাটি আলগা করবার জন্য প্রাথমিক পাথুরে কোদাল (তা হাতলের সঙ্গে জুড়তে যে শিলাজতুর আঠা ব্যবহার হয়েছে তা এখনও লেগে আছে গায়ে), আটা বানাতে শস্য পিটিয়ে গুঁড়ো করবার হামানদিস্তা, ঘষে গুড়ো করবার শিল নোড়া পর্যন্ত ছিল তাদের। উপকরণ তখনও প্রায় সবই পাথরের, নক্শা-আঁকা মাটির পাত্র তৈরি আরম্ভ হয়েছে—অবশ্য হাতে।

কিন্তু এর অল্প পরেই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে স্থায়ী বসতি, তাঁবুর পরিবর্তে ছোট ছোট বাড়ি, তার আঙিনাকে ঘিরে ঘর, তাদের একটি বসবাসের, আর একটি যে রান্নাঘর তা স্পষ্টই বোঝা যায়—রুটি তৈরির উনান, জিনিস রাখবার পাত্র বা ভাণ্ড রয়েছে এখনও ; এ ছাড়া কিছুটা পৃথক এক রুটি সেঁকবার ঘর, তার কাছেই আঙিনায় গর্ত করে তৈরি হয়েছে শস্য মজুদ রাখবার দুটি জায়গা। এ রকম শস্যাধার এখন পর্যন্ত তিরিশেরও বেশী আবিষ্কৃত হয়েছে হাস্থনাতে (এবং প্রায় সমসাময়িক মিশরেও)। তা ছাড়া পাওয়া গিয়েছে নাটুফীয়দের মত কাস্তে-ফলার চকমকি, এগুলি বসানো হত সামান্য বাঁকা কাঠের হাতলে। বাড়িগুলি মাটির তৈরি, যেমন এখনও প্রাচ্য দেশে প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়।

ইরানে সিয়াল্‌ক টিলার নাম করেছি আগে, সেখানেও অনুরূপ ক্রম-পরিণতি দেখা যায়। নিচের দিকে ঘর বাড়ির কোনও স্পষ্ট চিহ্ন নেই, কিন্তু কাঠকয়লা ও ছাই দেখে মনে হয় কাঠ বা ডাল দিয়ে কোনও রকম ছাউনি তৈরি হত। এদের উপকরণের মধ্যে পাওয়া গিয়েছে পালিশ-করা পাথুরে কুড়াল (এক সমাধিস্থ ব্যক্তির হাতে), প্রাথমিক কোদালের পাথুরে মুখ, খাঁজ-কাটা হাড়—সম্ভবত চকমকির খণ্ড বসিয়ে নাটুফীয় ধরনের কাস্তের অংশ তা, এবং কালো রং করা হাতে তৈরি মাটির পাত্র। এ সব স্তরের ঠিক উপরেই আরম্ভ হয়েছে মাটির ঘরের বসতি, প্রথম ক্ষুদ্র তাম্র-বস্তুও এখানেই পাওয়া গিয়েছে। অস্থির শিকারী জীবন থেকে স্থায়ী কৃষি বসতির, সংগ্রাহক থেকে উৎপাদকের চমৎকার উদাহরণ এই সব সম্প্রদায়।

সংগ্রাহক থেকে উৎপাদকের এই পরিণতি সম্পূর্ণ হয় নি এক দিনে ; এমন কি আজও নদী সমুদ্রে মাছ ধরা প্রকাণ্ড ব্যবসা, শিকারের আনন্দে এখনও মানুষের রক্ত নেচে ওঠে অবশ্য আহারের জন্য ততটা নয় যতটা

বিহারের জন্য। কৃষি ও পালনের রহস্য আয়ত্ত হওয়ার পরে সে কালে সংগ্রহের কাজও চলতে থাকল পাশাপাশি, জীবিকার জন্য পশু পাখি মাছ শিকার হঠাৎ বন্ধ হল না। বন্য মাংস, মাছ, 'বেরি', বাদাম, মিষ্টি আলু, শামুক, এমন কি পিঁপড়ের ডিমের ভাঁড়ারে প্রথম দিকে শুধু অতিরিক্ত যোগ হল দুধ এবং শস্যজাত আহার্য, পরে ক্রমে তারাই অবশ্য প্রধান হয়ে দাঁড়াল। মিশর ও ইরানের প্রাথমিক নবপ্রস্তর ঘাঁটিতে সংগ্রাহক বৃত্তির চিহ্ন প্রায় সমান লক্ষিত হয় কৃষি ও পশুপালনের পাশাপাশি।

অবশ্য প্রথম দিকে এই ধরনের মিশ্র গৃহস্থালিই আমরা আশা করতে পারি। ঠিক তেমনি এটাও স্বাভাবিক যে সর্বত্র নবপ্রস্তর বিপ্লবের ক্রম-বিকাশও একই রাস্তা ধরে চলে নি, স্থান কাল পাত্র ভেদে বিভিন্ন কৃষ্টির চিহ্ন মেলে। এই পার্থক্য যেমন এক দিকে দেখা যায় হাতিয়ারে পাত্রে অলংকারে শিল্পে বা কবর প্রথায়, অন্য দিকে তেমনি আহার সংগ্রহে ও উৎপাদনে। পশ্চিম ও মধ্য য়োরোপে, ইউক্রেন ও পশ্চিম চীনে অস্থায়ী উদ্যান-কৃষিবৃত্তি দেখা যায়, আবার দেশান্তরে, যেমন ক্রীটে, প্রাচীনতম চাষবাসীরা মোটামুটি স্থায়ী। পশ্চিম য়োরোপে শিকার ও পশুপালনের গুরুত্ব প্রায় সমান ছিল শস্য উৎপাদনের, যদিও মধ্য য়োরোপীয় ভাঁড়ারে প্রথম দিকে গার্হস্থ্য পশুর দান লক্ষিত হয় অল্প এবং শিকারের উপর নির্ভর প্রায় নগণ্য। নবপ্রস্তর চীনে শুয়োর ও কুকুরের মাংস অনেক জায়গায় জনপ্রিয় ছিল, আবার শুধু গরু ও ভেড়ার হাড় পাওয়া গিয়েছে মিশরের এক ঘাঁটিতে, যদিও বাইবেলে পরে বলেছে (জেনেসিস ৪৬,৩৪) মিশরীরা পশুপালকদের সু চক্ষে দেখতে পারত না। বিভিন্ন দেশে, যেমন মিশরে, দানিয়ুব পর্যবাহিকায় ও সিরিয়াতে—ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের যব চাষ হয়েছে। সুইৎসার্লাণ্ড ও উত্তর পশ্চিম য়োরোপে এক 'পশ্চিমী' জাতি বাস করত, এরা খাদ্যশস্য ছাড়া তিসি এবং সম্ভবত আপেলের চাষও করত, কিন্তু এদের প্রধান খাদ্য যে ছিল গোমাংস উচ্ছিষ্ট হাড়গোড় থেকে তা বোঝা যায়; শিকারের পশুর হাড় কোথাও কোথাও শতকরা আড়াই ভাগ মাত্র। প্রধানত চাষী না হলেও পশ্চিমীরা মোটামুটি স্থায়ী ঘরে বাস করত; সুইৎসার্লাণ্ডে হ্রদের ধারে ধারে এরা দীর্ঘ খুঁটির উপরে বাসা বানাত বলে হ্রদবাসী নামে প্রসিদ্ধ।

কৃষির আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে এক শ্রেণীর নতুন হাতিয়ারও দরকার হয়ে পড়েছিল। বীজ বোনার আগে মাটি খোঁড়ার জন্য সত্যিকারের লাঙল তখনও সৃষ্টি হয় নি, প্রথম দিকে নানা রকম সরু মুখওল্দা কাঠের কোদাল ব্যবহার হয়েছে; এগুলি কখনও কখনও চোখা লাঠি মাত্র, মুখের কাছে পাথর দিয়ে ভারি করা, অথবা বাঁকা ডাল সামান্য সংস্কার করে নেওয়া (৪০নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। তার পর এল পাথরের পাত-লাগানো কোদাল: এগুলিকে লাঙলের মত মাটির ভিতর দিয়ে টেনে নিত প্রথমে মানুষে, পরে বলদে। ইংলণ্ডের কিউ উদ্যানে ১৯৫৩-৫৫ সালে প্রাচীন জাতের গম নবপ্রস্তর পদ্ধতিতে চাষ করা হয়েছিল, দেখা গেল এতে হালকা মাটিরই কর্ষণ সম্ভব এবং আগাছা দূর করা কঠিন; ফলে চারাগুলি ভাল বাড়ে নি। মাঠে শস্য কাটার উদ্দেশ্যে সোজা হাড় বা কাঠের পাতে চকমকির দাঁত বসিয়ে কি করে প্রথম কাস্তে তৈরি হয়েছে তা আমরা দেখেছি, তার পর এর বদলে চোয়ালের বাঁকা হাড় ব্যবহার করেছে কৃষি-কর্মীরা, অথবা কাঠ দিয়ে ঐ আকৃতির অনুকরণ করেছে। আরও এক ধাপ উন্নতি হল যখন কাঠের হাতলে বাঁকা চাঁদের মত একই খণ্ডে তৈরি চকমকির ফলা যুক্ত হল, এগুলির সঙ্গে চেহারায় আধুনিক লোহার কাস্তের বিশেষ কোনও তফাৎ নেই। এই সমস্ত জিনিসটা পোড়া মাটি দিয়েও তৈরি হয়েছে সে কালে।

শস্য ঘরে আনার পরে তুষ থেকে দানা পৃথক করতে যথোপযুক্ত এক শ্রেণীর উপকরণ দরকার হয়েছে; এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে পোড়া মাটির তৈরি চ্যাপটা নৌকার মত এক রকম থালা, ভিতরে আড়াআড়ি ভাবে কয়েকটি সমান্তরাল দাগ তোলা, তার গায়ে ঘষে শস্যের খোসা ছাড়ানো হত। দানা ভেঙে আটা করতে হয়েছে, এবং তার জন্য সে কালের ঘরে যে দুটি পাথর ব্যবহার হয়েছে আজকের ভারতীয় শিল নোড়ার সঙ্গে তার কোনও মৌলিক পার্থক্য নেই। শস্য-পেষা পাথর নানা জায়গায় দেখা যায়, বিশেষত জেরিকোতে।

শস্যকে হয়তো খৈয়ের মত ভেজে গুঁড়ো করা হত, তার সঙ্গে দুধ মিশিয়ে হতে পারে পরিজ, অথবা পিঠে রুটি ইত্যাদি নানা খাদ্য, শুধু জল দিয়ে ফুটিয়ে হতে পারে পানের উপযুক্ত মাড়। এই জাতীয় মাড় রেখে

দিলে তা গেঁজে যায় নানা জীবাণুর বৃদ্ধির ফলে, নিশ্চয় এই ভাবে ঈস্ট্ আবিষ্কৃত হয়েছে। পাউরুটি বানাতে এই ঈস্ট্ জীবাণুর ব্যবহার প্রয়োজন এবং উনান তৈরি করতে হয় বিশেষ ভাবে, কিন্তু তার আগেই উত্তেজক সন্ধিত পানীয় তৈরিতে ঈস্ট্ কাজে লেগেছিল—মানুষের অভিজ্ঞতায় এক নতুন রঙিন জগতের দুয়ার খুলে দিয়েছিল। এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অদৃশ্য প্রাণীটি মানুষের অজ্ঞাতসারে তার সহায় হয়ে তাকে এক হাতে দিয়েছে রুটি আর এক হাতে সুরা, শিখিয়েছে man does not live by bread alone। খাদ্য পানীয়ের জন্য শস্য জমিয়ে রাখা হত পরবর্তী ফসল পর্যন্ত। অধিকাংশ শস্য থেকেই বীয়ার বানানো চলে এবং দেশে দেশে পানীয়টি সম্ভবত কৃষির প্রায় সমানই প্রাচীন। ইতিহাসের উষাতেই দেখা যায় মিশরে ও ইরাকে বীয়ার তৈরি হচ্ছিল, সুমেরের প্রথম দেবতাদের তোষণে উৎসর্গ করা হত সুরা।

মিশরী পুরাণে বীয়ারের ক্ষমতা সম্বন্ধে একটি মজার গল্প আছে। সে কালে এক সিংহমুখী মানুষথাকী মেয়ে (নাম সেখমেৎ) মহা উৎপাত আরম্ভ করেছিল—তার বাবা আর কেউ নয়, দেবাদিদেব রা। যদিও তারই প্ররোচনায় সেখমেৎ এই মারণব্রত নিয়েছিল তবু রক্তের নদী যখন বয়ে গেল তখন বাপের মন গলল, কিন্তু মেয়েকে আর থামানো গেল না। অবশেষে অনেক ভেবে উন্মাদিনীকে বশ মানাবার এক বুদ্ধি বার করলে রা। তার আদেশে দেবতারা যব ভেঙে বানালে ৭০০০ কলসি বীয়ার, তার পর তার সঙ্গে মেশানো হল এক মাদক মূলের রস ; সেই রক্তলাল মিশ্রিত পানীয়টি ঢেলে দেওয়া হল মাটিতে, সেখমেৎ এসে মানুষের রক্ত মনে করে পরমানন্দে তা চেটে চেটে খেলে, তার পর ঝিমিয়ে পড়ল। তখন বাবার ডাকে লক্ষ্মী মেয়ের মত সে আবার তার কাছে ফিরে গেল। যে বীয়ার শুধু মন মাতায় না, এমন বিপদ থেকে ত্রাণ করে তার প্রতি পক্ষপাতিত্ব স্বাভাবিক। আজ থেকে ৫০০০ বছর আগেই য়োরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় সব সমাজে মদ মদিরা অবশ্য-প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং বিবিধ আচার অনুষ্ঠানে তার ব্যবহারের জন্য নানা আকৃতির ঘট ঘটি গেলাস ছাঁকনি ইত্যাদি গড়া হয়েছে। এখনও পৌরাণিক সমাজে এর মূল্য হয়তো রুটির চেয়ে কম নয়—উত্তর রোডিসিয়ার অধিবাসীদের মধ্যে নৃতত্ত্ববিদরা লক্ষ করেছেন যে তারা বরং

প্রতি বছরই আধপেটা খেয়ে থাকবে, তবু বীয়ারের জন্য নির্দিষ্ট শস্যের গায়ে হাত দেবে না। বর্তমান জগতের সব নবপ্রস্তর সমাজে এমনি কোনও না কোনও সন্ধিত পানীয়ের ব্যবহার আছে, উপযুক্ত স্থানীয় উপাদান থেকে তা তৈরি। যেমন বাংলা দেশে অতি প্রাচীন কাল থেকেই মদ তৈরিতে শস্যজাত দ্রব্য ছাড়াও মধু, আখ ও তালের রস ব্যবহার হয়েছে।

নবপ্রস্তর বিপ্লবের প্রথম দিকে অন্য যে দুটি প্রধান আবিষ্কার মানুষের জীবন অনেক সহজ ও সমৃদ্ধ করেছে তা হল মাটির পাত্র ও সুতার কাপড়। মাটির নিচে বিস্মৃতির অন্ধকারে নিমজ্জিত কলসির কানা আজ পুরাতত্ত্বের অন্বেষণে মস্ত বড় সহায়, এক খণ্ড ভাঙা ভাণ্ডকে সাক্ষী করে প্রত্নবিদ গড়ে তোলেন প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক কালের সমাজ চিত্র। পোড়া মাটির পাত্র তৈরির শিল্প নবপ্রস্তর কৃষ্টির সাধারণ ও সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য, যদিও কোথাও কৃষির আগেই, কোথাও বা অনেক পরে এই শিল্প সূচিত হয়ে থাকতে পারে। অধ্যাপক ক্লার্ক লিখেছেন ৫০০০ বিসির অল্প আগে মৃৎপাত্রের জন্ম। আসলে কবে কোথায় এর রহস্যটি মানুষের কাছে প্রথম ধরা পড়ে তা জানা নেই। হয়তো কাদায় লেপা এক ঝুড়িতে কোনও রকমে আগুন লাগায় কেউ প্রথমে দেখলে এই আশ্চর্য অবিশ্বাস্য রূপান্তর; কিনিয়াতে অন্তিম পুরাপ্রস্তর আমলের পোড়া মাটির খণ্ড পাওয়া গিয়েছে তা এ রকম সম্ভাবনারই নির্দেশ দেয়, খণ্ডগুলির গায়ে পরিষ্কার ঝুড়ির বোনা দাগ। যাই হক, আব্ধিারের পরে মানুষের বিস্ময় ও আনন্দ আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি; এর আগে কাঁচা মাটির ভাণ্ড ব্যবহার করতে গিয়ে সে মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারে নি, তা জল লাগলে গলে যায়, গরম করলে টেকে না; কিন্তু পোড়া ভাণ্ড অত সহজে ভাঙা যায় না, তাতে করে জল ফোটানো চলে। গম ও যবজাত খাদ্য প্রস্তুত করতে এমন পাত্রের প্রয়োজনীয়তা বেড়েছিল যাতে জলীয় জিনিস রাখা চলে। এ যেন জাদুর বলে কাদার থেকে পাথর সৃষ্টি! জাদুর ধারণা আরও স্পষ্ট হয়ে জাগল বাইরের রূপান্তর দেখে—ঐ ম্যাটমেটে কালচে রং আগুনের ছোঁয়ায় কেমন তারই মত লোহিতাভ হয়ে উঠল! সে কালের ভাবুক লোকের মনে এর থেকে হয়তো গভীর দার্শনিক কিংবা বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন জেগেছে বস্তুর রূপভেদ ও স্বকীয় চরিত্র সম্বন্ধে।

এই রূপান্তরে ও পোড়া মাটির পাত্র সৃজনে আছে প্রকৃত বিজ্ঞানের খেলা, যদিও এর রাসায়নিক মূলনীতি আমরা শিখেছি বহু হাজার বছর পরে। কুমারের মাটির প্রধান উপাদানটি হল এক যৌগিক বস্তু, যাতে আছে অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট এবং তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে যুক্ত জল (কেলাস জল)। অতিরিক্ত জল মিশিয়ে কাদা বানিয়ে এই বস্তুটিকে যেমন খুশি রূপ দেওয়া চলে, আবার ৬০০ ডিগ্রি সেন্‌টিগ্রেডের উপরে গরম করলে যুক্তজল বেরিয়ে গিয়ে একটি কঠিন পদার্থের সৃষ্টি হয়। এই মৌলিক রূপান্তরের সঙ্গে ক্রমে আরও অনেক সংশ্লিষ্ট তথ্য শিখতে হয়েছিল সে কালের কুম্ভকারকে ; কাদার থেকে কোন্ উপাদান বেছে বাদ দিলে বা তাতে নতুন কোন্ পদার্থ যোগ করলে কাজ সহজ হয়, জিনিস ভাল হয় ; তৈরী জিনিসটির রং সর্বদা একই রকম হয় না, লাল সবুজ ধূসর রঙও ধরে, এবং তা নির্ভর করে মাটির অন্যান্য ছোট খাটো উপাদানের উপর, আগুন জ্বালতে কি জালানি ব্যবহার হল, আগুনের সঙ্গে কতখানি বাতাস মিশল ইত্যাদির উপর। এ সবের কর্তৃত্ব অর্জন করে সে ক্রমশ তার পাত্রে রঙের বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য বাড়াতে শিখেছে। বিভিন্ন মাটি পুড়িয়ে যে বিভিন্ন রং আনা যায় এই নীতি আরও সুষ্ঠু রূপে ও বুদ্ধি সহযোগে কাজে লাগিয়েছিল মধ্যপ্রাচ্যের মানুষ—হয়তো পোড়াবার আগে সাধারণ মাটির পাত্রে সে এমন মাটি মাখিয়ে নিয়েছে যাতে লোহার অনুপাত বেশী, যা পুড়লে লালচে রং নেবে ; এমন কি এই মাটি গুলে নক্শা এঁকেছে পাত্রের গায়ে। এ সব কাজে যথেষ্ট কল্পনাশক্তির প্রয়োজন, কারণ বিভিন্ন মাটি দিয়ে চিত্রিত পাত্রের চেহারা পোড়াবার আগে ও পরে সম্পূর্ণ আলাদা, কাজের সময়ে পরবর্তী রূপটি শিল্পীর কল্পনাদৃষ্টির সামনে থাকা দরকার।

এই গেল বর্ণবৈচিত্র্যের কথা। দ্বিতীয় কথা আকৃতি—সেটি যথার্থ না হলে কোনও পাত্রেরই সৌন্দর্য ও সৌষ্ঠব পূর্ণাঙ্গ হয় না, আবার সেখানে মৌলিক কল্পনার খেলা দেখিয়ে ম্যাটমেটে মাটির ঘটকেও মনোরম করে তোলা চলে। শুধু মাটির নয়, অন্যান্য পাত্রেও সমতা ও পরিপ্রেক্ষিতের প্রতি দৃষ্টি রেখে নতুন নতুন রূপ সৃষ্টি আজ এক মস্ত বড় শিল্প, তার জন্য বহু যন্ত্র উপকরণও আছে। সেই প্রথম আবিষ্কারের দিনে মানুষকে প্রধানত নিজের হাতের উপর নির্ভর করতে হলেও তারই মধ্যে বুদ্ধি খাটিয়ে সে

কাজ সহজ করে নিয়েছে। ছোট খাটো অথবা চ্যাপটা ধরনের পাত্র অবশ্য হাতেই সম্পূর্ণ গড়া যায়, কখনও বা কুম্ভকার আগে লাউয়ের অর্ধাংশ বা ঝুড়ির গায়ে কাদা লেপে শুকিয়ে নিয়েছে, তার পর পোড়াবার আগে ভিতরের বস্তুটি বার করে ফেলেছে। কিন্তু ঘট বা কলসি জাতীয় আধার গড়া অত সহজ হয় নি. সে ক্ষেত্রে নিচের অংশটি ঐ উপায়ে বানিয়ে নিয়ে তার উপর সরু সরু কানা একের পর এক বসিয়ে যেতে হয়েছে; কাজটি মোটেই সহজ নয়, কানাগুলির পরিধি ক্রমশ ছোট হয়ে এসেছে, প্রত্যেকটিকে ঠিক মাপ অনুসারে আলাদা করে বানিয়ে নিতে হয়েছে, সেগুলি বসাবার আগে খেয়াল রাখতে হয়েছে যেন শুকিয়ে না যায়, তার পর অপেক্ষা করতে হয়েছে যাতে কিছুটা শুকিয়ে নিচের অংশকে ভাল করে ধরে। এমনি করে ধাপে ধাপে কাজ এগিয়েছে, হয়তো কয়েক. দিন কেটে গিয়েছে একটি ঘট সম্পূর্ণ করতে।

তবু এ কাজে সে দিনের মানুষের সব শ্রম সব বিরক্তি যে মুছে গিয়েছে নতুন স্বষ্টির আনন্দে তা আমরা অনুমান করতে পারি। ইতিপূর্বে তার কাজের বস্তু—পাথর, হাড় এমন কি কাঠ—ছিল কঠিন, তাদের নিজস্ব আকৃতির খুব বেশী পরিবর্তন সম্ভব হয় নি, নিজের প্রয়োজনটাই বরং মানুষকে মানিয়ে নিতে হয়েছে; কিন্তু এক তাল কাদার থেকে নমনীয় আর কি হতে পারে; তা মানুষের সম্পূর্ণ অধীন। এমন জিনিস প্রথম হাতে পেয়ে নতুন পরীক্ষা ও উদ্‌ভাবনের খেয়ালে মেতে ওঠাই স্বাভাবিক, কিন্তু তবু সাবেক পাত্র-গুলিতে আমরা দেখি পূর্ববর্তী কোনও আধারের স্পষ্ট ছাপ (এখানে ছাপ শব্দটি প্রায় আক্ষরিক অর্থে ব্যবহার করা চলে)। এর আগে মানুষ পশুদেহের বিভিন্ন স্থলী বা চামড়া থেকে, গাছের লাউ থেকে পাত্র বানিয়েছে, ঝুড়ি এবং নিজেরই খুলি ব্যবহার করেছে জিনিস রাখতে; প্রথম দিকের মৃৎপাত্রের আকৃতি এদের অনুকরণে গড়া তো বটেই, এমন কি সাদৃশ্য বোঝাবার জন্য পাত্রের গায়ে চামড়ার সেলাই বা ঝুড়ির বোনা-নকশা এঁকে বা খুদে দেওয়া হত। আজও অনেক আধুনিক তৈরী জিনিসের পরিকল্পনায় পুরনোর ছাপ আমরা দেখতে পাই, কিন্তু তা শিল্পীর খেয়ালে ইচ্ছা করে ধার করা; সে কালের মানুষ অনেকটা অজ্ঞাতসারেই পরিচিতের অনুকরণ করেছে তার বাইরে কিছু ভাবতে পারে নি বলে। এ সব ঘরোয়া কাজ

সম্ভবত মেয়েদের হাতে ছিল, এবং সনাতন ধারার বাইরে তারা সহজে পা বাড়াতে চায় না।

পাত্র গড়তে মাটি ব্যবহারের আগে মানুষ তার সনাতন উপাদান পাথরও অবশ্য কাজে লাগিয়েছে। জারমোতে চমৎকার মসৃণ সব বাটি পাওয়া গিয়েছে, চুনাপাথরের তৈরি, গায়ে নানা রঙের শিরা। পরে মাটির পাত্রে এই শিরার অনুকরণ করা হয়েছে রং দিয়ে। জারমো ও জেরিকোতে মৃৎপাত্র কিছুটা যে দেরিতে এসেছে তা হয়তো প্রস্তর-শিল্প এত উন্নতি করেছিল বলেই। মাটির জিনিস অনেক বেশী ভঙ্গুর, নবপ্রস্তর যুগের স্থিতিশীল জীবনেই সম্ভব হয়েছে এর ব্যাপক ব্যবহার।

মধ্যপ্রাচ্যের আদিতম ঘাঁটিগুলির মধ্যে বোধ হয় একমাত্র সিয়াল্‌কের (ইরান) নিম্নতম স্তরেই চিত্রিত মৃৎপাত্র লক্ষিত হয়। কিন্তু তৎপরবর্তী কালে প্রায়ই রঙের ব্যবহার দেখা যায় ইরাকে এবং বিশেষ করে ইরানে— অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এক রঙের নক্‌শা, কখনও দুই কি তারও বেশী। চিত্রণ-কৌশল ও তার আনুষঙ্গিক উন্নত চুলার আবিষ্কার উত্তর ইরান, ইরাক ও সিরিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে ঘটেছিল বলে মনে হয়, কিন্তু পরে পারস্য উপসাগর সরে যাওয়ার ফলে দক্ষিণ ইরাক বাসযোগ্য হলে ঘটশিল্পীরা নিচে নেমে এসেছিল। এই কৃষ্টির প্রসার উত্তরে তুর্কিস্থান, পুবে ইরানের ভিতর দিয়ে বেলুচিস্থান পর্যন্ত অনুধাবন করা চলে, যদিও আফগানিস্থান এখন পর্যন্ত এ সম্বন্ধে নীরব। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বিবিধ সাক্ষ্যের তুলনামূলক বিচারের ফলে দুটি কৃষ্টিগত বিভাগ লক্ষিত হয়েছে: দক্ষিণাঞ্চলে রঙিন আলপনা কাটা হয়েছে প্রধানত বাফ্‌ জমির উপর, উত্তরে লাল জমির উপর। যেমন পুরাপ্রস্তর যুগের পাথুরে অস্ত্র, তেমনি নবপ্রস্তর পাত্রশিল্পের রং ও নক্‌শার বিশেষত্ব আজ এক জটিল শাস্ত্র সৃষ্টি করেছে। সাধারণের চোখে তা নিরস সন্দেহ নেই, তবে মনে রাখা দরকার যে এর সূত্র ধরে সে কালের জীবন সম্বন্ধে নানা তথ্য জানা যায়, বিশেষ করে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের চলা-ফেরা ও গতিবিধি সম্বন্ধে অনেক খবর মেলে, যেমন ইরানী আলপনা হঠাৎ সিন্ধুতীরের মাটির থেকে উদ্‌ঘাটিত হয়ে নির্দেশ দিতে পারে যে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যের যোগ ছিল; কোন্‌ সময়ে ছিল তা জানা যায় স্তরের বয়স থেকে, কোন্‌ রাস্তায় ব্যাপারীরা যাতায়াত করত তার ইঙ্গিত দেয়

পথে বিবর্জিত পাত্রের খণ্ড, বিশিষ্ট রং ও নক্‌শা পরিচয়-পত্রের কাজ করে, মামুলী পাত্রের খণ্ড এত খবর সরবরাহ করতে পারে না। শিল্পী যখন আপন খেয়ালে তুলি চালিয়েছে তখন সে যে তার দু দিনের ব্যবহার্যের গায়ে ইতিহাসের স্বাক্ষর রাখছে তা তার দুরন্ততম কল্পনারও বাইরে ছিল! বস্তুত মহেনজোদারো ও সুমেরের মধ্যে সে কালে যোগাযোগ না থাকলে সিন্ধু সভ্যতার তারিখ হয়তো আজও অনির্দিষ্ট থাকত। সুমেরী লিপির পাঠোদ্ধার হয়েছে, তার থেকে সে দেশের ইতিহাস সঠিক জানা আছে। সিন্ধুবাসীরা যে লিপির ব্যবহার করেছে তা এখনও পড়া সম্ভব হয় নি, কিন্তু তাদের তৈরি সীলমোহর পাওয়া গিয়েছে সুমেরের মাটিতে যার বয়স আমাদের জানা; সিন্ধু সভ্যতা যে অন্তত ২৩৫০ বিসি পর্যন্ত প্রাচীন তা জানা সম্ভব হয়েছে মেসোপটেমিয়ার শহরের সঙ্গে এই ধরনের সংস্পর্শের থেকে।

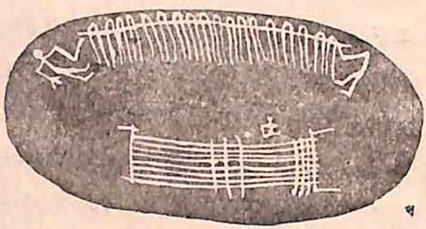
মানুষ শীত বা ক্ষত নিবারণে প্রথমে পশুচর্ম দিয়ে দেহ ঢেকেছে, পরে এই আবরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে আভরণ বা দেহসজ্জার উপকরণ, সাম্প্রতিক পুরা-প্রস্তর সমাজেই তার কিছুটা প্রমাণ আমরা পেয়েছি। পুরাপ্রস্তর ও মধ্যপ্রস্তর যুগে দড়ি ও সুতা তৈরি হয়েছে ঘাস, ছাল, শিকড় বা পেশীতন্তু দিয়ে। নবপ্রস্তর যুগে চামড়া বাকল বা লতাপাতার আচ্ছাদনের পাশাপাশি দেখা দিল প্রকৃত বস্ত্র, আর একটি যুগান্তকারী আবিষ্কারের ফলে। এই আবিষ্কারের প্রাণবস্তুটি হল গাছের বা পশুর থেকে সংগৃহীত সূক্ষ্ম আঁশ বা রোঁয়া। এই আঁশকে পাকিয়ে সুতা তৈরি এবং সেই সুতা বুনে কাপড় বানানো বস্ত্রশিল্পের দুটি প্রধান ও অপরিহার্য ধাপ। গরম দেশে পশুচর্ম আরামপ্রদ আচ্ছাদন নয় বলে হয়তো হালকা পরিধেয়ের দিকে নজর ছিল, এবং বয়নের ধারণাটা সম্ভবত এসেছে পাটি বা ঝুড়ির থেকে। বলা বাহুল্য, নবপ্রস্তর মানুষকে এ কাজের উপযুক্ত আনুষঙ্গিক যন্ত্রও উদ্‌ভাবন করতে হয়েছিল—প্রধানত টাকু ও তাঁত।

আজ আধুনিক কাপড়ের কলে এই যন্ত্র দুটির অনেক উন্নততর সংস্করণ ব্যবহার হয়, আজ মানুষ গবেষণাগারে নিজের খুশি মত কৃত্রিম আঁশ বানায়, কিন্তু ঐ দুই ধাপেরই মূলনীতিটি এখনও টিঁকে আছে এত হাজার বছর ধরে।

ভবিষ্যতে হয়তো কোনও দিন তাঁত বাদ দিয়ে পরিধেয় তৈরি হবে—তার ক্ষীণ ইঙ্গিত এখনই দেখা দিয়েছে—তা যদি হয় তবে সে দিন আমরা এই ক্ষেত্রে সত্যি করে নবপ্রস্তর যুগকে পিছনে ফেলব।

বোনা কাপড়ের জন্ম অবশ্য মধ্যপ্রাচ্যে। সে কালের কাপড় অনেক জায়গায়ই আজ টিঁকে নেই, ছবি দেখে বা টাকুর অংশ আবিষ্কার করে বোঝা যায় যে কাপড় ছিল, কিন্তু আঁশটি কি সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে। জারমোতে মাটির জিনিসের গায়ে কাপড়ের ছাপ দেখা গিয়েছে। কি জাতের আঁশ দিয়ে প্রথম মোটা কাপড়টি বোনা হয়েছিল কে জানে—হয়তো বা ছাগলের লোম—প্রাচীনতম নমুনা যার মিলেছে তা হল লিনেন ; মসিনা বা তিসি গাছের বাকল থেকে পাটের মত একে সংগ্রহ করা হয় (বাংলায় ভুল করে অনেকে একে শণ বলেন, কিন্তু আসলে তা অন্য জিনিস)। সে কালের মানুষ নিশ্চয় খাদ্যশস্যের পাশাপাশি ক্রমে এরও আবাদ আরম্ভ করেছিল। প্রাচীনতম কাপড়ের বয়স ৪৫০০ বিসি, পাওয়া গিয়েছে মিশরের ফাইয়ুম নামক জায়গায়। মিশরের মমিদের গায়ে যে কাপড় লেগে ছিল এ কালের বিজ্ঞানীরা তা পরীক্ষা করে লিনেন বলে চিনেছেন। মনে রাখতে হবে যে লিনেন সংগ্রহ করে পরিষ্কার করতে বেশ জটিল পদ্ধতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়। প্রায় ৫০০০ বছর আগে ইরাকের লোকে পশমের জামা পরত এও জানা


ক


খ

৪১নং চিত্র

ক, টাকুর ওজন, মাটির তৈরি ; খ, প্রাচীন মিশরী মৃৎপাত্রে তাঁতের ছবি, প্রায় ৪৪০০ বিসি।

আছে। পশম টিঁকে থাকে না বলে তার নিদর্শন বড় পাওয়া যায় নি, তবে ক্রমিক হিসাবে সম্ভবত লিনেনের পরেই তার স্থান ; নির্বাচনী প্রজনের পথে ভেড়ার উদ্ভবের কথা আগে বলেছি। প্রাচীনতম তুলাবস্ত্র পাওয়া গিয়েছে মহেনজোদারোতে (২৫০০ বিসি), কিন্তু সেই আঁশের উন্নত জাত দেখে

মনে হয় সিন্ধু উপত্যকায় তুলার চাষ এর আগেই আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। ভারত সম্বন্ধে হোরোডোটাস এক জায়গায় বলছেন যে সে দেশে গাছে এক রকম পশম ফলে যা মেষ-জাত পশমের চেয়েও সুন্দর ও উৎকৃষ্ট। রেশমও নবপ্রস্তর যুগে ব্যবহার হয়েছে। নবপ্রস্তর তাঁতীদের যন্ত্র প্রায় কিছুই টিঁকে নেই, কারণ তার অধিকাংশই ছিল কাঠের তৈরি। প্রথমে হাতে সুতা পাকিয়ে কাঠির গায়ে জড়ানো হত, এর থেকে টাকুর ধারণা মাথায় এল। পাথর বা পোড়া মাটির ছোট ছোট চাকা টাকুর মাথায় লাগিয়ে তার ওজন বাড়ানো হত, সেগুলি মধ্যপ্রাচ্যে ও য়োরোপে অনেক জায়গায় পাওয়া গিয়েছে। তাঁত যন্ত্রটি বেশ জটিল ও বৃহৎ ব্যাপার, কাপড় তৈরির এই কৌশলটি প্রথম যারা ভেবেছে, এবং তার পর কাঠামোটি খাড়া করে কাজে লাগিয়েছে তাদের বুদ্ধির শক্তি ও মৌলিকতায় বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। অনেক জায়গায় তাঁতের সাক্ষী হিসাবে পাওয়া গিয়েছে সঙ্গে ব্যবহৃত ওজন। সুইৎসার্লাণ্ডের তাঁতীরা লিনেনের কাপড়ে রঙিন সুতার নক্‌শাও বুনেছে।

এই বিবিধ মৌলিক আবিষ্কারের ফলে ব্যক্তির ও সমষ্টির জীবনে যে গুরুতর রূপান্তর ঘটেছিল তা বলা বাহুল্য, এ বার আমরা সে কালের সমাজ-চিত্রটির দিকে মন দিতে পারি। কি নিয়ে সাধারণ নর নারীর দিন কাটত, দেহের ও মনের শক্তি কি কাজে কি ভাবনায় ক্ষয় হত, কি ছিল তাদের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা এ সবের জ্ঞানেই একটা যুগের প্রকৃত পরিচয়, এরই মধ্যে তার নাড়ীর স্পন্দন, তাই ঐ মানবিক চিত্রটিই আমাদের অধিকতর কৌতূহলের বিষয়। কোনও এক কালের জীবনধারা নতুন আবিষ্কারের দ্বারা প্রভাবান্বিত বটেই, কিন্তু শুধু আবিষ্কারের বর্ণনার থেকে তার সম্পূর্ণ উপলব্ধি হয় না। সৌভাগ্যবশত, এই নবমানবরা পুরামানবদের মত আর অতটা অস্পষ্ট নয়, তাদের সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু জানি, আর অনেকটা অনুমান করে নিতে পারি অন্যদের দেখে।

আফ্রিকার কোনও কোনও অংশে, প্রশান্ত মহাসাগরে ও আমেরিকা মহাদেশে এখনও নানা জাতি বাস করে অথবা সে দিন পর্যন্ত করেছে যাদের সংসার পুরনো ছাঁচে ঢালা, নবপ্রস্তর কালের কয়েকটি আবিষ্কারকে ঘিরে

যাদের জীবন কাটে। চাষ, মাটির পাত্র, ঘষা কুড়াল, ঘর তৈরি ইত্যাদির কৌশল এরা সবাই জানে, যদিও কোথাও কোথাও কোনও কোনও বিষয়ে অজ্ঞানতা দেখা যায়, যেমন আমেরিকায় পশুপালন প্রায় অজানা ছিল, রেড ইণ্ডিয়ানদের প্রকৃত তাঁত ছিল না। এই সব সমাজের এবং প্রত্নতত্ত্বের সাক্ষ্য থেকে সে কালের একটা চিত্র মোটামুটি খাড়া করা চলে। আত্মীয়তার সূত্রে গাঁথা কয়েকটি পরিবার নিয়ে একটি বংশ, কয়েকটি বংশ নিয়ে এক একটি সম্প্রদায়—প্রাথমিক সমাজের এই গঠন আজ পর্যন্ত অনেক পৌরাণিক জাতির মধ্যে টিকে আছে। জমির মালিকানা বংশের, কখনও কখনও বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে সাময়িক ভাবে জমি ভাগ করে দেওয়া হয় চাষের জন্য। পশু চরাবার ভূমি সর্বজনীন। যারা প্রধানত কৃষক তাদের সমাজে স্ত্রীলোকের দান বেশী, তাই বংশের ধারা গণনা করা হয় মায়ের দিক থেকে, অর্থাৎ তারা মাতৃতন্ত্রের অধীন (matrilinear) ; প্রধানত পশুপালকদের মধ্যে একই কারণে পুরুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিপত্তি অপেক্ষাকৃত বেশী, তারা পিতৃতন্ত্রের বশবর্তী (patrilinear)। আজ সব 'সভ্য' সমাজই পিতৃতান্ত্রিক, কিন্তু এ দেশেই সাঁওতালদের মধ্যে এখনও মাতৃতন্ত্রের চিহ্ন দেখা যায়। প্রাচীন কালে দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড়রা মাতৃতন্ত্র মেনে চলত এবং পিতৃতান্ত্রিক আর্যরাও এ দেশে এসে তাদের দ্বারা এ বিষয়ে কিছুটা প্রভাবান্বিত হয়েছিল।

নবপ্রস্তর সমাজের সব শিল্পই গৃহশিল্প, আজ যাকে আমরা বলি কুটীর শিল্প। সব কাজেই পরিবারের সকলে অল্প বিস্তর হাত লাগাত এবং প্রথম দিকে সম্ভবত এক মাত্র স্ত্রী পুরুষের মধ্যেই কাজের কিছুটা স্পষ্ট ভাগাভাগি ছিল, স্বতন্ত্র পেশার তখনও সৃষ্টি হয় নি। আজকের উদ্যান-কৃষীদের সমাজে সাধারণত মেয়েরা খেত চষে, কুমারের কাজ করে, সুতা পাকায়, তাঁত চালায়, গহনা বা আনুষ্ঠানিক দ্রব্যাদি গড়ে, আর পুরুষরা চাষের আগে জমি পরিষ্কার করে, শিকার করে, মাছ ধরে, পালিত পশুর দেখাশোনা করে ; ছুতারের কাজ ও যন্ত্রপাতি তৈরিও তাদের হাতে। সে কালেও মোটামুটি এই ব্যবস্থা চলতি ছিল হয়তো।

কোনও কোনও কাজ যে দল বেঁধে সম্পন্ন করতে হত তাতে সন্দেহ নেই। বাস বা চাষের জন্য জঙ্গল সাফ করা, জল নিকাশের নালি তৈরি,

বন্যা কিংবা বন্য পশুর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা এ সবের মধ্যে নিশ্চয় কয়েকটি পরিবারের একযোগ হাত লাগাতে হত। মিশর ও পশ্চিম য়োরোপের গ্রামে দেখা যায় কুটীরগুলি এলোমেলো ছড়ানো নয়, বরং যেন সাম্প্রদায়িক কাজের সুবিধার মত করে সাজানো। য়োরোপের কোনও কোনও গ্রামে বিভিন্ন বাড়ির মধ্যে যোগাযোগের জন্য রাস্তা বা ঢাকা গলি দেখা যায়, কোনও কোনও গ্রাম খাদ বা বেড়া দিয়ে ঘেরা—পশু বা মানুষ-শত্রুর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে। এ সব কাজে সমষ্টির স্বার্থ সংশ্লিষ্ট, সুতরাং বিভিন্ন পরিবারের শ্রম একত্র নিয়োজিত হয়েছিল আশা করা যায়।

কুমার বা ছুতারের কাজে সাম্প্রদায়িক সহযোগিতা না হলেও চলে, কিন্তু আজও দেখা যায় আফ্রিকার গ্রামে মেয়েরা এক জায়গায় জড়ো হয়ে নিজের নিজের ঘটি কলসি বানায়, একে অন্যকে সাহায্য করে, সকলের কাজে একই ধারা বা ফ্যাশান। প্রাগৈতিহাসিক দিনের পাত্রেও তেমনি দেখা যায় এক গ্রামের এক ধারা, তার থেকে মনে হয় সে কালেও ঐ রকম সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থাই বোধ হয় প্রচলিত ছিল। হয়তো কোনও প্রয়োজনের তাগিদের চেয়ে বেশী জরুরী ছিল মেয়েলি গল্প গুজবের আকর্ষণ।

সে দিনের দৈনন্দিন ঘরকন্নার একটি চিত্র আমরা কল্পনা করতে পারি। এক বারোয়ারি আঙিনাকে ঘিরে কয়েকটি মাটির ঘর, এই আঙিনাই প্রধান কর্মক্ষেত্র। মেয়েরাই যেন বেশী ব্যস্ত—কেউ সুতা পাকাচ্ছে, কেউ গম ভাঙছে শিল নোড়াতে, কেউ রুটি সেঁকছে, কেউ দুধ দোহাচ্ছে বা পশম বার করছে ভেড়ার গা থেকে; এরই মধ্যে অবশ্য গল্প গুজব, বিভিন্ন ঘরের খবর আদান প্রদান চলছে। শিশুরা নানা রকম দুষ্টামিতে ব্যস্ত—একটা ছাগল ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছে উঠানে, কেউ হয়তো তার কান ধরে টানছে, ধমক খাচ্ছে মায়ের কাছে। দু একটি বৃদ্ধ ঝিমাচ্ছে কোণে বসে। পুরুষরা কেউ ঘরের ছাত মেরামত করছে ডালপালা আর কাদা দিয়ে, অথবা কাটারিতে শান দিচ্ছে; কেউ হয়তো শিকারে বেরিয়েছিল সকাল বেলা. এখন ফিরছে একটা হরিণ কাঁধে করে, ছেলেরা দৌড়ে গিয়েছে তাকে অভ্যর্থনা করতে, শিকারীর কুকুরটিও লেজ নাড়ছে খুশিতে। আরও দূরে গরু চরছে মাঠে, তার পিছনে সোনালি শস্যখেত চকচক করছে দুপুরের রোদে।

পরিবারের এক প্রান্তে শিশু আর এক প্রান্তে বৃদ্ধ, এই চিত্রে দুইয়েরই উল্লেখ করেছি ; ইতিহাসের এই পর্যায়ে এরা যেন বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে। এ যাবৎ শিশুদের থেকে কোনও কাজ পায় নি মানুষ, বড় না হওয়া পর্যন্ত তারা পরিবারের বোঝা হয়েই থেকেছে। কিন্তু শিশুরা খেতের থেকে আগাছা তুলতে পারে, শস্যনাশক পশু পাখির বিরুদ্ধে পাহারাদারি করতে পারে, ছাগল ভেড়া চরাতে পারে মাঠে, সুতরাং এ সময়ে তারা কাজে লেগেছিল নিঃসন্দেহে।

ইতিপূর্বে চল্লিশের বেশী বাঁচত কম লোকই, কিন্তু এই সময়ে বৃদ্ধ বৃদ্ধারা পরিবারের স্বাভাবিক অঙ্গ হয়ে উঠল, ঘরে ঘরে প্রায়ই দেখা যেত তাদের। জীবনযাত্রা সহজ হলে যে লোকসংখ্যা বাড়ে এবং আয়ু দীর্ঘতর হয় তা আগে দেখেছি আমরা। নবপ্রস্তর বিপ্লবের পরেও যে বয়স্ক ব্যক্তির সংখ্যা অনেক বেড়ে উঠেছিল তার অনেক প্রমাণ মেলে। তা ছাড়া জন্মহার বৃদ্ধি পেয়েও লোকসংখ্যাকে স্ফীত করেছিল নিশ্চয়। শিশুদের কার্যকারিতা এবং কর্মীর প্রয়োজনও জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটা কারণ হয়ে থাকতে পারে। আজও আমাদের চাষীরা খেতে না পেলেও ছেলে চায় মাঠে কাজ করবার জন্য।

নবপ্রস্তর যুগে লোক বৃদ্ধির প্রমাণ মেলে দেশে দেশে, যেমন মিশরে নীল নদীর উপত্যকায় বর্ধিষ্ণু গ্রামের সংখ্যা বা উত্তর য়োরোপের সমতল ভূমিতে কবরের সংখ্যা থেকে। য়োরোপে এ যুগের দৈর্ঘ্য পুরাপ্রস্তর যুগের ১০০ ভাগেরও কম, তবু সেখানে এরই মধ্যে যত কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে আগের তুলনায় তা কয়েক শো গুণ বেশী। মিশর ও পশ্চিম এশিয়াতেও এ যুগের বহু কঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়েছে। পুরাপ্রস্তর ঘাঁটির তুলনায় নবপ্রস্তর সম্প্রদায় সংখ্যায় বেশী ছিল, আকৃতিতে বড় ছিল।

তবু আমাদের মাপে সে কালের গ্রাম যে খুব বড় ছিল না তা অনুমান করা যায় কবরের সংখ্যা দেখেই। আধুনিক উদ্যানকৃষীদের মধ্যেও যুবকরা মাঝে মাঝে নিজেদের স্ত্রী পুত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ে, নতুন জায়গায় গিয়ে নতুন গ্রামের পত্তন করে ; প্রথমত, সাবেক গ্রামে ঘরের কাছাকাছি আবাদী জমি ফুরিয়ে গিয়ে থাকতে পারে, নতুন ভূমিতে নিজের আঙিনাতেই ফসল ফলানো চলবে ; তা ছাড়া, প্রবীণদের কর্তৃত্ব এড়িয়ে চলতে চেয়েছে নবীনরা

সব দেশে সব কালে। যাযাবর রাখাল বা শিকারীদের কাছে দূর দেশের গল্প শুনেও হয়তো ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছা করেছে। স্থায়ী চাষ ব্যবস্থার আগে হয়তো এই রকম কারণে নবপ্রস্তর বসতি কোনও দিন খুব বাড়ে নি। য়োরোপ ও পশ্চিম এশিয়ার গ্রামের আকৃতি সাধারণত দেড় থেকে সাড়ে ছয় একর; অন্যত্র ২০-২৫ কি মোটে আট দশটি ঘর পাওয়া গিয়েছে এক একটি বসতিতে। বসতির আকৃতি কিন্তু ক্রমেই বেড়ে চলেছিল; ৫০০০ বিসিতে এক একটি গ্রামে বোধ হয় দু শো'র বেশী লোক বাস করত না, পরবর্তী হাজার বছরে লোকসংখ্যা দশ গুণ বেড়ে গ্রামগুলি প্রায় শহর হয়ে দাঁড়াল। সেই পরিণতির আলোচনা পরে, কিন্তু একটা বিষয় এখানে লক্ষ করা চলে: যদিও আজ আমাদের শহরে কোটি লোকের বাস, তবু সমাজের মৌলিক উপাদান এখনও সেই গ্রাম—প্রায় দশ হাজার বছর আগে যা প্রথম গড়ে উঠেছিল।

গ্রামের প্রধান বা সমাজের সর্দার জাতীয় কোনও ব্যক্তির স্পষ্ট কিছু চিহ্ন পাওয়া যায় না নবপ্রস্তর যুগের প্রথম ভাগে। প্রাসাদোপম গৃহ বা কবরে অত্যধিক আয়োজন কোথাও চোখে পড়ে না। অধিকাংশ বাড়ি মাটি, নল-খাগড়া, হোগলা, কাঠের খুঁটি বা পাথর দিয়ে তৈরি—খুব বেশী কিছু না হলেও সাবেক কালের গুহা, তাঁবু বা ডাল ছালের ছাউনির চেয়ে বেশী স্থায়ী বা আরামদায়ক। প্রতি গ্রামের বৈশিষ্ট্য ছিল আর একটি ঘর—শস্য মজুদ রাখবার গুদাম। মৃতদেহের হাঁটু সাধারণত ভাঁজ করা, তার সংলগ্ন সরঞ্জামের মধ্যে বিবিধ অস্ত্রও পাওয়া যায়, তা শিকারের বা যুদ্ধের দুইই হতে পারে। যুদ্ধ বিগ্রহের কোনও প্রত্যক্ষ চিহ্ন পাওয়া যায় না। সংঘর্ষ ছাড়া বিভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে যোগাযোগের আর একটি পথ হল বাণিজ্য, এ ক্ষেত্রেও নবপ্রস্তর যুগের শেষাংশের তুলনায় প্রথম অংশে প্রমাণ কম, তার একটা কারণ এই যে এ কালের গৃহস্থালি অনেকটা স্বয়ংসম্পূর্ণ, দৈনন্দিন প্রয়োজন মোটামুটি নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক গণ্ডির মধ্যেই মেটানো সম্ভব হয়েছে। তা সত্ত্বেও কাছাকাছি কেন্দ্রের মধ্যে যোগাযোগের কিছু কিছু চিহ্ন প্রায় সর্বত্রই উদ্ঘাটিত হয়েছে, যথা আলংকারিক বা 'অপ্রয়োজনীয়' সামগ্রীর আদান প্রদানে। মিশরের বসতিতে ভূমধ্য ও লোহিত সাগর থেকে ঝিনুকাদি খোলক আমদানি হত, জার্মেনিতে ভূমধ্যসাগরী খোলকের তৈরি বালা

পাওয়া গিয়েছে। এই ধরনের আদান প্রদানের থেকে কখনও কখনও প্রকৃত বাণিজ্য গড়ে উঠেছে হয়তো—যেমন মিশর সিসিলি পোর্তুগাল ইংলণ্ড ফ্রান্স বেলজিয়াম সুইডেন ও পোলাণ্ডে নবপ্রস্তর কালে ব্যবহৃত চকমকির খনি আবিষ্কৃত হয়েছে আগেই বলেছি, তার থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে চকমকির রপ্তানি চলত সে সময়ে। এদের তৈরি কুড়ালও বহু দূর পর্যন্ত পাওয়া যায়, এ সব পণ্যের পরিবর্তে সম্ভবত এরা শস্য এবং মাংস আদায় করেছে। শুধু চকমকি নয়, ধারালো ফলা তৈরির উপযুক্ত অন্যান্য পাথরও দূর দূরান্তরে বয়ে নেওয়া হয়েছে, এমন কি মাটির পাত্রও যে গ্রামে গ্রামে অদল বদল হত তার চিহ্ন কোথাও কোথাও পাওয়া যায়। আজকের নবপ্রস্তর সমাজেও নিজেদের মধ্যে বাণিজ্য দেখা যায়, কখনও কখনও বেশ দূর পর্যন্ত; মেলানেশিয়া ও নিউ গিনির কোনও কোনও গ্রাম মৃৎপাত্র সৃষ্টিতে বিশেষত্ব অর্জন করেছে, এরা দূর দূরান্তরে, এমন কি সাগর পেরিয়ে পর্যন্ত নিজেদের মাল পাঠায়।

এই গেল প্রত্যক্ষ বস্তুময় সংসারটার খবর, কিন্তু নেপথ্যে মানুষের বরাবরই ছিল এক পরোক্ষ জগৎ, আত্মার জগত। অবশ্য প্রথমটির প্রয়োজনেই দ্বিতীয়টির উৎপত্তি—আজও আমরা ঠাকুর দেবতার কাছে মানত করি এটা সেটা পাওয়ার জন্য, যদিও এই অদৃশ্য অগোচর জগতের থেকে আজ সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভাবনার দর্শনও গড়ে উঠেছে। সে কালের ধ্যান ধারণায় চিন্ময়ের তুলনায় মৃন্ময়ের উপাদান স্বভাবতই বেশী ছিল। মানুষের মনে নানাবিধ সংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস যে সূচিত হয়েছে লক্ষাধিক বছর আগে তার ইঙ্গিত আমরা আগে পেয়েছি, তখন থেকে এগুলি তার দলগত জীবনে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত এবং আজও আমরা মুক্ত নই এদের প্রভাব থেকে। নবপ্রস্তর কালে সমাজের জটিলতা ও আকৃতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুরাপ্রস্তর কালের এই বৈশিষ্ট্য যে আরও ব্যাপক হয়ে উঠবে—বিশেষ করে চাষ আবাদকে ঘিরে—তাই আমরা আশা করি। এই করলে এই হয়, এই অনুষ্ঠানের ফলে অমুক দেবতা তুষ্ট হয়ে বৃষ্টি দেবেন, তাতে ভাল ফসল ফলবে, কিংবা এই কৃত্যের ফলে ভাল বাছুর হবে, গরুতে বেশী দুধ দেবে, এমনি অনেক সংস্কার নিশ্চয় গড়ে উঠেছিল, তার সঙ্গে অধিষ্ঠাতা দেবতা অপদেবতার সংখ্যাও। অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি শিলাবৃষ্টি বন্যা শস্যের রোগ ইত্যাদির ফলে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা সর্বদা

ছিল মনে, বজ্র বিদ্যুতের মত এ সবের অন্তরালবর্তী শক্তিদেরও তোষণ করা দরকার। পরবর্তী কালের সুসভ্য জ্ঞানী গ্রীসীয়রা পর্যন্ত ভয় করত এক লক্ষ্মীছাড়া দানবকে যার কাজ ছিল পোড়াবার সময়ে মাটির পাত্র ফাটিয়ে দেওয়া, একে দূরে রাখবার উদ্দেশ্যে তারা চুলার গায়ে এক ভয়ংকর মুখোস লাগিয়ে রাখত। নবপ্রস্তর সমাজে জাদুতে বিশ্বাস ও নির্ভরতা যে প্রবল ছিল তা কিছুটা অনুমান করা যায় পৃথিবীর সব দেশের পুরাণে উপকথায় তার প্রভাব লক্ষ করে। কোথাও মায়াদণ্ডের চালনায় ফসল ফলে উঠেছে (মধ্য আমেরিকা), মন্ত্রবলে বৃষ্টি আনা তো সহজ (দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর), এমন কি মড়া পর্যন্ত জেগে উঠেছে (আইসল্যাণ্ড); কঠিন কাজ সম্পন্ন করতে এক ভাইয়ের নির্ভর নিজের বাহুবল, আর এক ভাইয়ের জাদু (মিশর)। জাদু অবশ্য অনিষ্টও করতে পারে—পারসীক পুরাণে দেখা যায় অসত্যের আধিপত্য কালে ধর্ম যখন মরে গেল, তখন যজ্ঞে পবিত্র উৎসর্গ বলে কিছু ছিল না, অপদেবতাদের থেকে শেখা জাদু ও কুহক ফলিয়ে মানুষ নানা পাপ কাজ করে চলল, ভাল কাজ করতে হত গোপনে। জাদু ও মন্ত্রের ক্ষমতা প্রসঙ্গে ভারতীয় পুরাণ কাহিনীর থেকে উল্লেখ বাহুল্য। এই সব সাহিত্যের আজ যা চেহারা তা হয়তো এক দুই হাজার বছরের বেশী প্রাচীন নয়, কিন্তু কোন্ অতীতে তাদের উন্মেষ তা কে বলতে পারে। ভারতেই অনেক ভাবধারার আমদানি ইরান থেকে, তাদের অঙ্কুর দেখা দিয়েছে আরও দূর দেশে দূর কালে—সে কথার আলোচনা আছে পরবর্তী অধ্যায়ে।

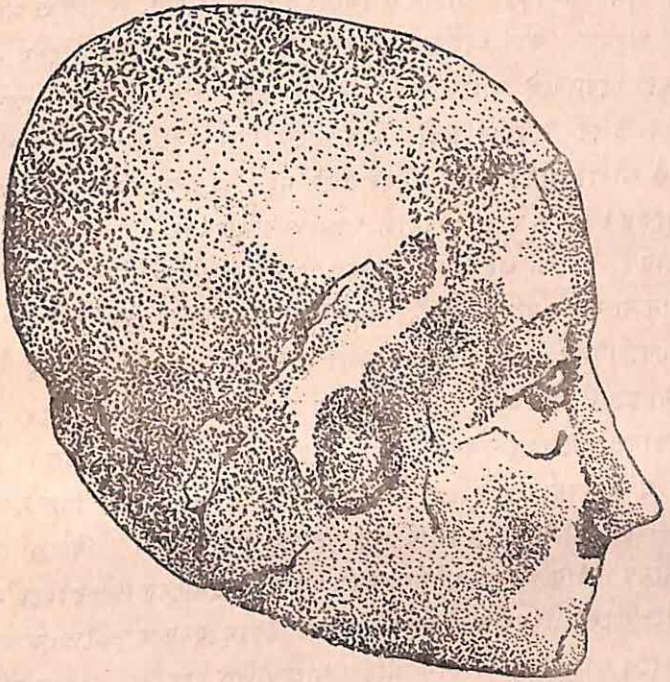
তথাকথিত জননী দেবীর কথা আগে বলেছি, পাথর বা গজদন্তে তৈরি এই ছোট ছোট উদ্ভট স্ত্রীমূর্তিগুলি পুরাপ্রস্তর কালেই দেখা দিয়েছিল (৩২খ নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। নবপ্রস্তর যুগের বসতিতে ও কবরে এই মূর্তি খুব বেশী দেখা যায়, প্রায়ই মাটির তৈরি। সত্যিই যদি উর্বরতার প্রতীক হয় এই বিগ্রহ তবে কৃষি আবিষ্কারের পরে তার সম্ভ্রম ও মূল্য যে আরও অনেক বেড়ে গিয়ে থাকবে তাই আমরা আশা করতে পারি; এর আগে হয়তো মানুষ-মাতার হয়ে তাকে প্রার্থনা জানানো হত, এখন পৃথিবী-মাতার হয়ে। কখনও কখনও মনে হয় যেন এই মাতৃ মূর্তির থেকেই পরবর্তী ঐতিহাসিক কালে ইরাক সিরিয়া গ্রীসের পূজিতা দেবীমূর্তিরা উদ্ভূত। পুরুষের প্রতীক হিসাবে শুধু পাথর বা

মাটির লিঙ্গ দেখতে পাওয়া যায় আনাতোলিয়ায় (তুরস্ক), য়োরোপের বল্‌কান অঞ্চলে ও ইংলণ্ডে।

ইরাকে মাটির ঘট পাওয়া গিয়েছে যার গলায় আঁকা স্ত্রীমুখ, চোখের নিচে তিনটি দাঁড়ি টানা, বংশগত বা দলগত সাংকেতিক উলকি হতে পারে তা। মিশরে যে এ কালে টোটেম-তন্ত্র প্রচলিত ছিল তার কিছু ইঙ্গিত মেলে। বিভিন্ন পল্লী বিভিন্ন টোটেম-চিহ্ন ধারণ করত, ঘটের গায়ে এ সব সংকেত আঁকা হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক মিশরে মৃতের সঙ্গে ব্যবহারের উপকরণ ও অস্ত্র, খাদ্য পানীয় ও প্রসাধন সামগ্রী ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ পশু ও বস্তুর ছবি আঁকা ঘট ঘটিও রাখা হত; পরবর্তী ঐতিহাসিক কালে এ সব চিত্র সমাধি গৃহের দেওয়ালে আঁকা হয়েছে এবং সঙ্গের লিখিত পাঠ থেকে উদ্দেশ্যটি জানা যায়—তা হল ঐ সব চিত্রিত বস্তু যাতে পরজীবনে মৃতের সেবায় লাগে তার ব্যবস্থা করা। ছবির সাহায্যে ব্যবহারিক উদ্দেশ্য সাধনের এই চেষ্টা পুরাপ্রস্তর কালের গুহাচিত্রকে মনে করিয়ে দেয়। পিতৃ-পুরুষের তুষ্টির সযত্ন চেষ্টাও পুরাতনের ধারাই বজায় রেখেছে।

কবরের প্রসঙ্গে এইখানে বলা যেতে পারে যে অধিকাংশ নবপ্রস্তর সম্প্রদায়ে এই প্রথাই প্রচলিত ছিল। য়োরোপের কোথাও কোথাও আজকের মত গোরস্থান দেখা যায়; প্রাচীনতম কবরখানা মধ্যপ্রস্তর যুগের সৃষ্টি। নবপ্রস্তর যুগের শেষের দিকে মৃতদেহের সঙ্গে খাদ্য পানীয় হাতিয়ার সরঞ্জাম ইত্যাদি দেওয়া হত। মধ্যপ্রাচ্যের লোকের সম্ভবত কবরখানা ছিল না, বাড়ির নিচে বা পাশে গোর দেওয়া হত। প্রথম আমলের জেরিকোতে মেঝের তলায় শুধু মাথাটি সমাধিস্থ করা হয়েছিল; কোনও কোনও খুলির গায়ে পলস্তারা লাগিয়ে চেহারা পুনরুদ্ধার করবার চেষ্টা হয়েছে, এক জায়গায় যেন রং দিয়ে গোঁফও আঁকা হয়েছে; চোখের খোপে খোপে ঝিনুক বসানো। হয়তো পরিবারের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মাথা এগুলি; ব্যক্তিবিশেষের প্রতিকৃতি গড়বার চেষ্টা এই প্রথম দেখা যায় মানুষের সমাজে। নবপ্রস্তর আমলের কবরে আগের তুলনায় অনুষ্ঠান আয়োজন আরও বেশী লক্ষিত হয়; ভূমধ্য সাগর এলাকায় মাটি খুঁড়ে মৃতের ঐহিক গৃহের মত একটি গৃহ তৈরি হত তার নিচে, পশ্চিম ও উত্তর য়োরোপে এগুলি আগে প্রকাণ্ড পাথরে তৈরি হত, তার পর ভূগর্ভে

ন্যস্ত করা হত ; এতে কি পরিমাণ সাম্প্রদায়িক শ্রমের প্রয়োজন তা সহজেই অনুমেয়, কিন্তু যারা এতখানি কষ্ট করত তাদের মনে সম্ভবত এমন



৪২নং চিত্র

জেরিকোতে প্রাপ্ত এই খুলির উপর পলস্তারা দিয়ে মুখটি পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল।

আশা ছিল যে ভূমির গর্ভে যাদের রাখা হল ভূমিজাত ফসলের উদ্গমে তারা সাহায্য করবে।

নবপ্রস্তর সমাজের আচার অনুষ্ঠানে বারে বারেই আমরা দেখি যে নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও শিল্পকৌশল বৃদ্ধির পাশাপাশি জাদু এবং সাংকেতিক ক্রিয়া কলাপে বিশ্বাস ও নির্ভরতা কমে নি, বরং বেড়েছে। ভূমধ্য সাগর অঞ্চলে কবজ জাতীয় বস্তুর চিহ্ন মেলে ; এক জায়গায় অতি ক্ষুদ্র পাথরের কুড়াল ছিদ্র করে গলায় ঝোলানো হত, বোধ হয় এই মৌলিক হাতিয়ারের শক্তি আহরণের উদ্দেশ্যে।

ভূমির উর্বরতা ও শস্য উৎপাদনের সঙ্গে নর নারীর যৌন মিলন নানা দেশে নানা কালে আনুষ্ঠানিক ভাবে সংশ্লিষ্ট হয়েছে। পশ্চিম এশিয়া ও ভূমধ্য সাগর এলাকার প্রাচীন জাতিদের পুরাণ-কাহিনী, বিশ্বাস ও আচার থেকে অনুমানে করা হয়েছে যে প্রথম দিকে এক জোড়া বিশেষ মেয়ে পুরুষের মধ্যে এই সাংকেতিক বিবাহ অনুষ্ঠিত হত; পুরুষটি শস্যের বা সাধারন ভাবে উদ্ভিদের প্রতীক বলে তাকে বলা হয়েছে শস্যরাজ। শস্য বা বীজকে আবার মাটির নিচে ফিরে গিয়ে নতুন করে জন্ম নিতে হয়—অর্থাৎ শস্যরাজের হত্যা ও তার জায়গায় তরুণ ও বলিষ্ঠ আর এক উত্তরাধিকারীর অধিষ্ঠান। হয়তো এই রকম কোনও ধারণার থেকেই বীজ বপনের সঙ্গে রক্তদান বা মানুষ বলির সম্পর্ক কোনও উপায়ে নবপ্রস্তর মানুষের মনে প্রথম স্থান পেয়েছিল; এর ক্ষীণ চিহ্ন আজও অনেক জায়গায় লক্ষ করা যায়। শিশু বা বৃদ্ধের নিস্তেজ রক্তে যে উর্বরতার প্রার্থনা সফল হত না, প্রাণ দিতে হত কোনও যুবকের (কখনও বা যুবতীর) তা অবশ্য স্বাভাবিক। কিন্তু এদের প্রতি হিংসা তো দূরের কথা বরং প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধাই ছিল সকলের মনে—এরা রাজা ও দেবতার যুগ্ম প্রতিভূ অনেকটা। নিষ্ঠার সঙ্গে, প্রবীণদের বিধান অনুসারে, নানা রকম আচার অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে দশের কল্যাণে এদের উৎসর্গ করা হত প্রতি বছর, কোন্ দেবতার তুষ্টিতে কে জানে।

কালে কালে এই অনুষ্ঠান আরও সাংকেতিক হয়ে উঠে থাকতে পারে; স্বর্গের লোভেও সহজে কেউ মর্ত্যলোক ত্যাগ করতে চায় না, এমন হতে পারে যে নিজের প্রাণ বিসর্জনের পরিবর্তে কোনও বন্দীর হত্যা বা হয়তো শুধু মন্ত্র পাঠ দিয়ে সমাজকে সন্তুষ্ট করে শস্যরাজ ক্রমে ঐশ্বরিক রাজা হয়ে উঠেছে, ঐতিহাসিক কালের শুরুতে যাদের দেখতে পাই আমরা। এ সম্বন্ধে জোর করে কিছু বলা যায় না, কিন্তু মিশর ইরাক ও গ্রীসে ঐতিহাসিক রাজারাই উর্বরতা-অনুষ্ঠানের অনেক অংশ সম্পন্ন করেছে। আজকের অনেক প্রাচীন সমাজেও এমন এক জন সর্দার দেখা যায় যে বংশ পরম্পরায় সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী, কি জাদু বিদ্যায় কি যুদ্ধে। নবপ্রস্তর যুগের পশ্চিম য়োরোপে কোনও কোনও গ্রামের বিশেষ গৃহ বা সমাধির আকৃতি বা অবস্থিতি থেকে অনুরূপ প্রধানের অস্তিত্ব অনুমান করা হয়েছে। কিন্তু এর প্রমাণ মোটেই স্পষ্ট বা সর্বজনীন নয়।

উর্বরতা-অনুষ্ঠান বা ফলন-যজ্ঞের যে সব কিংবদন্তী আজ পুরাণ-কাহিনীতে পাওয়া যায় তার সঙ্গে নাচ গান প্রায়ই অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। রক্তপাত বা বলির চিহ্ন বেশী না থাকলেও যুবক বা যুবতীর (বিশেষত কুমারী কন্যার) প্রধান অংশ, এবং তাদের মধ্যে যৌন আকর্ষণের ইঙ্গিত অনেক ক্ষেত্রে লক্ষিত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ পশ্চিমে পুএব্লো ইণ্ডিয়ানদের বাস, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার প্রসিদ্ধ প্রাচীন সভ্যতাগুলির (অ্যাজ্‌টেক, টল্‌টেক, মায়া) সঙ্গে এদের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। এই আদিবাসীদের এক শাখা জুনি নামে পরিচিত, এদের কৃষ্টি বহু পুরা কাল থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় অপরিবর্তিত। এদের সনাতন জীবনধারা ও ধর্মের কেন্দ্রস্থলে যে শস্যটি তা হল মকাই; এই অপরিহার্য উপজীব্যটিকে ঘিরে গড়ে উঠেছে অনেক সুন্দর প্রাচীন উপাখ্যান, উদাহরণ স্বরূপ তার একটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া যেতে পারে এখানে। বহু পুরা কালে এদের পিতৃপুরুষদের কাছে দেখা দিয়েছিল শিশির ও ভোরের দেবতা পেইয়াতুমা, তার হাতে বাঁশী, তার সঙ্গী কুয়াশা, সঙ্গে এনেছিল সাতটি শ্বেতবসনা পালিতা কন্যা, আকাশের তারার চেয়েও তারা মনোমুগ্ধকর, হাতে তাদের জাদু-কাঠি। মানুষের হাতে এদের দান করে সেই সঙ্গে সাতটি মকাই গাছও রেখে গেল দেবতা।

তার পর প্রতি বছর শস্য-ঋতুতে সে দিনের পিতৃপুরুষরা এদের জন্য বানিয়ে দিত চিরসবুজ তরুর কুঞ্জ, রাত্রিতে আগুন জ্বালত তার সামনে। শুরু হত ঢাক ও ঝুমঝুমির বাদ্য, প্রবীণরা ধরত গান। তালে তালে এগিয়ে পিছিয়ে সাত কন্যা সাত শস্যতরুকে ঘিরে নাচত তরঙ্গায়িত নাচ, শেষে একে একে আলিঙ্গন করত গাছগুলিকে, সেই সেই মুহূর্তে আগুনের সাত রং বা মূর্তি প্রতিফলিত হত দিকে দিকে। তার পর ভোরের কুয়াশা যখন নেমে আসছে তখন কুঞ্জে গিয়ে জাদু-কাঠি, রঙিন পালক আর মনোরম কোমল পোশাক পরিহার করে তারা গ্রামবাসীদের মধ্যে ফিরে আসত।

কিন্তু কোনও কোনও যুবকের কানে ভেসে আসত আরও মনোহর কিসের এক সুর, অনেক দূরে বজ্র-পর্বতের ও পার থেকে। সেই ধ্বনির অনুসরণ করতে করতে গ্রামবাসীদের দুই দূত একদা এসে উপস্থিত হল পেইয়াতুমার নিজেরই ঘরে, রামধনু-গহ্বরে। তারা দেখলে সুর আসছে

বাঁশীর থেকে, আর তার তালে তালে নাচছে আর সাতটি অপরূপ কন্যা, তাদের দেখলে মনে হয় যেন আগের সেই সাত কুমারীর ছায়া পড়েছে জলে। দূতের হাতে বাঁশীবাদকদের দান করলে পেইয়াতুমা, তারা ফিরে এল গ্রামে, এ বার সেই আগের কন্যারা নাচল বাঁশীর সুরে। বাজাতে বাজাতে সুরকারদের চোখ কামাতুর হয়ে উঠল; তা দেখে কন্যারা চোখ নামালে, কিন্তু গ্রামের তরুণদের হৃদয় চঞ্চল হল, নর্তকীরা ঘুরে ঘুরে কাছে এলে তারা তাদের কাপড় ধরে আকর্ষণ করতে লাগল। অবশেষে তারা এবং বাদকরা লাফিয়ে উঠে চীৎকার করে নর্তকীদের অনুসরণ করলে, শ্বেতবসনাদের গায়ে লাগল তাদের কলুষিত হাতের ছোঁয়া। তবু তারা শেষ করলে নাচ, আলিঙ্গন করলে সাত তরু—কিন্তু ভোরের সঙ্গে সঙ্গে বসন ভূষণ ত্যাগ করে কুয়াশার আড়ালে কোথায় উধাও হয়ে গেল। কুয়াশার পরদা ভেদ করে দেখা দিল পেইয়াতুমা, বাঁশীবাদকদের নিয়ে চলে গেল সে।

কন্যাদের অন্তর্ধানে সকলে বিহ্বল ও মুহ্যমান হয়ে পড়ল; এরা না হলে শস্যতরু বাড়বে না, ফসল না ফললে মানুষের দেহে মাংস শুকিয়ে যাবে। সকলের অনুরোধে একে একে ঈগল, বাজপাখি আর দাঁড়কাক আকাশে উঠল, কিন্তু অনেক খুঁজেও শস্যকুমারীদের দেখা পেলে না। অবশেষে আবার পেইয়াতুমাই ত্রাণ করলে, কিন্তু তার আগে দরকার হল গ্রামবাসীদের পাপমোচন। তার পর নতুন অভিযানে পেইয়াতুমার সঙ্গী হল এমন চারটি যুবক যাদের দেহ কখনও কলুষিত হয় নি। সাত কন্যার দেখা পেল তারা গ্রীষ্ম দেশে এসে, প্রজাপতি আর পাখির রাজ্য সে দেশ। কন্যারা ফিরে এল, আবার নাচল সারা রাত ধরে গান ও বাজনার তালে তালে, নিজের নিজের শস্যতরুকে ঘিরে দু হাত তুলে আকাশের দিকে বৃদ্ধির বাণী জানালে, তার পর আলিঙ্গনের মাধ্যমে, কি এক রহস্য-পথে, নিজের দেহবস্তু সঞ্চারিত করলে, সেই সঙ্গে আগুন তার সাত মূর্তি দেখালে একে একে। তার পর গভীর রাতের অন্ধকারে চির কালের মত মিলিয়ে গেল মেয়েরা। ভোরের আলোয় দেখা গেল শুধু পেইয়াতুমাকে, সে জানালে শস্যকুমারীরা যা দান করে গিয়েছে তারই ফলে ফসল বাড়বে প্রতি বছর, কিন্তু এর পরে শস্য-ঋতুতে গ্রামকুমারীদের থেকে সাত জনকে বেছে নিতে হবে, তারাই নাচবে বাঁশী আর ঢাকের তালে তালে। সাতকন্যা বিদায় নিল, কারণ

মানুষের মধ্যে থাকলে মানুষের ভালবাসা, মানুষ-শিশুর আকাঙ্ক্ষার মধ্যে তারা হারিয়ে ফেলত বীজ-বৃদ্ধির মহত্তর আকাঙ্ক্ষা ; মানুষেরই মত গ্রাহক মাত্র হয়ে পড়ত তারাও, মরে যেত প্রাণদায়ক দৈব শক্তি।

সেই থেকে মকাইর বীজ অতি পুণ্য বস্তু ; কত চাঁদ আসে যায়, এই বীজ রক্ষা করা হয় সযত্নে। অবশেষে একদা তাকে মাটিতে নিমজ্জিত করা হয় শ্রদ্ধা সহকারে, যেমন প্রিয়জনকে সমাধিস্থ করে সমাজের লোকে। বীজের অন্তরে সাড়া দেয় সেই আদি-মাতাদের প্রাণবস্তু। শিশির ও ভোরের দেবতা অঙ্কুরকে উজ্জীবিত করে তার নিশ্বাসে, কাল ও ঋতুর দেবতা সম্পূর্ণ করে বৃদ্ধি, শেষে তাপ-দেবতা দেয় পরিপক্ব পূর্ণ যৌবন। আর সাত কন্যা নাচে তাদের পাশে পাশে, দু হাতের ভঙ্গিতে আকাশের দিকে প্রণোদিত করে।…

চাষ আবাদ ও প্রয়োজনীয় উদ্ভিদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিবিধ সম্রান্ত দেব দেবীর দেখা পাওয়া যায় দেশে দেশে। বস্তুত এমন মতও দেখা যায় যে নব-প্রস্তর যুগের প্রথম দিকে দেব দেবীরা ছিল ভূমি বা পৃথিবীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, আকাশ দেবতারা এসেছে পরে কাংস্য যুগে। জুনিদের যেমন পেইয়াতুমা, তেমনি মধ্য আমেরিকাতেই অ্যাজ্‌টেক সভ্যতার দেব শ্রেষ্ঠ কেট্‌জ্রালকোট্‌ল মানুষকে প্রথম ফসল মকাই দান করেছিল বলে কথিত আছে, তার আগে তাদের এক মাত্র নিরামিষ খাদ্য ছিল মূল। উদ্ভিদ জগতে মৃত্যু ও পুনরুজ্জীবনের প্রতীক মিশরের ওসাইরিস, ব্যাবিলনের ত্যামাজ্, গ্রীসের অ্যাডোনিস। আয়ার্ল্যাণ্ডে প্রাচীন সেল্‌টিক ধর্মের প্রধান আরাধ্য ছিল প্রাণ ও বৃদ্ধির যত শক্তি, তাই তাদের পুরাণ-কথার কেন্দ্রস্থলে কৃষি ও ফলনের স্থান ; সেল্‌টিকের সঙ্গে গ্রীসীয় ও বৈদিক পুরাণের ঘনিষ্ঠ যোগ, কারণ সবগুলিই একই ইন্দো-য়োরোপীয় কাণ্ডের শাখা। আবাদ ও ফলনের শক্তি যে কত রকম হতে পারে তার একটি দৃষ্টান্ত রোমীয় পুরাণ-পরী পোমোনা, সে শুধু ফলতরুর ধাত্রী, শস্য, ফুল, এমন কি বন্য গাছের সঙ্গে পর্যন্ত তার কোনও সম্পর্ক নেই—বস্তুত গ্রীসীয় ও রোমীয় পুরাণের প্রকৃতি-কন্যাদের মধ্যে এক মাত্র সেই বোধ হয় বনের প্রতি বিরূপ ; তার ভাল লাগে ফলগাছের নানা রকম যত্ন ও শুশ্রূষা—তাদের ছাঁটা, কলম তৈরি করা, শিকড়ের কাছে মাটি আলগা করে দেওয়া, জলের ব্যবস্থা করা, পোকার নাশ

করা ইত্যাদি। পলিনেশীয়রা দুটি বিভিন্ন দেবতার সৃষ্টি করেছে আবাদী ও অনাবাদী খাদ্যতরুর জন্য। পুরাকালের কবিদের কল্পনায় যে দেব দেবীরা কত সহজে মূর্তি পেত তার একটি সুন্দর উদাহরণ মেলে অ্যাজ্‌টেক পুরাণে; প্রথমে ছিল আকাশ পিতা ও পৃথিবী মাতা, সে প্রসব করলে এক চকমকির ছুরি, শূন্যে নিক্ষিপ্ত সেই ছুরি নিমেষে পরিণত হল ১৬০০ পার্থিব দেবতায় (এদের দাসত্ব করতেই পরে মানুষের সৃষ্টি)। এই হারে দেব দেবীর সৃষ্টি করে চললে সংখ্যাটা যে দেখতে দেখতে ৩৩ কোটি ছাড়িয়ে যাবে তা আর আশ্চর্য কি!

পোমোনার তুলনায় মিশরের সূর্যদেব রা অবশ্য অনেক বড়, তার উপাসনা মন্ত্রেও দেখা যায়—"তুমিই মানুষকে দিয়েছ ফলতরু আর গরুকে দিয়েছ ঘাস"। মানুষ যখন ফলের আবাদ করতে আরম্ভ করলে তখন ক্রমশ এই সব কাহিনী কল্পনা অঙ্কুরিত হয়ে উঠল তার সরল মনের উর্বর জমিতে।

বিভিন্ন জাতির দেব দেবীর মধ্যে সাদৃশ্য আমরা আগে লক্ষ করেছি, এই প্রসঙ্গে আর একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ আমাদের ইন্দ্র ও জাপানী পুরাণের সুসা-নো-য়ো। পৃথিবীর মাটিতে যা কিছু ফলে তা জাপানী সূর্য-দেবীর যত্নে, ফসল-উৎসবের জন্য মানুষ যে সব মন্দির গড়ে তার প্রতি তার বিশেষ মমতা, কিন্তু তার দুরন্ত দুর্মতি ভাই সুসা-নো-য়ো সব কিছু ভণ্ডুল করে দেয়। এ দিকে ইন্দ্রের ক্ষমতাও অনেকটা অনুরূপ। বৈদিক দেবতাদের মধ্যে তার প্রধান স্থান, ঋগ্‌বেদে তার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। বজ্র বিদ্যুৎ তার প্রহরণ, তার দ্বারা সে অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি সৃষ্টি করে, জল বায়ু নিয়ন্ত্রণ করে; নিজের খুশিতে সে মানুষের খাদ্য ভণ্ডুল করে দিতে পারে, তাকে চটালে প্লাবন বয়ে যায়, আবার খুশী করলে মেঘ দীর্ণ করে সে যথা পরিমাণ জল মুক্ত করে। সুসা-নো-য়ো আর ইন্দ্র দুয়েরই বিশেষত্ব লম্বা উড়ন্ত দাড়ি—বস্তুত এই দাড়ি কেটেই শেষ পর্যন্ত ঐ জাপানী দেবতার ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছিল। আর ইন্দ্রকে ঠাণ্ডা করত কৃষ্ণ; ব্রজবাসীরা উপাসনা ত্যাগ করায় ইন্দ্র রেগে প্লাবন আনলে কৃষ্ণ তাদের রক্ষা করে। গোকুলে নন্দ প্রমুখ প্রবীণরা ইন্দ্র-পূজার আয়োজন করছে, কারণ জল না হলে কৃষি হয় না, কৃষি বিনা দুর্ভিক্ষ। কৃষ্ণ বললে এই সব বৈদিক দেবতার

পূজায় কিছু হয় না, প্রকৃতির স্বভাবেই মেঘ হয়, তার থেকেই বারিপাত ও সাফল্য, ইন্দ্রের কি ক্ষমতা ?

রজসা চোদিতা মেঘা বর্ষত্যম্বুনি সর্বতঃ।
প্রজাস্তৈরেব সিধ্যন্তি মহেন্দ্রঃ কিং করিষ্যতি ॥
(ভাগবত পুরাণ, ১০,২৪,২৩)

পণ্ডিতরা বলেন ভাগবত পুরাণের রচনাকাল হয়তো যিশুর আগে—খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের পরে কখনও নয়। এমন কথা এ যুগের বিজ্ঞানীর মুখে আশা করা যায়, অথচ তা স্থান পেয়েছে এই দেশেরই ভক্তিপ্রধান গ্রন্থে, সেই কারণে কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও বিষয়টির উল্লেখ করা গেল এখানে।

কিন্তু মানুষের মন বোধ হয় কখনও শুধু দেব দেবী, সংস্কার ও লোকাচারের গণ্ডির মধ্যে সম্পূর্ণ আবদ্ধ থাকতে চায় না, নবপ্রস্তর যুগের এত বড় একটা বিপ্লবের পর তা থাকা নিশ্চয় আরও কঠিন হয়ে পড়েছিল। উপরে যা বর্ণিত হল তা যদি হয় ধ্যানের জগত তবে এ বার একটি জ্ঞানের জগতও ধীরে ধীরে উন্মোচিত হচ্ছিল, এক নতুন আলোয় ধরা দিচ্ছিল প্রকৃতি। আজ যাকে আমরা উদ্ভিদ বিদ্যা ভূতত্ত্ব রসায়ন জ্যোতিষ ইত্যাদি বলি তার অনেক কিছু মানুষকে শিখতে হয়েছে নিতান্ত প্রয়োজনের দায়ে ; গম বা যবের খেতে আগাছা কি করে চেনা যায়, কোন্ মাটিতে ফসল ভাল হবে, কোন্ কাদা ঘটি বাটি তৈরির উপযুক্ত, তার সঙ্গে আর কি মেশালে ভাল হয়, কোন্ ঋতুতে ফসল বোনা দরকার, কখন বৃষ্টি নামবে, কবে শস্য পাকবে—এই সব জিজ্ঞাসার মধ্যে অনেক শাস্ত্রের বীজ নিহিত। ঋতুচক্রের হদিস রাখতে হল আকাশের তারার দিকে চেয়ে, বিশেষ বিশেষ নক্ষত্র মণ্ডলের অবস্থান লক্ষ করে। প্রতি বছর একই দিনে নীল নদীর দু কূল ভেসে যেত, এরই থেকে সৌর ক্যালেনডার বা বর্ষ-পঞ্জীর জন্ম—সে কাহিনী পরবর্তী অধ্যায়ের বিষয়। এতে এক দিকে যেমন প্রকৃত জ্যোতিষ বিদ্যার সূচনা হয়েছে, অন্য দিকে তেমনি বিবিধ গ্রহ নক্ষত্র ভাগ্যনিয়ন্তা বলে গণ্য হয়েছে—কেউ আবির্ভূত হয়ে জানায়

এ বার বীজ বোনার সময় এসেছে, কেউ দেখা দিলে নদীতে বান ডাকে, ঘর বাড়ি খেত খামার ভেসে যায় (আজও আমরা কথায় বলি গ্রহের ফের!)। অন্তরীক্ষের পটে একই ঘটনার থেকে গণিতকার ও গণৎকারের জন্ম—এমনি করেই বিজ্ঞান ও কুসংস্কার মানুষের চলার পথে তার দুই পাশে চলেছে। নতুন আবিষ্কারের ফলও যে সর্বদা ভাল হয়েছে তা নয়; কৃষির রহস্য উদ্‌ঘাটনের পর প্রাথমিক উন্মাদনায় মানুষ প্রকৃতির স্বাভাবিক সাম্য (balance of nature) ব্যাহত করেছে, নির্বিচার চাষের ফলে ভূমি-ক্ষয় হল, বৃহৎ ভূখণ্ড মরুতে রূপান্তরিত হল। সংগ্রাহক বৃত্তির শেষে উৎপাদক বৃত্তির শুরুতে জমির প্রতি যে মমতা ও মালিকানার দাবি গড়ে উঠল পরবর্তী যুগে তা ব্যক্তি পরিবার পল্লী দেশ ইত্যাদির গণ্ডির মধ্যে কত সংঘর্ষ ও যুদ্ধ বিগ্রহের কারণ হয়েছে, আজও হচ্ছে। বস্তুত নবপ্রস্তর যুগের অনেক আবিষ্কার যেমন এখনও আমাদের সভ্যতার ভিত্তি, তেমনি সে কালে যে সমাজ-ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়েছিল আধুনিক জগতে তা নিতান্ত অকুলান প্রতিপন্ন হলেও আজও আমরা মূলত তার ঊর্ধ্বে উঠতে পারি নি।

১৬। ইতিহাসের দরজায়

নবপ্রস্তর যুগের দ্বিতীয় এবং শেষ পর্ব মানুষকে ইতিহাসের উষায়, সভ্যতার দরজায় পৌঁছে দিল। এই সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্য শহরের উৎপত্তি ও লিপির আবিষ্কার—এগুলি যে অবশ্য অনিবার্য সামাজিক ঘটনা-সংযোগে এবং স্বাভাবিক ঐতিহাসিক পরিণতির ফলে দেখা দিয়েছে, বিধাতার আকস্মিক দানের মত নয়, তা ক্রমশ প্রকাশ পাবে এই অধ্যায়ে। ইতিহাসের এই পর্বে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে (প্রায় হাজার বছর) কয়েকটি অতি মূল্যবান আবিষ্কারের ফলে সভ্যতার উপাদান প্রায় সবই মানুষের হাতে এসে গেল—তামা, চাকা, চক্রযান, যান বাহনে পশুর নিয়োগ, কুমারের চাক, পোড়া ইট, সীলমোহর। আসলে এর পরে বহু শতাব্দী ধরে নবপ্রস্তর যুগের জ্ঞান বিদ্যা ভাঙিয়েই মানুষ খেয়েছে।

মোটামুটি বলা চলে এই অধ্যায়ের সঙ্গে, অর্থাৎ ৩০০০ বিসির প্রায় হাজার বছর আগে, তাম্র যুগের সূচনা। আজ ধাতুহীন জীবন আমাদের কল্পনার অতীত, প্রায় সব দৈনন্দিন কাজেই কোনও না কোনও ধাতুর অংশ আছে, তাদের মধ্যে প্রধান অবশ্য লোহা, কিন্তু সে যুগে ধাতুর ব্যবহার শুরু হয়েছিল লোহা নয় তামা দিয়ে। লোহার ব্যাপক প্রয়োগ অনেক পরে, ১৪০০ বিসির কাছাকাছি, লৌহ যুগ সেই সময় থেকেই ধরা হয়। এর আগে লোহা যে জানা ছিল না তা নয়, ৩০০০ বিসির কিছু পুরনো মিশরী কবরে লোহার দানা পাওয়া গিয়েছে, কিন্তু তা স্বাভাবিক লোহা, উলকার

থেকে সংগৃহীত। এর অল্প পরে ইরাকে খনিজ লোহা রাসায়নিক উপায়ে উদ্ধৃত হয়েছে মাঝে মাঝে, কিন্তু প্রকৃত লৌহশিল্প গড়ে উঠতে সভ্য যুগের প্রায় ১৫০০ বছর কেটে গেল—যদিও কোনও কোনও শাস্ত্র অনুসারে (যেমন গ্রীসীয় বা ইহুদী-খৃষ্টান পুরাণ) লোহা দিয়েই সব কিছুর শুরু, লৌহাস্ত্র দিয়ে গাছ কেটে চাষের জমি তৈরি হয়েছে, শহর গড়ে উঠেছে।

পৃথিবীর যে অর্ধশুষ্ক অঞ্চলে নবপ্রস্তর যুগের উন্মেষ তাম্র যুগের সব আবিষ্কারের সূত্রপাত তারই কোথাও না কোথাও, সে অঞ্চল মোটামুটি এক দিকে নীল নদী ও ভূমধ্য সাগরের পূর্ব এলাকা, অন্য দিকে সিরিয়া ইরাক ইরান অতিক্রম করে হয়তো ভারতের সিন্ধু উপত্যকা পর্যন্ত প্রসারিত। কেন এই অঞ্চলেই মানুষের এত দ্রুত অগ্রগতি এই প্রশ্নের উত্তরে অনেক কারণ দেখানো যেতে পারে। যথা, নানাবিধ আবিষ্কারের উপযুক্ত কাঁচামাল এ সব দেশে হাতের কাছে ছিল, সামাজিক সহযোগিতার প্রয়োজন ও পুরস্কার ছিল, জলপথে চলাচলের সুবিধা থাকায় যোগাযোগ সহজ হয়েছিল, আকাশ নির্মেঘ ও পরিষ্কার থাকায় গ্রহ নক্ষত্রের সাহায্যে কাল গণনা এবং তার ফলে গণিত ও জ্যোতিষের চর্চা গড়ে উঠতে পেরেছিল।

এ অঞ্চলের দু একটি বিশেষ কেন্দ্রের সংক্ষিপ্ত ক্রমিক পরিচয় দিলে এ সময়ের বিভিন্ন আবিষ্কারের কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে। আগের অধ্যায়ে পশ্চিম ইরানের সিয়াল্‌ক উপনিবেশের উল্লেখ করেছি, যার টিলার নিচে সতেরটি স্তর উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। প্রাচীনতম বসতিতে দেখা যায় মামুলী মাটির ঘর, কিন্তু তাদের ধ্বংসাবশেষের উপরে বাড়ি তুলতে ব্যবহার হয়েছে রোদে শুকানো ছাঁচে তৈরি কাঁচা ইট। তখনই কিন্তু মাটির পাত্র পোড়াবার জন্য বিশেষ চুলা বানানো হয়েছে। তামার ব্যবহার দেখা যায়, কিন্তু তা স্বাভাবিক ধাতু, হাতুড়ি পিটে গড়া—আগুনে গলিয়ে খনিজ বস্তুর থেকে আহৃত নয় বা তরল অবস্থায় ঢালাই করা নয়; তামা তখনও সম্ভবত 'উৎকৃষ্ট পাথর' ছাড়া কিছু নয়। যন্ত্রপাতি ও উপকরণের প্রধান উপাদান হাড়, পাথর ও কিছুটা আমদানি করা অবসিডিয়ান (এই বস্তুটি জমাট লাভা, কাঁচের মত দেখতে, গাঢ় রং), পারস্য উপসাগরের খোলকও

পাহাড় পেরিয়ে আমদানি করা হয়েছে দেখা যায়। উপাদানের অনুপাতে খাদ্য সংগ্রহ কমে এসেছে, ঘোড়া এসেছে মানুষের ঘরে।

প্রত্নবিদরা যে তৃতীয় কৃষ্টি উদ্‌ঘাটিত করেছেন তাতে রীতিমত তামা গলিয়ে কুড়াল ও অন্যান্য উপকরণ তৈরি হয়েছে, যদিও ধাতুটি তখনও বোধ হয় কৌতূহলের বস্তু, হাড় ও পাথরই বেশী চলতি। কুমারের কাজ অনেক সহজ ও সুন্দর হয়েছে চাকের আবিষ্কারে। সোনা ও রূপার আমদানি হচ্ছে, গাঢ় নীল মণি লাজাবর্দ (ল্যাপিস ল্যাজ্রিউলাই) আসছে উত্তর আফগানিস্থান থেকে। লোকে সীলমোহর ব্যবহার করছে সম্পত্তির স্বত্ব বোঝাতে। চতুর্থ পর্যায়ে দেখা যায় এক দল 'শিক্ষিত' লোকের বাস, ৩০০০ বিসির কাছাকাছি স্থানান্তর থেকে এসে তারা সেখানে 'সভ্যতা' প্রতিষ্ঠিত করেছে।

ইরানের সিয়াল্‌ক কেন্দ্রে যে ধরনের কৃষ্টিগত অভিব্যক্তি দেখা গেল, সিরিয়া ও অ্যাসিরিয়ার রঙ্গস্থলেও মানুষের মিছিল তার অনুরূপ চিহ্ন রেখে গিয়েছে। পৌরাণিক মেসোপটেমিয়ার উত্তরাংশ অ্যাসিরিয়া, মোটামুটি তার সীমা হল মোসুলের সংলগ্ন টাইগ্রিস ও জ্রাব নদীর মধ্যবর্তী ত্রিকোণটি; নিচের দিকে ব্যাবিলনিয়া—সামারার দক্ষিণে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল; তার আবার দুই ভাগ—দিওয়ানিয়ার উত্তর অংশ অক্কদ নামে পরিচিত, দক্ষিণ অংশ সুমের (৩৮ নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। ঐতিহাসিক কালের শুরুতে মেসোপটেমিয়ার বিভিন্ন অংশে সভ্যতার কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল—উপরোক্ত নামগুলি আজ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ—কিন্তু তার আগেই ঐ সভ্যতার আভাস পাওয়া গিয়েছিল নবপ্রস্তর মানুষের নানাবিধ অগ্রগতির মধ্যে।

নাটকের প্রথম অঙ্কে, সিরিয়ার সাগর সৈকত থেকে আরম্ভ করে টাইগ্রিসের পূর্বে নিনেভে পর্যন্ত অঞ্চলে টিলাগুলির নিম্নতম গ্রামগুলিতে লক্ষিত হয় যে 'নবপ্রস্তর' কৃষ্টি তার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা নেই। কিন্তু দ্বিতীয় অঙ্কে যাদের আবির্ভাব (এদের নাম দেওয়া হয়েছে হালাফীয় [Halafians]) তারা প্রধানত পাথর ও হাড় ব্যবহার করলেও ধাতুর সঙ্গে তাদের পরিচয় ছিল, যদিও ধাতুবিদ্যা জানা ছিল না। নানা রঙের নকশা এঁকে এরা মৃৎপাত্রের শোভা বাড়াত এবং সেগুলি পোড়াতে যে বিশেষ

চুলা ব্যবহার হত তার তৈরির মধ্যে অনেকখানি পেশাদারী কৃতিত্ব দেখা যায়। তাবিজ বা কবচে বিশেষ ক্ষমতাপূর্ণ বস্তুর প্রতিকৃতি চোখে পড়ে, এদের কোনও কোনওটা সীলমোহর হিসাবে ব্যবহার হয়ে থাকতে পারে। স্থানীয় দেব দেবীর জন্য পূজাঘর বা দেউলও বানিয়েছে গ্রামবাসীরা। (প্রায় এই সময়েই দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ার প্রথম বাসিন্দারাও এরিদুতে দেউল প্রতিষ্ঠিত করেছে, তার কথা পরে বলব; এখানে এক প্রসিদ্ধ সুমেরী শহর গড়ে উঠেছিল।)

তৃতীয় অঙ্কে দেখা যায় আর এক নতুন সম্প্রদায়ের (আল-উবাইদ) আবির্ভাব। প্রাক্তন কৃষ্টির সঙ্গে সব সম্পর্ক যে এদের ছিন্ন হয় নি তা মনে হয় এই দেখে যে সাবেক দেউলগুলি আরও বড় করে তৈরি হল একই স্থানে। এক জায়গায় দেখা যায় একই আঙিনাকে ঘিরে তিনটি দেউল, তার মধ্যে সবচেয়ে বড়টির দৈর্ঘ্য ৪০ ফুট, প্রস্থ ২৮ ফুট; রোদে শুকানো ইট দিয়ে তৈরি, বাইরের দেয়াল চিত্রিত। ধাতু গলিয়ে ছাঁচে জিনিস বানাবার বিদ্যা জানা ছিল, যদিও স্থানীয় পাথরের ব্যবহার কমে নি, ধাতু সংগ্রহের নিয়মিত চেষ্টাও দেখা যায় না। মাটির পাত্র তখনও হাতে তৈরি।

এর পরে অ্যাসিরিয়ার কিছু কিছু গ্রাম ছোট খাটো শহরে পরিণত হল (এদের থেকেই উত্তর কালে প্রখ্যাত নিনেভে শহরের উৎপত্তি)। উপরোক্ত দেউলগুলি এখন প্রকৃত মন্দিরে রূপান্তরিত, তিনটিতে মিলে দৈর্ঘ্যে প্রস্থে এখন ৫৭ × ৪৩ ফুট জায়গা দখল করেছে, পোড়া ইটের তৈরি, ভিতরে বেশ কয়েকটি ঘর। চাকার রহস্য যে জানা হয়ে গিয়েছে তা বোঝা যায় শুধু কুমারের কাজ থেকে নয়, মাটির তৈরি ঢাকা এবং খোলা গাড়ির প্রতিকৃতি থেকেও। তামা এমন কি কাঁসার বস্তুও বিরল নয়, যদিও কুড়াল, কাস্তের দাঁত ও অন্যান্য হাতিয়ার পর্যন্ত সাধারণ পাথর ও অন্যান্য প্রাচীন উপাদানেই তৈরি। সংসারটি এখনও মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ, যদিও বিলাসের বস্তু কিছু কিছু আমদানি চলছে—আফগানিস্থানের লাজাবর্দ, সুমের থেকে ছোট খাটো তৈরী জিনিস। এর পরের অঙ্কে, প্রায় ইতিহাসের শুরুতে অ্যাসিরিয়ার সমাজ নতুন রূপ নিল ধাতু ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তুর আমদানির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। পঞ্চাঙ্ক প্রাগৈতিহাসিক নাটক শেষ হল, নতুন যুগের

অভিনেতা এলেন শক্তিশালী রাজা আর পুরোহিত, তাদের রঙ্গমঞ্চ জমকালো শহর।

বলা বাহুল্য, এ সব অঞ্চলের এত রকম নতুন আবিষ্কার পৃথিবীর অন্যত্র পৌঁছাতে অল্প বিস্তর সময় লেগেছে। ৩০০০ বিসির আগেই ভূমধ্য সাগরের পূর্ব এলাকায়, তুর্কিস্থানে এবং ভারতে অন্তত তারা প্রবেশ করেছে। চীন ও ব্রিটেনে পৌঁছাতে লাগল আরও প্রায় হাজার বছর। প্রশান্ত মহাসাগর ও সাহারার দক্ষিণ দিকের আফ্রিকায় এ সব বিদ্যার প্রবেশ প্রায় সাম্প্রতিক কালে। আমেরিকা মহাদেশ সম্বন্ধেও তা বলা চলে, পেরু ও মেকসিকোর দুটি কেন্দ্র (যেখানে কাঁসার কাজ হত) বাদ দিলে। যুক্তরাষ্ট্রের লেক সুপেরিয়র অঞ্চলে তাম্রবাহী পাথরের বিস্তীর্ণ স্তর আছে, আদিবাস ইণ্ডিয়ানরা তার থেকে ধাতু বার করেছে, জিনিস বানিয়ে বহু দূর পর্যন্তী চালান দিয়েছে; কিন্তু তাদের প্রকৃত ধাতুশিল্পী বলা চলে না—তামা স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল, পাথর গরম করে তার গায়ে জল ঢেলে তাকে ফাটিয়ে সেই ধাতু উদ্ধার করা সহজ হয়েছে। দ্বিতীয়ত ধাতুকে গলানো হয় নি, পিটিয়ে মাল তৈরি হয়েছে। যাই হক, সম্প্রতি তেজী-কারবন মেপে নাকি জানা গিয়েছে যে এ সব পাথর থেকে ধাতু উদ্ধার হয়েছে ৪০০০ বছর আগে।

সভ্যতার প্রাক্‌কালে ঘন ঘন নতুন আবিষ্কারের ধাপে ধাপে মানুষের অগ্রগতির কিছুটা ক্রমিক পরিচয় আমরা পেলাম। এ বার এই আবিষ্কারগুলির আর একটু বিশদ পরীক্ষা দরকার। নবপ্রস্তর যুগের সূচনা কৃষি ও পশুপালন দিয়ে, যুগটি শেষ হওয়ার আগেই এই দুই ক্ষেত্রের প্রায় সব মৌলিক সম্ভাবনা মানুষের কাছে ধরা পড়ে গিয়েছিল—এই গুরুতর যুগ্ম বিদ্যা দিয়েই আলোচনার শুরু করা যেতে পারে।

জল বিনা মানুষের অবশ্য কোনও দিনই চলে নি, কিন্তু নবপ্রস্তর যুগে এই প্রয়োজন যে অনেক গুণ বেড়ে গিয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়। মাটির ঘর বানাতে পাত্র ও উপকরণ গড়তে, ঘরের পশুকে খাওয়াতে, রান্না ও ঘরকন্নার যাবতীয় কাজে তো জল দরকারই। কিন্তু সবচেয়ে বেশী দরকার খেতের তৃষ্ণা মেটাতে। জলের সাংবৎসরিক সুব্যবস্থা না হলে স্থায়ী বসতি গড়া

সম্ভব নয়। প্রথম গ্রামগুলি তাই পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার নদী ঝরণা ঝোরাকে আশ্রয় করে দূরে দূরে গড়ে উঠল। কিন্তু বসুন্ধরার এই অঞ্চল খুব সুজলা নয়, গ্রামের আকৃতি ও লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমস্যা কোথাও কোথাও কঠিন হয়ে উঠল। যদি যথেষ্ট বৃষ্টি হয় তো শস্য ফলবে এই ব্যবস্থার উপর আর নির্ভর করা চলে না। নীল নদীর ধারে যারা বাস করেছে তাদের জমিতে শুধু জল নয় সারালো পলি নিয়মিত পৌঁছে দিত বার্ষিক প্লাবন সে কথা আগে বলেছি; কিন্তু এক দিন ফিতার মত সরু ঐ জমিটুকু তাদের পক্ষে নিতান্ত অকুলান হয়ে পড়ল। নীল নদীর বন্যা ও পলি যে মিশরীদের কাছে কতখানি মূল্যবান ছিল তার ইঙ্গিত মেলে শেক্স-পিয়রের কাব্যে; মিশর দেখে এসে অ্যানটনি বলছেন অক্টেভিয়াসকে :

> "The higher Nilus swells
> The more it promises; as it ebbs, the seedsman
> Upon the slime and ooze scatters the grain,
> And shortly comes to harvest."

প্রকৃতি যদি নিজের হাতে না দেয় তো বুদ্ধি করে আদায় করে নিতে হবে এই নীতি কাজে লাগিয়ে মিশরী চাষীরা কৃত্রিম সেচের ব্যবস্থা করলে; দল বেঁধে নালি কেটে তারা জল নিয়ে এল শুকনো কঠিন ভূমিতে, জল নিষ্কাশন করলে জলাভূমির থেকে, বাঁধ বানালে বন্যাকে বাগ মানাতে। উপত্যকার নিম্নাংশ তখনও জলো জঙ্গলে পরিপূর্ণ, নলখাগড়া আর হোগলার প্রকাণ্ড ঝোপে ঝাড়ে বন্য জন্তুর বাস। জঙ্গল সাফ করে এদের নিশ্চিহ্ন করতে হল। এতখানি যৌথ উদ্যোগের পিছনে কি পরিমাণ প্রয়োজনের তাড়না ছিল তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু এরই ফলে পরে কায়রো ও অন্যান্য শহরকে ঘিরে সুদীর্ঘ সুউন্নত সভ্যতা গড়ে উঠতে পেরেছে; এই সভ্যতার গঠনে অবশ্য বাণিজ্য-লক্ষ্মীর দান কম নয়, কিন্তু তিনিও এসেছেন নদী বেয়ে।

সভ্যতার সঙ্গে নদীর যেন অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক! এ কালের টেম্স সেইন টাইবার গঙ্গার কূলে কূলে যেমন মহানগর, সে কালেও তেমনি নীল টাইগ্রিস ইউফ্রেটিস সিন্ধুনদকে আশ্রয় করে প্রথম শহর মাথা তুলেছে (৪৬ নং চিত্র

দ্রষ্টব্য)। দক্ষিণ ইরাকের ঐ নদী জোড়ার মধ্যভাগ তখন ছিল জলাভূমি, অল্প দিন আগেই পারস্য উপসাগরে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত। নদীর দু পাশে কিন্তু তৃষ্ণার্ত বন্ধ্যা প্রান্তর। অর্থাৎ জল না সরালে বা জল না আনলে চাষ অসম্ভব। বছরে সাত মাস যখন তখন বন্যা ভীষণ উপদ্রব করে, বাকি সময়টা নিরস ভূমি সূর্যতাপে পুড়ে ছাই হয়। গ্রীষ্মে প্রচণ্ড তাপ, শীত কালে কনকনে ঠাণ্ডা। এর চেয়ে নির্দয় বিরুদ্ধ দেশ কল্পনা করা শক্ত, তবু এখানেই গড়ে উঠেছিল প্রাচীনতম এক সভ্যতা। এ ক্ষেত্রেও এই সুমেরী সভ্যতার পূর্বপুরুষরা জঙ্গল কেটে হিংস্র জন্তু মেরে সেচ শোধন করে চাষ বাসের ব্যবস্থা করেছে মিশরীদের মত। কিসের লোভে কোথা থেকে এসেছিল তারা? সম্ভবত শিকারযোগ্য পশু পাখি মাছ আর খেজুরের আকর্ষণ উচ্চভূমির থেকে নদীতীরে ডেকে এনেছিল তাদের। সে যাই হক, বিরাট শহর ও বিখ্যাত সভ্যতার ভিত এরা অক্ষরে অক্ষরে গড়েছে পলিমাটির কাদার উপরে শুধু নলখাগড়া বিছিয়ে!

বিভিন্ন দেশের পুরাণে এক মহাপ্লাবনের গল্প পাওয়া যায়, তার উৎপত্তি এইখানে এই সময়ে, এবং এই প্লাবনের ধ্বংসের উপর শহর ও সভ্যতা গড়ে উঠেছে এমন মত প্রকাশ করেছেন এইচ জি ওএল্‌স ও তাঁর সহলেখকরা তাঁদের 'প্রাণবিজ্ঞান' গ্রন্থে। এই অনুমান অনুসারে ৫০০০-৪০০০ বিসির মধ্যে কোনও এক বছর সম্ভবত টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিসের উৎসদেশে অতি মাত্রায় তুষারপাত হয়েছিল, তার ফলে সে বারে বান ডেকেছিল অসাধারণ, ভাসিয়ে নিয়েছিল খেত খামার গরু ভেড়া ঘর বাড়ি। ক্রমে লোকমুখে বাড়তে বাড়তে তা বিশ্বগ্রাসী মহাপ্লাবনের আকার ধারণ করলে —যেমন চিরদিন হয়, বুড়োদের মুখে আজও গল্প শোনা যায় সেই সে সালে ৬০ বছর আগে যেমন বৃষ্টি হয়েছিল তেমন আর দেখা যায় নি! বিখ্যাত প্রত্নবিদ সার লিওনার্ড উলি দক্ষিণ মেসোপটেমিয়াতে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ আর (Ur) রাজ্যের উদ্‌ঘাটনে এক প্রবল বন্যার প্রমাণ পেয়েছেন ৪০০০ বিসিরও আগে; প্রমাণটি হল মাটির নিচে আট ফুট পুরু পলির স্তর, এই স্তরে মানুষের ব্যবহৃত বস্তু কিছু পাওয়া যায় নি, কিন্তু নিচে উপরে সম্পূর্ণ বিভিন্ন দুই কৃষ্টির চিহ্ন—নিচে হাতে গড়া মাটির ভাণ্ড ও চকমকির হাতিয়ার (আল উবাইদ কৃষ্টি, যার নাম আগে করেছি), উপরের মৃৎপাত্র

চাকে তৈরি, যন্ত্রপাতির উপাদান ধাতু (সুমেরী কৃষ্টি)। কি পরিমাণ জল দাঁড়ালে যে আট ফুট কাদা জমতে পারে তার থেকে বন্যার কোপ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না, সার লিওনার্ডের প্রমাণ অনুসারে নিমজ্জিত ভূমির মাপ ৪০০ ×১০০ মাইল, কিন্তু স্থানীয় লোকের চোখে তা নিশ্চয় বিশ্বগ্রাসী প্রলয়ের চেহারা নিয়ে এসেছিল। গ্রামাঞ্চল ও মাটির ঘর সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়ে থাকলেও শহরের কিছু কিছু টি*কেছে হয়তো ; সুমেরী কিংবদন্তীরও সেই রকম ইঙ্গিত, তাতে আরও বলে যে এই প্রলয় কাণ্ডের পরে দক্ষিণ থেকে বিদেশীরা এসেছে সমুদ্র পথে, সঙ্গে এনেছে নানা বিদ্যা—কৃষি, ধাতু ও লিপি—"তখন থেকে নতুন উদ্‌ভাবন আর কিছু হয় নি"। সার লিওনার্ডের মতে প্রত্নতত্ত্বের সাক্ষ্য থেকেও মনে হয় বিপর্যস্ত আশাহত অবশিষ্ট কয়েকটি মানুষের মধ্যে নতুন আগন্তুকরা বিধ্বস্ত দেশ আবার গড়ে তুলেছে। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে আমেদাবাদ জেলার লোথাল শহর সে কালে সিন্ধু-সভ্যতার অন্তর্গত ছিল বলে সম্প্রতি প্রমাণিত হয়েছে এবং মনে হয় এরও ধ্বংস হয়েছিল মহাপ্লাবনে।

আশ্চর্য এই যে বিভিন্ন দেশের পুরাকাহিনীর মধ্যে এক সর্বগ্রাসী মহাপ্লাবন সম্বন্ধে প্রায়ই অদ্ভুত মিল দেখা যায়—কয়েকটি কিংবদন্তী এখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করা যেতে পারে। ঐ জোড়া নদীর দেশে প্রচলিত উপাখ্যানটি ব্যাবিলনীয় মানবপিতা উত-নপিশ্‌তিম বলছে নিজের মুখে। একদা দেবতারা মনস্থ করলে ঝড় আর প্লাবনের আঘাতে পৃথিবীর থেকে মানুষের বংশ নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে হবে ("মানুষের হট্টগোলে ঘুম অসম্ভব হয়ে আসছে," বললে এক জন), পরে এই সিদ্ধান্ত সামান্য পরিবর্তন করে ঠিক হল শুধু উত-নপিশ্‌তিম ও তার স্ত্রীকে বাঁচতে দেওয়া হবে। ইয়া দেবতা তার কাছে আবির্ভূত হয়ে খবরটি জানালে, বললে সব কিছুর মায়া ত্যাগ করে এ বার প্রাণ বাঁচাবার জন্য এক নৌকা বানাও। পিচ আর শিলাজতুর আঠা দিয়ে এ*টে ১২০ হাত লম্বা এক নৌকা বানালে সে, তার পর শস্যের ভাণ্ডার আর নিজের পরিবার নিয়ে তাতে চড়ে বসল। পশু পাখিরা জোড়ায় জোড়ায় এল। তখন শামাশ দেব এসে জানালে যে সে দিন সন্ধ্যায় মহাপ্লাবন শুরু হবে, এবং সত্যিই দিন শেষ হতে হতে আকাশ ভয়ংকর কালো মূর্তি ধরলে, তার পর

আরম্ভ হল তুমুল ঝড় বৃষ্টি বন্যার তাণ্ডব নৃত্য। নৌকায় সব ছিদ্র বন্ধ করে দিয়ে তারা দেবতাদের হাতে ভাগ্য সমর্পণ করলে। বাইরে ক্ষীণতম আলোগুলিও একে একে গাঢ় তিমিরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, স্ত্রী পুত্র ভাই কেউ আর কাউকে দেখতে পেলে না, কালো মেঘ আর ঘূর্ণীবাত্যার ঘর্ষণে দেবতারা হুংকার করতে লাগলেন। মেঘ ভেঙে জল ঝরতে ঝরতে শেষে তা প্রায় পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত উঠে এল, তখন দেবতারাও ভয় পেল। ছ দিন ছ রাত্রি এমনি চলার পর আবার যখন সব শান্ত হল তখন চরাচরের উপর দিয়ে যেন প্রলয় বয়ে গিয়েছে মানুষকে কাদা বানিয়ে দিয়ে, চতুর্দিকে শুধু উন্মুক্ত সাগর ধুধু করছে। আরও ১২ দিন নৌকা চলে শেষে নিসির পর্বতে এসে ঠেকল। উত-নপিশ্‌তিম কিন্তু আরও সাত দিন অপেক্ষা করলে, তখনও নৌকা স্থির হয়ে আছে দেখে অবশেষে ছোট একটি ছিদ্র খুললে। তা দিয়ে প্রথমে ঘুঘু পরে বাবুই উড়ে গেল বাইরে, কিন্তু নামবার জায়গা না পেয়ে ফিরে এল তারা : শেষে দাঁড়কাক আর ফিরে এল না—স্থল আবার মাথা তুলেছে, মাটি খুঁটে খুটে কি যেন খাচ্ছে সে, দেখে সবাই নামল নৌকা থেকে। দুটি লোকের মধ্যে মানুষ জাতি বেঁচে রইল, অবশ্য বেল দেবতা ক্রুদ্ধ হয়ে তাদেরও ধ্বংস করতে চাইল, কিন্তু তাকে শেষ পর্যন্ত নিরস্ত করা হল। ইয়া-র আশীর্বাদে উত-নপিশ্‌তিম ও তার স্ত্রী অমর হয়ে রইল, তাদেরই সন্তান সন্ততিতে আজ পৃথিবী পরিপূর্ণ।

এই উপকথার সঙ্গে ইহুদী সৃষ্টিপুরাণে বন্যা-কাহিনীর সাদৃশ্য এত স্পষ্ট যে তার উল্লেখ বাহুল্য—উত-নপিশ্‌তিমের জায়গায় নোআ, নিসির পর্বতের জায়গায় আরারাত পর্বত বসালেই প্রায় সব মিলে যায়। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্য এলাকার বাইরেও পুবে এবং পশ্চিমে গল্পের অনেক বৈশিষ্ট্য অপরিবর্তিত। গ্রীসীয় পুরাণে যক্ষ প্রমিথিউস মানুষকে আগুন দান করে তার প্রভূত উপকার করেছিল, কিন্তু তার আগে মানুষকে সে প্লাবনের মুখে ধ্বংসের থেকে বাঁচিয়েছে। এই ধ্বংসের বুদ্ধি যখন জিউসের মাথায় এল তখন প্রমিথিউস মানব-কুলের মধ্যে দুটি ভাল লোককে (ডিউকেলিয়ন ও পিরা) বেছে নিয়ে তাদেরকে সব জানালে, তার পর শিখিয়ে দিলে কি করে তারা এমন তরী বানাতে পারে যাতে করে ত্রাণ পাওয়া যাবে। জিউসের আদেশে বায়ু ও বৃষ্টি প্রবল বন্যার সৃষ্টি করলে, বারি দেব পোসাইডন সমুদ্রের জল তুলে স্থলে

ঢেলে দিলে, নদীদের আদেশ করলে বাঁধ ভেঙে সব কিছু ভাসিয়ে দিতে। ক্রমে চরাচর ডুবুডুবু, জলপরীরা তাদের চলাফেরার পথে অবাক হয়ে দেখলে মানুষের তৈরি শহর, লোকেরা নৌকায় চড়ে প্রাণ বাঁচাতে চেষ্টা করলে, কিন্তু সব নৌকা ডুবল, একমাত্র ডিউকেলিয়ন ও তার স্ত্রী ভেসে রইল তাদের মায়াতরীতে। অবশেষে এক সময়ে জল সরল, তারা নামল উঁচু জমিতে, দেবরাজ উপর থেকে দেখলে শাপগ্রস্ত মানুষ জাতির দু জন তখনও বেঁচে আছে ; কিন্তু তারা ন্যায়পরায়ণ, সহৃদয়, দেবতাদের প্রতি যথেষ্ট ভক্তি আছে প্রাণে, তাই তাদের সে ছেড়ে দিলে, আবার পৃথিবী ভরে উঠল মানুষে।

আমাদের পুরাণে মানবপিতা বৈবস্বত মনু কি করে প্রলয় কালে সৃষ্টি বাঁচিয়েছিল তা অনেকেরই জানা আছে। একদা এক ক্ষুদ্র মাছ মানুষকে অনুরোধ করলে বড় মাছদের থেকে তাকে বাঁচাতে। মনু প্রথমে তাকে জালায় রাখলে, কিন্তু সে এত বড় হতে লাগল যে ক্রমে তাকে পুকুরে, গঙ্গায় ও সমুদ্রে রাখতে হল। তখন মাছের ঈশ্বরত্ব বুঝতে পারলে মনু। মাছ তাকে বললে নৌকা বানিয়ে তাতে উঠে বসতে—প্রলয় আসন্ন, দেখতে দেখতে স্থাবর জঙ্গম সব জলমগ্ন হবে। নৌকা তৈরি করে সপ্তর্ষি ও নানা জিনিসের বীজ সঙ্গে নিয়ে মনু তাতে চড়ে বসল, মৎস্য অবতার শৃঙ্গ ধারণ করে এল, সর্প-রজ্জু দিয়ে তার সঙ্গে নৌকা বেঁধে দ্রুত নিয়ে চলল। বহু বছর পরে হিমালয়ের শৃঙ্গে তরী বাঁধা হল, মনু তখন মানব ও অন্যান্য প্রাণী, স্থাবর ও জঙ্গম সৃষ্টি করলে।

পারসিক পুরাণে কথিত আছে যে প্রথম নর নারীর পৌত্র পৌত্রীরা যখন ধর্ম ও ন্যায়ের পথ ছেড়ে শয়তানী শক্তি অরিমনের বশবর্তী হয়ে পড়ল তখন দেবাদিদেব অহুর মাজ্‌দা তাদের শাস্তি দিলে বরফ গলিয়ে বন্যার সৃষ্টি করে। য়োরোপের অপর প্রান্তে আইসল্যাণ্ডের পুরাকাহিনীতে দেখা যায় দেবাসুরের যুদ্ধের পরে বিক্ষুব্ধ জলমগ্ন পৃথিবী অন্ধকারে আচ্ছন্ন, চন্দ্র সূর্যকে নেকড়েতে খেয়েছে। ক্রমে জল সরে গেল, সুন্দর সবুজ ভূমি দেখা দিল আবার, নতুন চন্দ্র সূর্য সৃষ্টি হল। বনের গভীরে দুটি মাত্র নর নারী বেঁচে ছিল, তাদের সন্তান সন্ততি নতুন করে পৃথিবী পূর্ণ করলে। এমন কি অতলান্তিকের ও পারে অ্যাজ্‌টেক উপাখ্যানে বলে এই পৃথিবীর আগে অন্যান্য

পৃথিবী ছিল, তাতেও মানুষের বাস ছিল; বারে বারে বসুন্ধরা ধ্বংস হয়েছে—এক বার প্লাবনে, এক বার ঝড়ে, এক বার আগুনে।

এই পুরাণ-কাহিনীগুলির তুলনা করলে এমন ধারণা এড়ানো প্রায় অসম্ভব যে এদের অন্তত কয়েকটির একই জায়গায় উদ্ভব, পরে সেখান থেকে তারা নানা দিকে ছড়িয়ে পড়েছে এবং কিছুটা রূপান্তরিত হয়েছে। অনেকেই মনে করেন যে নোআর কাহিনী প্রাচীন সুমেরী উপাখ্যান থেকে উদ্ভূত। আর্যদের পূর্বপুরুষরা মধ্যপ্রাচ্যের অনতিদূরে কোনও এক জায়গায় বাস করত (অনেকে বলেন ক্যাস্পিয়ান সাগর অঞ্চলে—অর্থাৎ মেসোপটেমিয়ার মাথার কাছে) এবং সেখান থেকে বিভিন্ন শাখায় পশ্চিমে গ্রীসে ও য়োরোপের অন্যান্য দেশে, দক্ষিণে ইরানের পথে ভারতের দিকে বিক্ষিপ্ত হয়েছে, এ কথা যদি আমরা মেনে নিই তবে ছবিটি অনেকখানি পরিষ্কার হয়। এদের মাধ্যমে ঐ ঐ অঞ্চলে যে নানা ভাবধারা ছড়িয়ে পড়েছিল তার প্রমাণ তো আছে, যেমন পারসিক আবেস্তার অহুর মাজ্‌দা নাকি বেদের বরুণ দেবেরই প্রতিরূপ, অধ্যাপক ব্লুমফিল্‌ডের মতে আবার বরুণ ও গ্রীসীয় উরানস অভিন্ন। এ দিকে গ্রীসের ইলিয়ড অডিসি আর ভারতের রামায়ণ মহাভারতে বহু ঘটনার সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। সামান্য যুদ্ধ ও সম্ভাব্য ঘটনার ভিত্তিতে যেমন এই সব অলৌকিক মহাকাব্যের মহীরুহ গড়ে উঠেছে ঠিক তেমন হয়তো কোনও এক নদীর অস্বাভাবিক প্রবল বন্যা লোক-মুখে বিশ্বগ্রাসী মহাপ্লাবনের আকার ধারণ করেছে।…

যাই হক, আপাতত আবার আরও প্রাচীন কালে ফিরে যাওয়ার দরকার, আলোচ্য ছিল ইরাক ও মিশরের নদীতীরে আবাদী জমি উদ্ধারের চেষ্টা। এই উদ্যোগে শরবনের উচ্ছেদ, খাল কাটা, বাঁধ বানানো ইত্যাদি গুরুভার কাজের জন্য বহু লোকের প্রয়োজন হয়েছে, তার ফলে গ্রামগুলি ক্রমেই শহরের আকার নিতে লাগল। তা ছাড়া যে সব শ্রমিক এ ধরনের উদ্যোগে নিযুক্ত থেকেছে তারা আর মাঠে কাজ করবার সময় পায় নি—এমনি করে বিভিন্ন পেশাদার শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে যারা নিজের ঘরেই আর নিজের সব প্রয়োজন মেটাতে পারে নি (যেমন আজ কেউ পারে না), যারা অন্যের উৎপন্ন খাদ্য বা ব্যবহারের বস্তুর উপর নির্ভর করেছে। আর এই শ্রমিকদের খাটিয়ে বৃহৎ পরিকল্পনা কাজে পরিণত করতে দরকার হয়েছে

নেতা ও শাসক শ্রেণীর, যারা হুকুম করেছে, সাজা দিয়েছে, এক কথায় অতিরিক্ত ক্ষমতা জাহির করে সমাজের শীর্ষে অধিষ্ঠান করেছে ; এদেরই এক এক জন ক্রমে নিজেকে রাজা বানিয়েছে হয়তো। এই ধরনের পেশাভেদ ও শ্রেণীভেদ থেকেই পরে জাতিভেদের সৃষ্টি।

ঐ অঞ্চলে খেজুর ডুমুর জলপাই ইত্যাদি ফলের গাছও ছিল, শস্যের মত এদের বছর বছর বুনতে হয় না, একই গাছ বহু কাল ফল দেয়—এর থেকেও জীবনে স্থায়িত্ব এসেছিল কিছুটা। ক্রমে মানুষ নিজেই গাছ রোপণ আরম্ভ করেছে, গাছের যত্ন শিখেছে, জেনেছে কৃত্রিম নিষেকে ফল ধরানো। মধ্যপ্রাচ্যে খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রকে ফলের চাষ আরম্ভ হয়েছে, জলপাই ও খেজুরের অবশিষ্ট পাওয়া গিয়েছে কয়েক জায়গায় ; এই সময়েই সিরিয়া ও মিশরে আঙুর ফলানো হয়েছে।

হালের চাষ কবে কোথায় আরম্ভ হয়েছিল তা জানা নেই, তবে ইরাক ও মিশরে ৩০০০ বিসির আগে এবং ভারতে অল্প পরে তার ব্যবহার দেখা যায়। য়োরোপের জার্মেনি অঞ্চলে ২০০০ বিসির আগে হাল ব্যবহার হয় নি, চীনে হাল দেখা যায় ১৪০০ বিসিতে। হালের আগে যে সব প্রাচীন কোদাল চলতি ছিল তার তুলনায় এই উপায়ে অনেক বেশী কাজ পাওয়া গেল ; ছোট ছোট ভূখণ্ড অল্প মাত্র না খুঁড়ে বড় মাঠ গভীর করে চাষ সম্ভব হল, বাড়ন্ত জনতার জন্য আরও বেশী ফসল এল ঘরে। কৃষির কাজ এ বার মেয়েদের থেকে পুরুষের হাতে চলে এল। আদিবাসীদের মধ্যে অনেক জায়গায় আজও মেয়েরা কোদাল ব্যবহার করে, পুরুষেরা হাল চালায়।

একদা কার খেয়াল হয়েছিল কোদালকে যদি পশুর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যায় তবে পরিশ্রম অনেক কমে, কাজও ভাল হয়। সৃষ্টি হল হাল, তার সঙ্গে জোয়াল। কৃষির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জুড়ে গেল পশুপালন।

বনের পশুকে ঘরে এনে মানুষের কত রকম সুবিধা হয়েছিল তা আমরা দেখেছি আগের অধ্যায়ে, নবপ্রস্তর যুগের দ্বিতীয় পর্বে পালিত পশুকে যান বাহনে কাজে লাগিয়ে সে নিজের শ্রম অনেক খানি লাঘব করেছে। হাল বা গাড়ি টেনে, ভার বয়ে, এবং শেষে মানুষেরই বাহন হয়ে এই নির্বাক বন্ধুরা তার অশেষ উপকার সাধন করলে।

হাল হাতে পেয়ে মানুষ প্রথমে সম্ভবত ঘরের বলদকেই তার সঙ্গে জুতেছিল। ইরাকে ৩০০০ বিসি নাগাদ গাধাও ব্যবহার হয়েছে এই কাজে, পশুপালন ও কৃষির মধ্যে এত কাল কোনও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না, সেই কারণে কোথাও কোথাও নিছক কৃষি সম্প্রদায়ের বাস ছিল তা আগে বলেছি, এ বার এই দুই বৃত্তি অচ্ছেদ্য হয়ে পড়ল। অবশ্য মানুষও হাল টানে, বর্তমানে চীনেই নাকি তা দেখা যায়।

তৎকালীন আর একটি আবিষ্কারের সঙ্গেও পশুর অন্তরঙ্গ যোগ—তা হল চাকা, একটু পরেই তার ইতিহাস বলছি। অবশ্য চাকার আগেও পশুকে লাগানো হয়েছে স্লেজ টানতে ; এই চাকাহীন গাড়ি টানতেও বলদ ব্যবহার হয়ে থাকতে পারে উন্মুক্ত মরু প্রান্তরে, যেমন আজও দেখা যায় কোনও কোনও আদিবাসী শিকারী সমাজে। কুকুর আরও আগে বশ মেনেছে, এখনও বরফের দেশে সে এই ধরনের গাড়ি টানে—হয়তো এই কাজে বলদের চেয়েও সে প্রাচীন। পশ্চিম এশিয়ার ৪০০০ বিসির আগেই যে স্লেজ জানা ছিল তার প্রমাণ আছে এবং এও জানা যায় যে চাকা আবিষ্কারের পরও ঐ অঞ্চলে স্লেজের ব্যবহার বন্ধ হয়ে যায় নি ; পরবর্তী ঐতিহাসিক কালের বিখ্যাত 'আর' রাজ্যে রাজার শব সমাধি স্থলে আনা হত বলদে টানা স্লেজ গাড়িতে। যান বাহনের মূল কথাটি ও অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যটি হল চলা ফেরায় নিজের শক্তি ক্ষয় না করে অন্য কিছুর শক্তি ব্যবহার করা—এই চেষ্টায় বাষ্প ও তেল চালিত বিবিধ এনজিনের পর আজ রকেট আমাদের হয়ে যা করছে এক কালে বলদ দিয়েই তার সূচনা।

যেমন যানে তেমন বাহনেও পশুর ব্যবহার সম্বন্ধে দু কথা বলা দরকার। পোষা জানোয়ারের পিঠে মোট চাপিয়ে যে নিজের ভার লাঘব করা যায়, হয়তো বোঁচকার পাশে নিজেও চড়ে বসা যায়, এ বুদ্ধি সম্ভবত প্রথম খেলেছিল সে কালের অস্থায়ী যাযাবর সম্প্রদায়ের মধ্যে। স্থলপথের বাণিজ্য সে দিন গড়ে উঠেছিল পশুর পিঠে। কি সেই পশু ? প্রাগিতিহাসের খবর সঠিক জানা নেই, তবে ইতিহাসের শুরু থেকে পশ্চিম এশিয়া ও মিশরে মোট বওয়াতে ও চড়তে গাধা এত বেশী ব্যবহার হয়েছে যে মনে হয় আদিতম ভারবাহীর সম্মানটা তারই প্রাপ্য। আজ এ সব অঞ্চলে উটের ব্যবহারও খুব ব্যাপক, ৩০০০ বিসির আগেই সেও পোষ মেনে থাকতে পারে। এক

মিশরী কবরে একটি মাত্র উট মূর্তি দেখা যায় এবং কবরটি সম্ভবত প্রাগৈতিহাসিক।

গাধা আফ্রিকার উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রাণী, কিন্তু ঘোড়ার স্বাভাবিক দেশ হল মধ্য এশিয়া ও য়োরোপের প্রান্তর ভূমি। ঘোড়ার ব্যবহার প্রধানত ঐতিহাসিক কালে এবং এই দ্রুতগামী দূরগামী জন্তুটি সে সময়ের শহর-কেন্দ্রিক সভ্যতা গড়ে তুলতে যে অনেক সাহায্য করেছে তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। ঘোড়ার বন্য পূর্বপুরুষের নাম তারপান, সম্ভবত উত্তর-পশ্চিম এশিয়ায় ঘোড়া প্রথম পোষ মানে। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রকের ঘোড়ার হাড় পাওয়া গিয়েছে ইরানের সিয়াল্ক ঘাঁটিতে এবং তুর্কিস্থানে। জনৈক বিশেষজ্ঞের মতে ঘোড়া প্রথম পোষা হয়েছে দুধের উদ্দেশ্যে ও পিঠে চড়তে; কিন্তু ১০০০ বিসির আগে ঘোড়-সওয়ারের কোনও স্পষ্ট প্রমাণ নেই—সিন্ধু উপত্যকায় নাকি জিনের প্রতিকৃতি পাওয়া গিয়েছে এবং এই সভ্যতা প্রায় ২৫০০ বিসি পর্যন্ত প্রাচীন, কিন্তু অনেকে ঐ বস্তুটিকে জিন বলে মানেন না। মিশরে ঘোড়ার আমদানি চাকার সঙ্গে ১৬৫০ বিসিতে, পশ্চিম এশিয়ায় ২০০০ বিসির আগে, কিন্তু এই দুই অঞ্চলেই রথ টানা ছাড়া তার আর কোনও কাজ দেখা যায় না। রথে যুক্ত ঘোড়া জাতীয় কোনও জন্তু সুমেরী স্মৃতি মন্দিরের দেয়ালে আঁকা হয়েছে ৩০০০ বিসিতে কি আরও আগে, কিন্তু তাকে চেনা সহজ নয়—কেউ বলেন ঘোড়া, কেউ বলেন খচ্চর, কারও মতে তা এশিয়ার বুনো গাধা অনাজার। এখানকার ও স্থানান্তরের ছবি দেখে মনে হয় যে শারীরিক বিভেদ সত্ত্বেও প্রথম দিকে বলদ জুতবার কাঠামোটাই সরাসরি ঘোড়ার কাঁধে চাপানো হয়েছে, ফলে সে বেচারার যে খুব কষ্ট হয়েছে ও কার্যক্ষমতা কমে গিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। তা সত্ত্বেও এই দুর্গতির শেষ হয়েছে মাত্র খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর কাছাকাছি, ঘোড়ার জন্য পৃথক গলাবন্ধ আবিষ্কারের পরে।

পশুর কাঁধে জোয়াল চাপিয়ে কিংবা সাজ লাগাম পরিয়ে শুধু নয়, অদৃশ্য হাওয়ার বেগকে পর্যন্ত কাজে লাগিয়ে মানুষ এ সময়ে নিজের শ্রম লাঘব করতে আরম্ভ করেছে। নবপ্রস্তর যুগের আগেই য়োরোপে ব্যবহৃত গাছের গুঁড়ি থেকে প্রস্তুত শালতি জাতীয় সরু ডোঙা এবং চামড়ার তৈরি চ্যাপটা গোলাকার জলযানের কথা আগে বলেছি। (ঘষা কুড়াল সৃষ্টির আগে

অবশ্য ঐ প্রথমোক্ত যান তৈরি সহজ হয় নি।) তার পর প্রাগৈতিহাসিক মিশরের ঘট ও কুম্ভের গায়ে অন্য এক রকম নৌকার ছবি দেখা যায়, প্যাপাইরাস গাছের নল গোছা বেঁধে করে তৈরি এই জলযানে ৪০ কি তারও বেশী দাঁড়ী, মাঝখানে ছোট একটি কেবিন ঘরও চোখ পড়ে—সুতরাং নৌকা-গুলি যে বেশ বড় ব্যাপার তা বুঝতে কষ্ট হয় না। টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীতে সম্ভবত প্রথমে চামড়ার ভেলা ব্যবহার হয়েছে, কারণ সে অঞ্চলে কাঠ ও নলের অভাব। নীল নদীর দৃশ্যে পালতোলা নৌকা দেখা যায় ৩৫০০ বিসির অল্প পরের ছবিতে, এবং খুবই সম্ভবত ইতিহাসের প্রাক্‌কালে ভূমধ্য-সাগরের পূর্বাঞ্চলে এবং আরব সাগরে তাদের অবাধ চলাফেরা ছিল। পালতোলা নৌকার প্রাচীনতম নিদর্শন বোধ হয় দক্ষিণ ইরাকে এরিদু-র এক কবরে প্রাপ্ত এক প্রতিকৃতি। মানুষ যে তক্তার নৌকা বানাতে এবং পাল খাটাতে শিখে ফেলেছে তাই নয়, জলপথে দূর দূরান্তরে পাড়ি দেওয়ার মত ভৌগোলিক ও জ্যোতিষী বিদ্যাও নিশ্চয় আহরণ করেছে। মিশরী ঘটের চিত্রে যে পাল দেখা যায় তার অবশ্য অনেক সংস্কার হয়েছে পরে, কিন্তু মূলত এই আবিষ্কারই এই গত শতাব্দী পর্যন্ত ব্যবহার হয়েছে জাহাজ চালাতেও। জলপথের চলাফেরার এই সুবিধা না থাকলে সে কালেও ব্যবসা বাণিজ্য অনেক পিছনে পড়ে থাকত, পিরামিড গড়া হত না হয়তো; পিরামিডে ব্যবহৃত কোনও কোনও অতিকায় শিলাখণ্ড (প্রায় ১৫০ টন) আনতে হয়েছে কয়েক শো মাইল দূর থেকে, গাধার পিঠে বা গরুর গাড়িতে তা কখনও সম্ভব হত না নিশ্চয়।

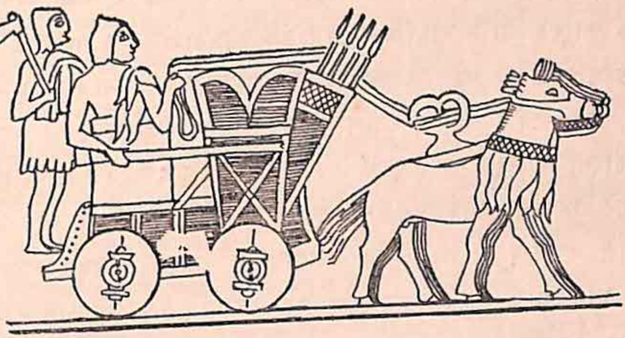
কিন্তু গরুর গাড়ি যতই হীন হক তারও আছে চাকা—এবং এই মৌলিক আবিষ্কারটির গুরুত্ব বাড়িয়ে বলা কঠিন। আজ আমাদের বাহন যে মোটর গাড়ি রেল গাড়ি তাদেরও নিচে ঐ চাকা (খুব সম্প্রতি কিন্তু বিচক্র স্থল-যানের গবেষণায় আশাপ্রদ ফল পাওয়া গিয়েছে); এবং বহন ছাড়াও চাকার অন্য ব্যবহার আছে। এ বার চাকা প্রসঙ্গের আলোচনা দরকার।

এ পর্যন্ত মানুষের ইতিহাসে একের পর এক অনেক আশ্চর্য আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের আলোচনা আমরা করেছি, কিন্তু তাদের মধ্যে কয়েকটি যেন বিধাতার বিশেষ দান, মানুষের জীবনধারা ও ভাবনায় তারা আমূল পরিবর্তন এনেছে। এই শ্রেণীর প্রথম দান আগুন, তা হাতে পেয়ে মানুষের ক্ষমতা

কতখানি বাড়বে তা জানতেন বলেই ওলিম্পাসের দেবতারা পর্যন্ত শঙ্কিত ছিলেন, প্রমিথিউসের এমন সাজা হল মানুষের হাতে তা তুলে দেওয়ার জন্য! এর তুল্য অন্য যুগান্তকারী আবিষ্কার কৃষি—এবং তার পরেই চাকা। এর মধ্যে চাকার আবিষ্কারেই মানুষের কৃতিত্ব সবচেয়ে বেশী; আগুন জ্বালতে শিখবার আগেও আগুনের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল, বীজ বুনবার আগেও সে দেখেছে গাছ গজাতে, সংগ্রহ করেছে বুনো শস্য—প্রকৃতি যেন এ সব রহস্য তার চোখের সামনে নাচাচ্ছিল বহু সহস্র বছর ধরে, এক দিন তা উদ্‌ঘাটিত না হয়ে উপায় ছিল না; সে উদ্‌ঘাটনও কেমন করে সম্পূর্ণ আকস্মিক ভাবে ঘটে থাকতে পারে তা আগে বলেছি। কিন্তু চাকার সঙ্গে মানুষের কোনও রকম পরোক্ষ পরিচয়ও ছিল না আগে, তা উদ্‌ঘাটন নয় উদ্‌ভাবন, প্রায় সম্পূর্ণ ভাবনার সৃষ্টি—যদিও গাছের গুঁড়ি গড়িয়ে ভারি জিনিস সরানোর কৌশল বোধ হয় আগেই জানা ছিল। এই ধরনের সৃষ্টি পরে যতই সহজ ও সাধারণ মনে হক না কেন, তার প্রথম পরিকল্পনা প্রভূত প্রতিভার দরকার করে। সে কালের কোনও এক অজ্ঞাত অখ্যাত ব্যক্তির মাথায় সম্ভবত তা মূর্তি পেয়েছিল এক দিন, আজকের দিন হলে তার নাম চিরকালের জন্য অমর হয়ে থাকত মানুষের ইতিহাসে, নোবেল পুরস্কার ও অন্যান্য সম্মান বর্ষিত হত তার উপর।

চাকার জন্ম ঠিক কখন ও কি ভাবে তার বিকাশ তা বলা কঠিন, সে কালের কাঠের চাকা এখন আর টিকে নেই। কিন্তু পোড়া মাটি বা পাথরে আঁকা ছবিতে কখনও কখনও গাড়ি দেখা যায় (গাড়ির মূর্তিও পাওয়া গিয়েছে). তার থেকে বিভিন্ন দেশে চক্রযানের প্রথম আবির্ভাব সম্বন্ধে কিছু কিছু জানা যায়। সুমেরী ছবিতে চাকার গাড়ি দেখা যায় ৩৫০০ বিসিতে, উত্তর সিরিয়াতে বোধ হয় আরও আগে। ৫০০ বছর পরে, ইতিহাসের উষায়, চাকাযুক্ত খোলা এবং ঢাকা গাড়ি এমন কি রথ পর্যন্ত বেশ চলতি ছিল ইল্যাম (দক্ষিণ ইরান), ইরাক ও সিরিয়ার পথে ঘাটে। প্রাচীন ভারতে মহেনজোদারো-হরপ্পা সভ্যতা প্রায় ২৫০০ বিসিতেই যখন পূর্ণবিকশিত দেখতে পাওয়া যায়, তখন গরুর গাড়ি তার অতি সাধারণ অঙ্গ; এবং যারা এই সভ্যতার পত্তন করেছিল তাদের পূর্ব ইতিহাস জানা নেই। মিশরে কিন্তু চক্রযান এসেছে মাত্র ১৬৫০ বিসিতে, তাও বিদেশী হানাদারদের সঙ্গে।

প্রাচীন চাকার ভিতরে কোনও ফাঁক না থাকায় তা আজকের তুলনায় অনেক ভারি ছিল। ইতিহাসের শুরুতে পর্যন্ত সুমেরে রথ এবং ঢাকা গাড়ির চাকা তৈরি হয়েছে তিন খণ্ড কাঠ জুড়ে, তাদের ঘিরে চামড়ার হাল তামার পেরেক দিয়ে আটকানো। চামড়ারই ফালি দিয়ে অক্ষটি গাড়ির নিচে



৪৩ নং চিত্র
সুমেরী যুদ্ধ-রথ।

বাঁধা, অক্ষের সঙ্গে একযোগে চাকা দুটি ঘুরত। এখনও সিন্ধু প্রদেশের গ্রামাঞ্চলে (সার্ডিনিয়া ও তুরস্কেও) যে গরুর গাড়ি দেখা যায় তা ঠিক এই রকম, মহেনজোদারো-হরপ্পা সভ্যতার দিন থেকে ৪৫০০ বছর কাল অতিক্রম করে চলে এসেছে একই ধারা। যে আর্যদের আগমনের সঙ্গে ভারতে সিন্ধু সভ্যতার অবসান ঘটল তাদের তথাকথিত ইন্দো-য়োরোপীয় পূর্বপুরুষরাও যে গাড়ি ব্যবহার করেছে তা জানা যায় আর্যভাষাজাত বিভিন্ন আধুনিক ভাষায় গাড়ি সংক্রান্ত শব্দের সাদৃশ্য লক্ষ করে; এই সাদৃশ্যের থেকে বোঝা যায় যে শব্দগুলি একই মৌলিক শব্দের ধ্বনিবিকার মাত্র, যে শব্দটি ব্যবহার হয়েছে ইন্দো-য়োরোপীয়দের আদি বাসভূমিতে, তারা বিভিন্ন দিকে ভাগা-ভাগি হয়ে পড়বার আগে। যেমন উপরোক্ত সংস্কৃত অক্ষ (উচ্চারণ অকৃষ) আর ইংরেজী axle শব্দের ধ্বনি অনেকটা এক রকম, তার ইঙ্গিত এই যে এদের পিছনে কোনও একটি ইন্দো-য়োরোপীয় শব্দ ছিল, সুতরাং ইন্দো-য়োরোপীয়দের অক্ষের সঙ্গে পরিচয় ছিল। সংস্কৃত রথ শব্দের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় ল্যাটিন rota এবং প্রাচীন জার্মান, স্লাভ ও সেল্‌টিক ভাষায়। গাড়ি সংক্রান্ত এই রকম ইন্দো-য়োরোপীয় শব্দের আর দুটি ইংরেজী প্রতি-

শব্দ হল wheel এবং yoke, যাদের ইন্দো-য়োরোপীয় প্রতিশব্দ (ইংরেজী হরফে) qeqlo এবং yog ; yoke শব্দের প্রতিধ্বনি সংস্কৃত যোগ শব্দে, nave শব্দের নাভিতে। এই সব শব্দ তুলনা করলে ইংরেজীকে অত বিদেশী বা সংস্কৃত কি হিন্দীকে অত স্বদেশী ভাষা বলে আর মনে হয় না!

এই রহস্যময় ইন্দো-য়োরোপীয়দের কথা যখন উঠলই তখন ভাষার তুলনা থেকে তাদের আদি সামাজিক যে চিত্রটি আমরা পাই সে সম্বন্ধে দু কথা বলা যেতে পারে। এদের উৎপত্তি যে ঠিক কোথায় সে বিষয়ে সব মুনিদের মত এক নয়, কেউ বলেন ক্যাস্পিয়ান সাগর অঞ্চলে, কেউ বলেন মধ্য য়োরোপে, দানিয়ুব নদীর কূলে ; এই প্রশ্নের মীমাংসাতেও ভাষা ছাড়া আর কোনও নিশানা আমাদের নেই, আদি বাসভূমিটা অনুমান করে নিতে হবে ভূগোল জলবায়ু বা পশু উদ্ভিদ সংক্রান্ত যে সব কথা তাদের ভাষাযুক্ত বলে চেনা যায় তার থেকে। সাবেক ঘর যেখানেই হক সেখানকার সামাজিক গার্হস্থ্য চিত্রটিই প্রধান কৌতূহলের বস্তু। ইংরাজী cow ও সংস্কৃত গো শব্দের সাদৃশ্য অতীব স্পষ্ট, আদি ইন্দো-য়োরোপীয় শব্দটি gwou ; এমনি আরও বিবিধ সমধ্বনি শব্দ থেকে জানা যায় যে গরু ছাড়াও ভেড়া ছাগল শুয়োর কুকুর ঘোড়া এবং হাঁস ছিল তাদের ঘরে। দুধ পশম বয়নশিল্প চাষ শস্য রুটি ঈস্ট্ কুড়াল (সংস্কৃত পরশু, তাদের peleku) ইত্যাদি প্রতিশব্দ মেলে, তেমনি গাড়ি ও গাড়িতে বহন সংক্রান্ত শব্দ। সংস্কৃত, গ্রীসীয় ও অন্যান্য ইন্দো-য়োরোপীয় শাখার তুলনায় এমনি জানা যায় যে শাখা বিভাগের আগেই সমাজে ছুতারের পেশা আলাদা হয়ে গিয়েছিল—সব সকম কারিকরের মধ্যে একমাত্র স্থত্রধরের নামই ঐ সব ভাষাতে এক শব্দ-জাত। বরফ (sneighw) ও নদীর সঙ্গে তাদের পরিচয় ছিল, কিন্তু সমুদ্রের সঙ্গে নয় (ক্যাসপিয়ান সাগর আসলে নোনা হ্রদ)। বাড়ির চালে খড় ব্যবহার হয়েছে। ঐহিক রাজা মহারাজা (ল্যাটিন rex, magnus rex) শব্দের পাশাপাশি পারত্রিক ঈশ্বর (ghutom, যার থেকে God), দেব (ল্যাটিন deus) এবং প্রার্থনা শব্দের প্রতিশব্দ মেলে। মাতা পিতা ইত্যাদি কিংবা এক দুই থেকে শত পর্যন্ত বিবিধ সংখ্যার মিল এত সুপরিচিত যে তার উল্লেখ বাহুল্য। দেখা গিয়েছে যে বিভিন্ন ভাষার একই শব্দের এই ধ্বনিবিকার কিছু কিছু সুনির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলে—তা না হলে অবশ্য মূল শব্দটি উদ্ধার

করা সম্ভব হত না ; এই গবেষণার ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য জার্মেনির অধিবাসী দুই ভাই, ইয়াকব ও হ্বিল্‌হেল্‌ম গ্রিম, অধিকাংশ লোক যাঁদের বিশ্ববিখ্যাত রূপকথার রচয়িতা বলেই জানে। ইন্দো-য়োরোপীয়রা কোন্ পথে দিকে দিকে বিস্তৃত হয়েছে বিভিন্ন ভাষার বিচার থেকে তারও নির্দেশ পাওয়া যায় ; পশ্চিমে য়োরোপের সীমান্তে আয়ার্ল্যাণ্ড, দক্ষিণে ভারতের তেলুগু ভাষাতে পর্যন্ত এই প্রভাব দেখা যায়। এ অধ্যায়ে আলোচ্য কালের তুলনায় ইন্দো-য়োরোপীয়দের এই বিক্ষিপ্তি ও শাখাবিভাগ অবশ্য অনেক সাম্প্রতিক, তা যখন ঘটেছে তখন মিশর ব্যাবিলনিয়া অ্যাসিরিয়ার প্রসিদ্ধ সভ্যতা সুপ্রাচীন।

চাকার আলোচনা করতে গিয়ে আমরাও এদেরই মত অনেক দূরে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছি, এ বার প্রাক্তন প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়া দরকার। গাড়ির সঙ্গে যুক্ত হয়েই যে চাকা সবচেয়ে বড় বিপ্লব এনেছিল সে কালের জীবনে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার ব্যবহার শুধু গাড়িতে নয়। চাকা বিনা আজ কল কারখানা অচল, এমন কি ক্ষুদ্র হাতঘড়ি পর্যন্ত। কারিকরী শিল্পে চাকার প্রথম প্রয়োগ সে যুগেই দেখিয়েছে কুম্ভকার। গাড়িতে এবং কুমারের কাজে চাকার ব্যবহার একই আবিষ্কারের বিভিন্ন প্রয়োগ মাত্র, স্বতন্ত্র আবিষ্কার নয়, এমন ধারণাই স্বাভাবিক, কিন্তু তথাকথিত সভ্য কালেও অনেক সময়ে এই দুই ব্যবহার একত্র দেখা যায় না। চক্রযান ও চাকে গড়া পাত্রের উদ্ভব পশ্চিম এশিয়ায় যদিও প্রায় সমকালীন, যদিও ভারতে দুইই একই সময়ে (২৫০০ বিসি) দেখা যায়, তথাপি মিশরে কুমারের চাক এসেছে আগে, ক্রীটে তা এসেছে গাড়ির প্রায় ২০০ বছর পরে ; য়োরোপের প্রাচীনতম গাড়ির চাকা এ যাবৎ পাওয়া গিয়েছে হলাণ্ডে, বয়স বোধ হয় ১৯০০ বিসি, যদিও উত্তর য়োরোপে মাত্র ৫০০ বিসিতে চাক দেখা দিয়েছে কুমারের কর্মশালায়। চাকের প্রাচীনতম নিদর্শন (৩২৫০ বিসি) এসেছে 'আর' থেকে।

সে যাই হক, চাকের ব্যবহারে এই পুরাতন শিল্পের দ্রুত উন্নতি হল, যেমন কৃষির হয়েছিল হাল আবিষ্কারের পরে। ঘুরন্ত চক্রের কেন্দ্রে এক তাল কাদা ফেলে সহজে এবং দ্রুত তালে তাকে রূপ দেওয়া গেল, রূপও খুলল বেশী ; কলস কুম্ভ ঘটি বাটির প্রতিসাম্য সম্পূর্ণ হল এত দিনে, আগে খণ্ডের

উপর খণ্ড বসিয়ে কয়েক দিন ধরে যা গড়ে উঠেছে এখন কয়েক মিনিটে দেখতে দেখতে তা মূর্তি পেল। অবশ্য এই নতুন শিল্প আয়ত্ত করতে সময় লেগেছিল নিশ্চয়, যত্ন করে দক্ষতা অর্জন করতে হল। মনে হয় চাক সৃষ্টির পরে কুমারের কাজ মেয়েদের থেকে প্রধানত পুরুষের হাতে চলে এসেছিল, যেমন কৃষি হস্তান্তরিত হয়েছিল হাল আবিষ্কারের পরে। আজও অনেক কুমারের ঘরে মেয়েরা হাতে গড়ে, পুরুষেরা চাক চালায়। এমনি করে পুরুষের দায়িত্ব ও প্রতিষ্ঠা বাড়ার ফলেই সমাজ মাতৃতন্ত্র থেকে পিতৃতন্ত্রের দিকে ঝুঁকেছে—যে ব্যবস্থায় স্বামী পরিবারের কর্তা, পুত্র সম্পত্তির প্রধান উত্তরাধিকারী, যেমন আজ সভ্য জগতের সর্বত্র দেখা যায়। বহু ঐতিহাসিক ও আধুনিক কুম্ভকার সম্প্রদায়ের সাক্ষ্য থেকে মনে হয় যে সে কালে হয়তো এরা সপরিবারে ঘুরে বেড়াত গ্রাম থেকে গ্রামে, স্থানীয় লোকের চাহিদা ও পছন্দ মত জিনিস বানিয়ে দিত। ধাতুকর্মী বা সেকরার দলও তা করে থাকতে পারে—এবং এ বার এই গুরুত্বপূর্ণ শিল্পটির উন্মেষ ও বিকাশ পরীক্ষা করে দেখা দরকার।

আজ আমাদের অস্ত্রে যন্ত্রে সামান্যতম উপকরণেও ধাতুর রাজত্ব, আগে যেমন লক্ষ লক্ষ বছর ধরে পাথর হাড় ও কাঠের আধিপত্য ছিল। এই যে বিরাট ধাতুশিল্প গড়ে উঠেছে তার বনিয়াদ পত্তন হয়েছে প্রস্তর যুগে তামার নিষ্কাশনে। তামা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য ধাতুশিল্প আয়ত্ত হয় নি—এই শিল্পের দুই প্রধান অঙ্গ হল খনিজের থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় খাঁটি ধাতুর উদ্ধার বা নিষ্কাশন, এবং সেই ধাতুকে গলিয়ে তাকে প্রয়োজনীয় বস্তুর রূপ দান। প্রাকৃতিক অবস্থায় অধিকাংশ ধাতুই অন্য পদার্থের সঙ্গে রাসায়নিক যোগে থাকে, তখন তাদের চোখে দেখে চেনা যায় না।

তামা কখনও কখনও মুক্ত অবস্থায়ও থাকে পাথরের ফাঁকে ফাঁকে, সেখানে রোদ বৃষ্টি তাপ তুষারের প্রভাবে ক্রমে তা দৃষ্টিগোচর হয়। এই ধাতু তুলে নিয়েই প্রথম তামার বস্তু তৈরি হয়েছে, যেমন সিয়াল্‌ক ও অন্যান্য ঘাঁটির ছোট ছোট তার বা পিন। তামার একটা গুণ যে স্বাভাবিক কঠিন ধাতুটিকে পিটিয়ে অনেকটা রূপ দেওয়া চলে, ঐ জিনিসগুলি সে ভাবেই সৃষ্টি। উত্তর ইরাক ও ইরানের উচ্চভূমিতে উন্মুক্ত তামা ব্যাপক ছিল।

পাথরের গায়ে যে ধাতু লেগে আছে তা কিছুটা খুঁটেই বার করা চলে, কিন্তু ক্রমে আভ্যন্তরিক তামার উদ্ধারে কিছুটা বুদ্ধি খাটাতে হয়েছে, পাথর তাতিয়ে তার গায়ে ঠাণ্ডা জল ঢেলে তাকে ফাটানো হয়েছে। ধাতুবস্তুর বিশেষ গুণ ও চরিত্র (যেমন তার গলনীয়তা) তখনও মানুষের কাছে ধরা পড়ে নি। স্বাভাবিক ধাতুটি তার চোখে এক বিশেষ ধরনের পাথর ছাড়া কিছু ছিল না।

কোনও কোনও ধাতুবিদ মনে করেন যে স্বাভাবিক তামা দুর্লভ হয়ে পড়ার পরেই সম্ভবত যৌগিক ধাতুটির নিষ্কাশন আরম্ভ হয়েছে, কিন্তু এ সম্বন্ধে স্পষ্ট প্রমাণ কিছু নেই। যাই হক আসল কথা হল যে অনতিবিলম্বে প্রকৃত ধাতুবিদ্যাও আয়ত্ত করে ফেলেছিল নবপ্রস্তর মানুষ, হয়তো ৪০০০ বিসির কিছু আগে। নিষ্কাশনের রহস্য কি করে প্রথম উদ্‌ঘাটিত হল সে সম্বন্ধে শুধু অনুমানই সম্ভব। ধাতুবাহী পাথর বা স্ফটিক আর মুক্ত ধাতুটির চেহারায় ও গুণে পার্থক্য এত বেশী যে মনে হয় আবিষ্কারটি সম্পূর্ণ আকস্মিক। একটি সম্ভাব্য চিত্র কল্পনা করা হয়েছে এই রকম: সে কালে লোকে নানা রকম মণি রত্ন সংগ্রহ করত, শুধু অলংকারের জন্য নয়, তাদের অলৌকিক ক্ষমতার লোভে (এ প্রসঙ্গ একটু পরে আলোচনা করব); এগুলির কোনও কোনওটায় (যথা ম্যালাকাইট, টারকইজ্ৰ) তামা আছে; কোনও দিন হয়তো এর একটা পড়ল চুলার মধ্যে, আগুন আর জালানি কাঠের সংস্পর্শে ক্রমে আত্মপ্রকাশ করল সদ্যোজাত লালাভ তামা, আফ্রিকার কাটাংগা অঞ্চলে আগুনের ছাইয়ে মুক্ত তামার দানা আবিষ্কৃত হয়েছে—একদা কোনও নিগ্রোর দল রান্না করতে জেলে থাকবে সে আগুন। যে ভাবেই ঘটে থাকুক এ আবিষ্কার (এবং একাধিক বারও ঘটে থাকতে পারে), দৃশ্যটি সে কালের মানুষকে স্তম্ভিত চমৎকৃত করেছে বারে বারে; কালো ছাই, জালানি আর কঠিন নীল-সবুজ মণির থেকে উদীয়মান সূর্যের মত রক্তবর্ণ তরল তামা আত্মপ্রকাশ করেছে, এই 'অনৈসর্গিক' ঘটনাটি চোখ ঝলসে দিয়েছে তার। পাথর ও ধাতুর রূপ গুণ তুলনা করে তার বিস্ময় আর শেষ হয় নি।

এই গলিত ধাতু আবার ঠাণ্ডা হয়ে জমে গেল, 'পাথর' বনে গেল অনেকটা। তাকে যে আবার গলিয়ে নিজের খুশি মত ঢালা যায়, প্রায়

মাটির মত তাকেও ইচ্ছানুযায়ী রূপ দেওয়া যায় ছাঁচের সাহায্যে, ক্রমশ তা শিখবার পর ধাতুবিদ্যা সম্পূর্ণ আয়ত্ত হল মানুষের। কঠিন পাথর থেকে তরল ধাতু, আবার তরল থেকে পাথরের মত কঠিন বস্তু এই রূপান্তর আর একটি অলৌকিক ঘটনার মত দেখিয়েছে।

বলা বাহুল্য ধাতুর এই গলনীয়তা কাজের পক্ষে অত্যন্ত সুবিধাজনক। উপরন্তু পাথরের তুলনায় তামার আর একটি সুবিধা এই যে কেটে বেঁকিয়ে পিটিয়েও তার কিছুটা রূপান্তর সম্ভব। তা ছাড়া দেখা গেল তামার কুড়াল বা বর্শা-ফলকে ধার বেশী দিন টেকে, তাদের মুখ অত সহজে চটে যায় না, ক্ষয়ে যায় না ; আর তার পর কখনও তাকে একেবারে ফেলে দেওয়ার দরকার নেই, অকেজো হয়ে পড়লে গলিয়ে আবার নতুন কিছু বানিয়ে নিলেই হল। তামার সরঞ্জাম বানাতেও আলাদা আলাদা খণ্ড তাতিয়ে জুড়ে দেওয়া চলে। এত সুবিধা সত্ত্বেও কিন্তু পাথর থেকে ধাতুতে পরিবর্তন আকস্মিক বিপ্লবের মত ঘটে নি, পাথর হাড় তামা অনেক দিন পাশাপাশি চলেছে। তার একটা কারণ সম্ভবত এই যে উপযুক্ত তাম্রবাহী পাথর সাধারণ পাথরের মত সর্বত্র সহজলভ্য নয়, বিশেষত পলিযুক্ত আবাদী জমির কাছাকাছি ; দ্বিতীয়ত, মানুষ সহজে সনাতনকে ছাড়তে চায় না।

ধাতুশিল্প সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে মানুষকে অনেকগুলি ছোট বড় উদ্‌ভাবনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। সব রকম খনিজের এক ব্যবস্থা নয়, অক্‌সাইড জাতীয় পাথরকে কাঠকয়লার সঙ্গে পোড়ালেই তামা বেরিয়ে আসে, কিন্তু সাল্‌ফাইড থেকে ধাতু মুক্ত করতে তাকে আগে বাতাসে তাতিয়ে গন্ধক তাড়িয়ে নিতে হয়েছে। নিষ্কাশনের সময়ে অক্‌সিজেন থাকলে চলে না, সুতরাং বাতাস চলাচল এড়াবার জন্য ঢাকা চুলা দরকার। এ রকম ব্যবস্থা অনেক জায়গায় হাতের কাছেই ছিল, কারণ মাটির পাত্রের রং নিয়ন্ত্রণ করতে হলে ঢাকা চুলাই শ্রেয়, চিত্রিত ভাণ্ড পোড়াতে তা অনিবার্য। যে সব সম্প্রদায় ঘটে নকশা আঁকত তাদের ঘরেই যে তামা নিষ্কাশনের প্রথম চিহ্ন মেলে সেটা তাই কিছু আশ্চর্য নয় ; অবশ্য নিষ্কাশনী চুলা ক্রমশ কুমারের চুলার থেকে আরও উন্নত হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ধাতু উদ্ধারের রাসায়নিক নীতিটি আমাদের কাছে একেবারে এ কালে স্পষ্ট হয়ে থাকলেও তার রীতি জানা হয়ে গিয়েছে বহু কাল আগে।

কিন্তু সে কালের ধাতুবিজ্ঞান অবশ্য নিষ্কাশনেই থেমে থাকে নি, এর পরে গলন ও ঢালাইর রহস্য শিখেছে ধাতুকর্মী ; সেই কাজে আরও উন্নত চুলার প্রয়োজন—পাথর থেকে তামা উদ্ধার করতে তাপ দরকার ৭০০-৮০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, কিন্তু উদ্ধৃত ধাতুর ঢালাইতে ১০৮৫ ডিগ্রি। সম্ভবত ইরাকেই এই কীর্তিটি প্রথম সাধিত হয়েছিল।

নিষ্কাশন ও ঢালাইর উপযুক্ত তাপ তুলতে আগুনের উপর জোরে হাওয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়েছে, যদিও হাঁপরের প্রত্যক্ষ প্রমাণ ১৬০০ বিসির আগে পাওয়া যায় না। যেমন বিশেষ চুলা পাত্র সাঁড়াশি ইত্যাদির সৃষ্টিতে, তেমন ছাঁচ বানাতে অনেকখানি কল্পনা ও নৈপুণ্য দরকার হয়েছে, বিশেষত যেখানে দুটি খণ্ড ঠিক মুখে মুখে মিলবে। ঐতিহাসিক কালের আগেই ইরাকে ছাঁচ তৈরির এক সুন্দর কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছিল যা এখনও ব্যবহার হয় : প্রথমে মোম দিয়ে এক প্রতিকৃতি বানিয়ে তার উপর মাটি মেখে পুড়িয়ে নিতে হবে ; খোলটি শক্ত হয়ে গেলে গলিত মোম বার করে নিয়ে গলিত ধাতু ঢালতে হবে ভিতরে ; ধাতু জমাবার পরে মাটির খোল ভাঙলেই আসল বস্তুটি পাওয়া গেল। এই ধরনের চাতুরির ফলেই ধাতুকর্মীরা ঐতিহাসিক কালে, এবং সম্ভবত আগেও, আশ্চর্য রহস্যজ্ঞানী বলে গণ্য হয়েছে, যেমন আজকের পৌরাণিক সমাজেও হয়ে থাকে।

তামার আস্বাদ পেয়ে মানুষ নিশ্চয় নানা রকম পাথর নিয়ে পরীক্ষা করেছে—ভিন্ন ধাতু কিংবা সম্ভবত তামারই খোঁজে—তার ফলে হাতে পেয়েছে রূপা ও সীসা ; এগুলির দেখা মেলে প্রাগৈতিহাসিক মিশরের কবরে। সব ধাতু উদ্ধারের শিল্প ঠিক এক নয়, সেগুলি নতুন করে শিখতে হয়েছে। তামার সঙ্গে অন্য ধাতু মেশালে ঢালাই সহজ হয়, তৈরী মালটিও হয় বেশী পাকা ও নির্ভরযোগ্য ; শতকরা মাত্র দশ ভাগ কি তারও কম টিন মিশ্রিত থাকলে পাওয়া যায় কাঁসা, এই সংকরধাতুর আবিষ্কার হয়েছে খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রকের মাঝামাঝি, ৩০০০ বিসির আগেই ভারত ইরাক তুরস্ক ও গ্রীসে তার গুণ জানা ছিল। অথচ খাঁটি টিন কিন্তু উদ্ধৃত হয়েছে পরে, সুমের ও সিন্ধু উপত্যকায় ৩০০০ বিসির অল্প পরে সে বিদ্যার প্রমাণ মেলে। তামা ও টিন অনেক সময়ে একই আকারে থাকে বলে তাদের থেকে সোজাসুজি কাঁসা তৈরি সম্ভব হয়েছে—হয়তো এই রকম আকস্মিক মিশ্রণের ফলেই

আবিষ্কারটি ঘটেছে, সম্ভবত সুমেরে কিংবা ভারতে। সোনা প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই মানুষের পরিচিত ও আদৃত, তবে ধাতুটি মুক্ত অবস্থায়ই মেলে, সুতরাং সেখানে ধাতুবিদ্যা বা রসায়নের প্রয়োগ খুব ছিল না। সোনা তখন এত দুষ্প্রাপ্য ছিল না, অনেক সময়ে ধাতব অবস্থাতেই নদীর বালিতে ছড়িয়ে থাকত।

প্রাচীন ভারতীয়দের সোনা আহরণ সম্বন্ধে হেরোডোটাসের ইতিহাসে এক মজার গল্প আছে। ভারতের উত্তরে তখন নাকি এক মরুভূমি, ছিল তার বালিতে অনেক সোনা। সেখানে এক জাতের পিঁপড়ের বাস, তারা আকৃতিতে "শেয়ালের চেয়েও বড়"। দুপুরের গরমে এরা যখন ঘুমিয়ে পড়ত তখন ভারতীয়রা উটে চড়ে গিয়ে সংগ্রহ করে আনত বালি। ঘুম থেকে উঠে পিঁপড়ের দল অতি দ্রুত তাড়া করত তাদের, তখন মরদা উট-গুলিকে ফেলে তারা মাদীগুলিকে নিয়ে কোনও গতিকে ঘরে ফিরত; নিজেদের সন্তানের আকর্ষণে মাদীরা যেমন ছুটত মরদারা তেমন পারত না বলে তারাই এই অতিকায় পিঁপড়ের পেটে যেত।

সোনা নরম ও অল্প তাপে নমনীয়, সুতরাং সে কালের মানুষ সহজেই তাকে কাজে লাগিয়েছে অলংকার ও অন্যান্য দ্রব্য গড়তে। আদি ঐতিহাসিক কালেই রাজা রাজড়াদের উপকরণ সৃষ্টিতে স্বর্ণকার ও অন্যান্য কর্মকারের নৈপুণ্য ও সৌন্দর্যবোধ দেখলে অনেক সময়ে বিস্মিত হতে হয়, যেমন সুমেরে ও মিশরে। মহেনজোদারো-হরপ্পার অলংকার সম্বন্ধে সার জন মার্শালের মত পণ্ডিত মন্তব্য করেছেন যে এগুলির সৌন্দর্য ও সৃষ্টিকৌশল দেখলে মনে হয় যেন আধুনিক লণ্ডনের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের কাজ। প্রস্তর যুগের পূর্বপুরুষেরাই এ সব ঐতিহ্যের সূচনা করেছে। পুরামানবদের কাজ সর্বদা রুক্ষ ও নিকৃষ্ট এমন ধারণা মনে থাকলে অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে যাওয়া দরকার কোনও সুযোগ্য সংগ্রহস্থলে, যেমন ব্রিটিশ মিউজিয়ামে; তেমন জায়গায় পৌরাণিক ঘরগুলিতে ঘুরে ঘুরে আদি কালের মিস্ত্রির চমৎকার সৃষ্টি আবিষ্কার করা অতি রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। নানা কালের ও নানা উপাদানের মধ্যেই বিস্ময়কর কৃতিত্ব চোখে পড়বে: ঐতিহাসিক কালে হয়তো এক কাঁসার ঢালের গায়ে কারুকাজ, 'অসভ্য' নবপ্রস্তর যুগে মাটির ঘটের গায়ে আলপনা কিংবা আরও আগের সৃষ্টি সামান্য পাথুরে হাতুড়ির মার্জিত সৌষ্ঠব দেখে

মনে হবে যেন এ যুগের কাজ, প্রাচীনতর মধ্যপ্রস্তর মানুষ তার রুক্ষ চকমকির ছুরি দিয়ে বলগা-হরিণের শিং কেটে বানিয়েছে যে মাছ ধরবার কাঁটা তার সূক্ষ্ম পরিপাটি গঠনের প্রতি আবদ্ধ হবে সপ্রশংস দৃষ্টি। কিন্তু এ সব স্বষ্টির গুণ সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করতে হলে প্রত্যক্ষ পরিচয় দরকার, ছবিতে ঠিক উপলব্ধি হয় না।

বিশেষত্ববর্জিত সাধারণ পাথর থেকে আরম্ভ করে অন্য দিকে ব্যবহার্য ধাতব উপকরণ বা অলংকারটি পর্যন্ত পৌঁছাতে নবপ্রস্তর যুগের প্রথম ধাতু-কর্মীদের যে ছোট বড় নানা সমস্যার সমাধান করতে হয়েছে, হাজার রকম খুঁটিনাটির দিকে নজর দিতে হয়েছে তা সহজেই অনুমেয়। এর ফলে ভূতত্ত্ব রসায়ন পদার্থবিদ্যা বলবিদ্যা এনজিনিয়ারিং ইত্যাদির অনেক তথ্য ও প্রয়োগ মানুষকে শিখতে হল। কিন্তু এ সবেরই মূলে সম্ভবত জাদু আর অন্ধবিশ্বাস ...সেই কবে হয়তো কার রক্ষাকবচের ম্যালাকাইট মণিটি হঠাৎ আগুনে পড়ে এই জ্ঞানভাণ্ডারের চাবি মানুষের হাতে তুলে দিয়েছে। আবিষ্কারের ক্ষেত্রে কিসের থেকে যে কি হয়, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় তা কেউ বলতে পারে না—এবং এ সত্যের প্রমাণ আজও প্রায়ই মেলে।

ধাতুবিজ্ঞান সম্পূর্ণ ব্যবহারিক, আর মণি রত্ন অলংকার জাদুকে ঘিরে নবপ্রস্তর মানুষের মনে গড়ে উঠেছিল একান্ত ভাবের জগত। এ বার সেই জগতে একটু খানি উঁকি দেওয়া চলতে পারে।

বহু পুরা কালেই যে মানুষ দূর দূরান্তর থেকে কড়ি শুক্তি শাঁখা সংগ্রহ করেছে তা আমরা জানি। নবপ্রস্তর কালে মিশরের গ্রামে ভূমধ্য ও লোহিত সাগরের খোলক দেখা যায়, পরে ক্রমশ ঐ দেশেরই কবরে ম্যালাকাইট লাজাবর্দ জামিরা টারকইজ অবসিডিয়ান এবং রজনজাত রত্নের সাক্ষাৎ মেলে ; এ সবই দূর দেশ থেকে প্রায়ই দুর্গম পথ বেয়ে আনা। সিরিয়া অ্যাসিরিয়া ও সুমেরেও দেখা যায় মণি রত্নের আমদানি অতি প্রাচীন কাল থেকে ক্রমশ বেড়ে চলেছিল। সম্ভবত স্থায়ী বসতির মধ্যে মধ্যে বেদুইনদের মত যাযাবর ব্যাপারীদের আনাগোনা চলত, এ সব পণ্যের পরিবর্তে চাষী সম্প্রদায়ের থেকে খাদ্য সংগ্রহ করত তারা।

দেখতে সুন্দর বলে মণি রত্ন অবশ্য প্রথমে সম্পূর্ণ বিলাসের সামগ্রী হিসাবে সংগৃহীত হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু পরে তারা যে নিতান্ত প্রয়োজনের

বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আবার এমন কথাও বলা হয়েছে যে আগে তারা ছিল জাদুবস্তু, পরে হয়েছে অলংকার। কোনওটা হয়তো বৃষ্টি আনত মাঠে, কারও প্রভাবে সন্তান আসত ঘরে। গ্রীসীয় নারীরা 'দুগ্ধশিলা' গুলে খেত দুগ্ধবতী হবে বলে। এ বিষয়ে বেশী বলবার প্রয়োজন নেই—আজও আমরা নীলার আংটি পরি রোগ সারাতে, কবচ ধারণ করি শত্রুর দ্বেষ কাটাতে বা রেসের ঘোড়াকে জেতাবার আশায়। মণি রত্নের ক্ষমতা সম্বন্ধে এ ধরনের সংস্কারের জন্ম নবপ্রস্তর সমাজে, যদিও এরই পূর্বাভাস পাওয়া যায় আরও প্রাচীন কালে কড়ির মত অল্পমূল্য বস্তুকে ঘিরে। শুধু পাথর জহর কিংবা কড়ি ঝিনুকের নয়, সোনা রূপারও এই রকম সাংকেতিক অর্থ নিশ্চয় গড়ে উঠেছিল সে কালে। এদের মোহিনী বর্ণচ্ছটা ও রূপবৈচিত্র্যের থেকেই হয়তো জন্মেছে অলৌকিকতার ধারণা, কিন্তু কখনও কখনও সংস্কারের আড়ালে যুক্তির ইশারাও মেলে ; মিশরের লোকে ম্যালাকাইটের সবুজ রং লাগাত আঁখিপল্লবে, তাতে চোখের শোভা বাড়ত নিশ্চয়, কিন্তু দেখা গেল সে অঞ্চলের এক চক্ষুরোগও সারে (ম্যালাকাইটের অন্তর্গত তামা জীবাণুনাশক) ; যা ছিল প্রসাধনের বস্তু মাত্র তা হয়ে দাঁড়াল দৈব শক্তির আধার।

এই সব আশ্চর্য বস্তুর ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা আরও বাড়াবার উদ্দেশ্যে তাদের নানা রকম মূর্তি দিয়েছে সে কালের মানুষ, এর থেকেই বিবিধ কবজ তাবিজের সৃষ্টি। মণি কেটে ষাঁড়ের প্রতিকৃতি বানিয়ে তা ধারণ করলে ঐ জন্তুটির শক্তি সঞ্চারিত হবে দেহে। জহর কাটার কঠিন শিল্পটি গড়ে উঠল। মূর্তি বা সংকেত কখনও বা খোদাই করে আঁকা হত মণির গায়ে—সৌভাগ্যের প্রতীক স্বরূপ বিখ্যাত স্বস্তিকা চিহ্ন তখনই এ ভাবে ব্যবহার হয়েছে। সম্পত্তির মালিকানা বোঝাতে বা তার নিরাপত্তার জন্য এগুলি দিয়ে সীলমোহরের কাজও হত, জিনিসের গায়ে কাদা লেপে এর ছাপ দিয়ে দিলে তখন দৈব শক্তি তার রক্ষক, তা অন্যের অধিকারের বাইরে—যাকে বলে 'ট্যাবু'। হোরোডোটাস বর্ণিত ব্যাবিলনে নাকি প্রত্যেকেরই নিজের নিজের সীল ছিল। দৈব শক্তির উপর নির্ভরতা এ যুগে কমে গিয়ে থাকলেও সীলের এই ব্যবহার এখনও অপরিবর্তিত। লেখা আবিষ্কারের পর সীল দস্তখতের কাজও করেছে। কোনও কোনও লিপিও হয়তো এরই থেকে উদ্ভূত—

প্রাথমিক লেখন সম্পূর্ণ চিত্রলিপি, পরে তা সংকেতে পরিণত হয়েছে; সীলমোহরে চিত্র ও সংকেত দুইই দেখা যায়।

লিপির ব্যবহার থেকে সভ্য যুগের সূচনা গণ্য করা হয় এবং সেই সভ্যতা যে গড়ে উঠেছে শহরকে কেন্দ্র করে তা আগে বলেছি। আজও দেশে দেশে সভ্যতার বাহ্যিক রূপ সবচেয়ে প্রত্যক্ষ ভাবে প্রতীয়মান শহরের চেহারায়, তার হর্ম্যমালায়। এই সৌধশ্রেণীর বনিয়াদও আর একটি প্রাগৈতিহাসিক উদ্ভাবন—আমাদের পরিচিত সামান্য ও সাধারণ ইট।

মানুষ যখন তার অস্থায়ী যাযাবর জীবন ত্যাগ করল তখন থেকে সে নিজের বাসগৃহের দিকে বেশী নজর দিতে আরম্ভ করেছে, তারই পরিণতি আজকের আকাশচুম্বী অট্টালিকায় অথবা মনোরম ক্ষুদ্র কুটীরে। মিশরের চাষীরা প্রথমে দেয়াল বানিয়েছে নলখাগড়ার গায়ে কাদা লেপে, সুমেরীদের পূর্বপুরুষরা সুড়ঙ্গের মত ঘর বানাত খাগড়ার গোছার উপরে মাদুর চাপিয়ে। দেখতে দেখতে মিশর ও এশিয়াতে দেখা দিল মাটির ঘর, যার প্রচলন আজও ব্যাপক। তার পর এল প্রথমে রোদে শোকানো কাঁচা ইট, পরে পোড়া ইট—স্থায়ী বা বৃহৎ গৃহের যা কেহকোষ, আজও সৌধশিল্পের প্রাণবস্তু। ৩০০০ বিসির অনেক আগেই ইট তৈরি হয়েছে সিরিয়া কিংবা ইরাকে। সম্ভবত মেসোপটেমিয়ার আদিতম শহরগুলিতেই ইটের প্রথম ব্যবহার; পরস্পর ইট জুড়তে প্রধান গৃহগুলিতে ব্যবহার হত শিলাজতু, আর সাধারণ ঘরে কাদা—দুইই দেড় ইঞ্চি পুরু করে। রোদে শোকানো কাঁচা ইট এবং আগুনে পোড়া ইট দুয়েরই প্রায় সমান প্রয়োগ দেখা যায় ঐতিহাসিক কালে সুমেরী সভ্যতা পর্যন্ত, তার পর কাঁচা ইট ধীরে ধীরে অপ্রচলিত হয়ে পড়ল। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে য়োরোপের রোমীয় সভ্যতার প্রতিষ্ঠা-কালে দুই ইটই ব্যবহার হয়েছে, এবং এমন কি প্রায় সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত কাঁচা ইট সেখানে কোথাও কোথাও দেখা যায় (যেমন ইংলণ্ডে নরফোক অঞ্চলের প্রাচীন কুটীরে)।

ইটের উদ্ভাবনে আর কিছুই নেই, এক তাল কাদার সঙ্গে খড়ের টুকরো মিশিয়ে কাঠের ছাঁচে চেপে তাকে সমরূপ আকৃতি দেওয়া, পরে রোদে শুকিয়ে কিংবা আগুনে পুড়িয়ে তাকে শক্ত করা; কাদা পোড়াবার বিদ্যা তো আগেই জানা ছিল। কিন্তু এই সহজ ও সামান্য বস্তুটি হাতে পেয়ে

গৃহনির্মাতার স্বাধীনতা ও ক্ষমতা অনেকখানি বেড়ে গেল। এর আগে পোড়া মাটির রহস্য শিখে যেমন পাত্র সৃষ্টিতে মানুষ কল্পনার রাশ ছেড়ে দিতে পেরেছিল, এ ক্ষেত্রেও তেমনি নিজের খুশি মত ইটের পর ইট সাজিয়ে নানা আকৃতি নানা রূপ নিয়ে খেলা করা সম্ভব হল—এক কথায় জন্ম নিল প্রকৃত স্থাপত্যশিল্প, সম্ভব হল বৃহদাকার গৃহ নির্মাণ।

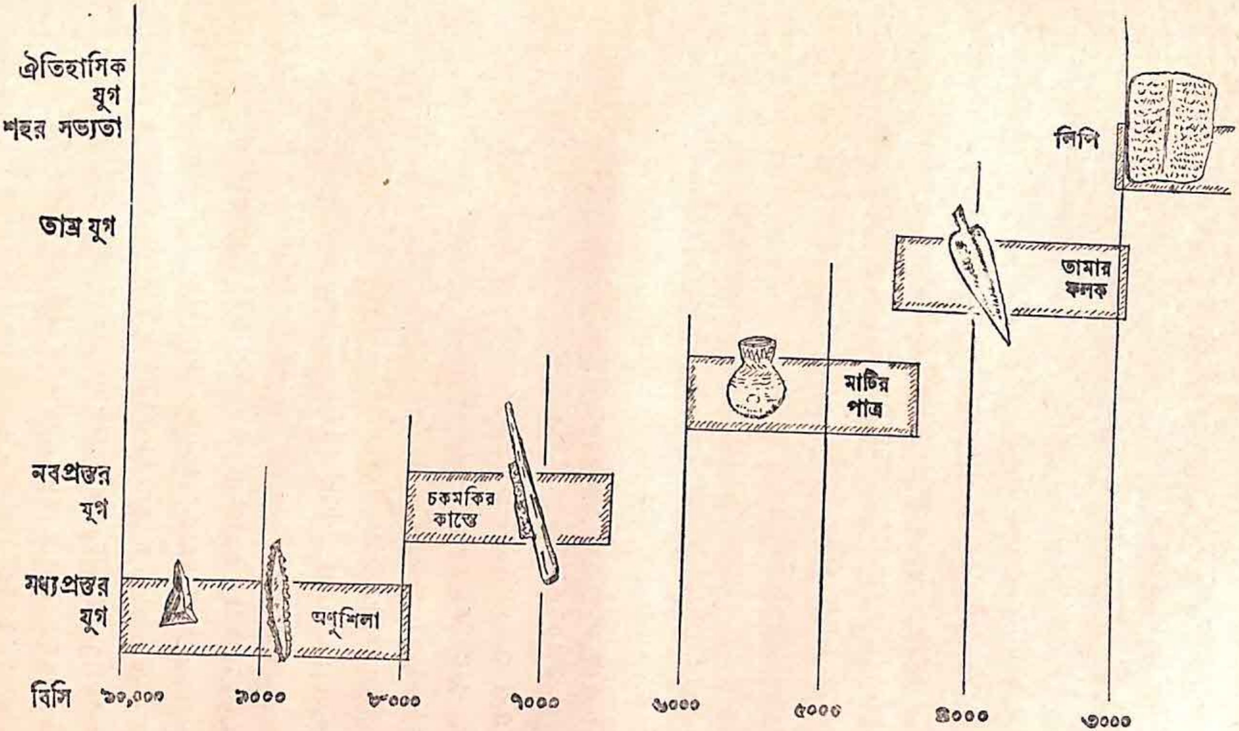
অবশ্য, যেমন দেখা গিয়েছে প্রথম পাত্র ভাণ্ডারের রূপায়ণে, তেমনি গৃহের পরিকল্পনাও আদি কালে মামুলী মূর্তির প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারে নি। এই ধরনের অনুকরণ কি করে যুগের পর যুগ চলে আসতে পারে তার একটি দৃষ্টান্ত আজও দেখা যায় ঢেউকাটা স্তম্ভে; ইট ব্যবহারের অনেক আগে মিশরীরা নলখাগড়ার গোছা দিয়ে থাম বানাত, পরে গ্রীসীয়রা যখন মর্মর-স্তম্ভ বানাতে শিখল তখন তারা তার গোল দেহ খুঁড়ে ঢেউ খেলিয়ে দিল সনাতন চেহারার সঙ্গে মেলাবার জন্য; ফ্যাশানের এমনই প্রভাব যে আজ এই সিমেন্ট কংক্রিটের যুগেও রমণীয় সৌধের পুরোভাগে এই স্তম্ভশ্রেণীর স্থান। আদি কালের সুমের অঞ্চলের খাগড়ার ঘর যে সুড়ঙ্গের মত দেখতে ছিল তা একটু আগে বলেছি, পরে ইট দিয়ে এরই গোল ছাত অনুকরণ করতে গিয়ে সুমের কিংবা অ্যাসিরিয়ার লোকে প্রকৃত খিলান আবিষ্কার করেছে এবং এর মাধ্যমে বলবিদ্যার অনেক জটিল নীতি অজ্ঞাতসারে প্রয়োগ করেছে গৃহ নির্মাণে। এমনি আরও কত আবিষ্কার হাজার হাজার বছর প্রয়োগ করে তবে মানুষ ধরেছে তাদের অন্তর্নিহিত বৈজ্ঞানিক নীতি।

কিন্তু মানুষের স্বাভাবিক বিজ্ঞান-প্রতিভা সবচেয়ে বেশী আত্মপ্রকাশ করেছে সে কালের আর একটি আবিষ্কারে, এবার তার কিছু পরিচয় দিয়ে এই দীর্ঘ তালিকা শেষ করব। আজ আমরা কাল মাপি সৌর বর্ষপঞ্জী বা ক্যালেনডার দিয়ে, তার মানদণ্ড হল সূর্যকে ঘিরে পৃথিবীর পরিক্রমণ। চাঁদের মত সূর্যের দৈনিক বৃদ্ধি বা ক্ষয় নেই, কালের গতির সঙ্গে চাঁদের পরিবর্তন প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট, সুতরাং স্বভাবতই প্রথমে মানুষ চান্দ্র মাস দিয়ে কাল মেপেছে। ঐতিহাসিক কালের ব্যাবিলনীয় ক্যালেনডারে দেখা যায় বছরকে তেরটি চান্দ্র মাসে ভাগ করে যেন বীজবপনের সময় নির্ধারণের চেষ্টা, কিন্তু নির্দিষ্ট সংখ্যক চান্দ্র মাস দিয়ে কোনও সৌর ঘটনার ব্যবধান মাপা

যায় না। তা সত্ত্বেও পঞ্জিকা রচনায় চাঁদের প্রভাব যে আমরা কাটিয়ে উঠতে পারি নি তার প্রমাণ আজও মেলে—এবং শুধু অনগ্রসর সেকেলে সমাজেই নয়; যিশুর ক্রুশ-মৃত্যু ও পুনরুত্থানের বার্ষিক অনুষ্ঠান ঘুরে ঘুরে আসে বড়দিনের মত নির্দিষ্ট তারিখে নয়, নির্দিষ্ট তিথিতে—চাঁদের অনুশাসন অনুসারে; এবং এ ব্যবস্থার সংস্কারের সব চেষ্টা এ যাবৎ ভীষণ প্রতিবাদের মুখে ভেসে গিয়েছে। সৌর বর্ষের আবিষ্কার অনুসারে বর্ষগণনা তাই শুধু অনেকখানি চিন্তাশক্তি ও বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির পরিচায়ক নয়, মানুষের স্বাভাবিক সংস্কারানুগত্যের উপর মস্ত বড় জয়।

সৌর পঞ্জীর উৎপত্তি মিশরে, সম্ভবত মেনেস রাজার আধিপত্য কালে, যাঁর থেকে সে দেশে ইতিহাসের সূচনা। (আগে মিশর উত্তর দক্ষিণ দু ভাগে বিভক্ত ছিল, ইনিই দক্ষিণ থেকে এসে সর্বপ্রথম দেশকে যুক্ত করেন ৩২০০ বিসির কাছাকাছি।) নীল নদীতে প্রতি বছর প্লাবন আসত সে কথা আগে বলেছি, তার উপর কৃষকের কাজ অনেকখানি নির্ভর করত। মৌসুমী মেঘ চলতে চলতে অ্যাবিসিনিয়ার পাহাড়ে পৌঁছে ভাঙত, তার থেকেই এই প্লাবনের উৎপত্তি, সুতরাং পৃথিবীর প্রদক্ষিণের সঙ্গে তার নিকট সম্পর্ক এবং সাধারণত একই দিনে তা দেখা দিত নীল নদীতে। সুতরাং প্রদক্ষিণ কাল, অর্থাৎ সৌর বর্ষ, জানতে পারলে তবেই প্লাবনের তারিখ পূর্বাহ্নে হিসাব করা সম্ভব।

এই নিতান্ত ব্যবহারিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মিশরীরা দুই প্লাবনের মধ্যবর্তী দিনের সংখ্যা গুনে রাখতে আরম্ভ করলে, বেশ কয়েক বছর পর গড় কষে বার হল ৩৬৫। এরই ভিত্তিতে মিশরে প্রথম সৌর পঞ্জীর সৃষ্টি—বছরে দশটি মাস, মাসে ৩৬ দিন আর অন্তর্বর্তী দিন পাঁচটি। কিন্তু ঠিক ৩৬৫ দিনে এক বছর নয়, গণনায় প্রায় ছ ঘণ্টা ভুল ছিল, তার ফলে প্লাবনের দিন প্রতি বছর অল্প একটু পিছিয়ে যেতে লাগল, এক শতাব্দী পরে তা বছরের পয়লা দিনে না এসে এল ২৫ তারিখে। কিন্তু তখন একটি তারার উদয়কে নিশানা করে সে কালের জ্যোতিষীরা এই ভুলটাও সংশোধন করলে; কায়রো এলাকা থেকে লক্ষ করলে এই সিরিয়াস বা লুব্ধক তারা ঠিক ভোরের আগে দিগন্ত ছুঁয়ে দেখা দিত। তখন থেকে এরই নির্দেশ অনুসারে সংশোধিত পয়লা তারিখে (আমাদের ১৯ জুলাই) কৃষির কাজ শুরু হত,



৪৪নং চিত্র

মধ্যপ্রস্তর যুগের পরে মধ্যপ্রাচ্যে মানুষের অগ্রগতির বিভিন্ন ধাপ ; তারিখ আনুমানিক।

যদিও সাবেক সরকারী ক্যালেনডারটিও প্রচলিত থাকল; দিন ফুরিয়ে গেলেও সরকারী ফতোয়া বা লোকাচার আজও তো সহজে মরে না।

পরবর্তী ঐতিহাসিক কালে, মিশরে ও অন্যত্র, বর্ষ গণনায় ও ক্যালেনডার প্রবর্তনে রাজা এবং শাসক গোষ্ঠীর প্রভাব স্পষ্ট। এমন ধারণা প্রকাশ করা হয়েছে যে এরা রাজকীয় ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিল পঞ্জিকার সাহায্যে নীল নদীর বন্যার মত ভবিষ্যৎ বার্ষিক ঘটনার তারিখ বলতে পেরে। মিশরেই হয়তো নতুন নির্ভুল ক্যালেনডারটি চালু করা হয় নি, প্রজার কাছে তা গোপন রেখে তার চোখে রাজার 'ঐশী শক্তি' বাড়াবার লোভে, এমন কথাও বলা হয়েছে। অবশ্য রাজার মনও নিশ্চয় সংস্কারমুক্ত ছিল না, তিনি নিঃসন্দেহে ভাবতেন লুব্ধক দেব উদিত হয়ে বন্যাকে হুকুম করেছেন হাজির হতে! এই ধরনের বোধবিকারের থেকেই ছদ্ম জ্যোতিষ বা অ্যাসট্রলজির উদ্ভব।

সে যাই হক, মিশরে সৌর পঞ্জীর সৃষ্টি বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক অতি বড় ঘটনা। হোরোডোটাস পর্যন্ত স্বীকার করেছেন যে এখানে গ্রীসীয়দের উপরেও তারা টেক্কা দিয়েছে। বিজ্ঞান যে ভবিষ্যৎ বলে দিয়ে আমাদের উপকার সাধন করতে পারে আজ তা আমরা নানা ভাবে জেনেছি, কিন্তু বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যদ্‌বাণীর উদাহরণ এই প্রথম। আজ যে ক্যালেনডার আমরা ব্যবহার করি তা এরই সাক্ষাৎ বংশধর। আর একটা কথা: সৌর পঞ্জীর উদ্ভব সম্বন্ধে উপরে যা বলা হল তাতে বোঝা যায় যে হিসাবের কাজে (যেমন বছরের গড় দিন সংখ্যা বার করতে) মিশরীদের কিছু কিছু পাটিগণিত জানতে হয়েছে; গণনা ও গণিতের এত কাজ সংখ্যা ও লেখার সাহায্য ছাড়া অনুমান করা কঠিন। প্রথম মিশরী চিত্রলিপিরও দ্রুত উদ্ভব হয়েছিল মেনেসের অব্যবহিত আগে এই রকমই সাধারণ ধারণা; মেনেসের কালে এই লিপির বিকাশ খুবই স্পষ্ট। প্রাগিতিহাস-ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে দেখা দিল সাংকেতিক সংখ্যা, সাংকেতিক লিপি ও বর্ষপঞ্জী।

নবপ্রস্তর যুগের বিবিধ আবিষ্কার ভারতে কখন কি ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে বিষয়ে আমাদের কৌতূহল স্বাভাবিক, কিন্তু ভারতীয় নবপ্রস্তর কৃষ্টি বলতে কোনও একটি সুসংবদ্ধ সংহত চিত্র চোখে পড়ে না, এই কৃষ্টির

বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নানা অঞ্চলে নানা কালে দেখা দিয়েছে। তা ছাড়া এ সম্বন্ধে এ দেশে নির্ভরযোগ্য প্রত্নতাত্ত্বিক কাজ হয়েছে অল্পই, ফসিলের অভাবে সে কালের মানুষদের সম্বন্ধে আমাদের কল্পনাও অনেকটা আড়ষ্ট। ঘষা পাথরের যে কুড়ালের থেকে নবপ্রস্তর যুগের আখ্যা, ভারতের নানা অঞ্চলে তা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, কখনও বা অণুশিলার সঙ্গে। দাক্ষিণাত্যে ও উপদ্বীপীয় ভারতের কোথাও কোথাও বেড়াতে বেড়াতে ঘষা কুড়াল বা কুড়ালি আবিষ্কার করা কিছু আশ্চর্য নয়। পুরা কালের এ বস্তুটি আজ পর্যন্ত পূজায় ব্যবহার হয় এ দেশের কোনও কোনও অঞ্চলে, যেমন দক্ষিণ ভারতের গ্রাম্য মন্দিরাদিতে তা উৎসর্গ বা প্রতাক রূপে দেখা যায়; স্থতরাং কোনও এক জায়গায় ঘষা কুড়ালের আকস্মিক আবিষ্কার মানেই এই নয় যে প্রাগৈতিহাসিক কালে সেখানে বস্তুটি তৈরি বা ব্যবহার হয়েছে—যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া গেলে অথবা সেই কৃষ্টি-স্তরের অন্যান্য বস্তু সঙ্গে থাকলে তবেই তা প্রামাণিক। এই রকম অঞ্চল প্রায় ৮০ জানা আছে ভারতে, মানচিত্রের গায়ে বোম্বাই থেকে কানপুর পর্যন্ত এক দাঁড়ি টানলে এগুলি পড়ে প্রধানত তার দক্ষিণ-পুবে, নিচের দিকে কাবেরী নদী পর্যন্ত; একেবারে দক্ষিণে (এবং সিংহলে) ঘষা কুড়ালের দেখা মেলে না।

কৃষির চিহ্ন এ দেশে প্রথম দেখা যায় উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে, বেলুচিস্থানে ও সিন্ধু প্রদেশে, গম ও যব জাতীয় শস্য দিয়ে তার শুরু, সম্ভবত ৩০০০ বিসির অল্প আগে। পক্ষান্তরে মধ্য ভারতে (এবং কাশ্মীরে) নবপ্রস্তর যুগ খৃষ্ট জন্মের পাঁচ শতাব্দীর বেশী প্রাচীন নয়। দক্ষিণ ভারতে অন্তত কোনও কোনও অঞ্চলে এ যুগের সূচনা অনেকটা সাম্প্রতিক কালে, খৃষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রকে। অন্ধ্রের চেন্‌চু সম্প্রদায় এখনও যাযাবর সংগ্রাহক, তাদের প্রাচীন খাদ্য মূল, মাটি খুঁড়ে তা সংগ্রহ করতে তারা যে লোহার কাঁটা ব্যবহার করে ধাতুর সঙ্গে ঐটুকুই তাদের সম্পর্ক।

কি ভাবে ভারতে নবপ্রস্তর যুগের শুরু তা খুব স্পষ্ট নয়, তবে সম্ভবত কৃষি এ দেশে স্বাধীন আবিষ্কার নয়, পশ্চিম দেশের লোক সে যুগের নানা শিল্প সঙ্গে করে এনেছে এ দিকে। (পশ্চিম থেকে এ অঞ্চলে সে কালে জনসমাগমের সম্ভাবনার কথা অণুশিলার প্রসঙ্গেও উল্লেখ করেছি আগে।) উত্তর পশ্চিমে কৃষি ও মৃৎপাত্র সম্ভবত পশ্চিমের আমদানি হলেও পুবের দান

কম নবপ্রস্তর যুগের এই পর্বেও। ঘষা বা পালিশ করা কুড়াল যে পূর্ব ভারতীয় তা আমরা দেখেছি, বাইরে ব্রহ্ম মালয় লাওস টংকিং ইত্যাদি এলাকায়ও তা পাওয়া যায় ; সার মর্টিমার হুইলার মনে করেন যে বস্তুটি অন্তত সোজাসুজি পশ্চিম এশিয়ার থেকে আসে নি, বরং ইঙ্গিত যেন মধ্য চীনের দিকে। আর যারা এই হাতিয়ারটি সঙ্গে করে এনেছে তাদের হয়তো ধাতুবিদ্যাও কিছু জানা ছিল। ধানের আমদানিও পুব দিকে থেকে ঘটে থাকতে পারে। আজ শুধু ভারতে নয়, পূর্ব এশিয়ার অধিকাংশ দেশে



৪৫নং চিত্র
পৃথিবীর তিনটি প্রধান শস্যক্ষেত্র।

ধানের চাষ ব্যাপক, চাল প্রাচীন উপজীব্য, কিন্তু শস্যটির প্রথম উৎপাদন অতীব অস্পষ্ট। কারও কারও মতে ইন্দোনেশিয়া অঞ্চলের বুনো ঘাস থেকে তার উদ্ভব। ধানের চাষ দিয়ে এশিয়ার পূর্ব প্রান্তে কৃষিবিদ্যা স্বাধীন ভাবে আবিষ্কার হয়ে থাকতে পারে। সাম্প্রতিক গবেষণার ফলে ভারতের আসাম অঞ্চলের ও ইন্দোচীনের নবপ্রস্তর কৃষ্টির মধ্যে নিকট সাদৃশ্য লক্ষিত হয়েছে এবং মনে হয় ঐ দেশ থেকে সে যুগে দুটি দলের আগমন ঘটেছিল ভারতে—প্রথমটি প্রাক্‌-আর্য কালে (১৫০০ বিসির আগে) স্থলপথে, দ্বিতীয়টি জলপথে এবং এইটিরই সঙ্গে ধানের চাষও প্রবেশ করেছে। এক মত অনুসারে সম্ভবত ১৫০০ বিসির আগেই চীনে ধানের চাষ হয়েছে, যদিও

ধান (এবং আমাদের পরিচিত গার্হস্থ্য মহিষ) দক্ষিণ চীনেরই নিজস্ব সম্পদ, না দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে তা চীনে ঢুকেছে তা এখনও স্পষ্ট নয়; চীন থেকে ধানের আবাদ একাধারে জাপান ও গঙ্গার অভিমুখে বিস্তৃত হয়েছে, দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ায় গমের সঙ্গে মিশেছে। আবার এমন মতও দেখা যায় যে সম্ভবত চীনের আগে ভারতেই প্রথম ধানের চাষ হয়েছে গঙ্গার কূলে কূলে, খবরটা সে দেশে পৌঁছেছে ইয়াংসি নদীর পথ ধরে, ২০০০ বিসির কাছাকাছি (সেখানে তখন কাংস্যযুগ), তার আগে চীনের সাবেক ফসল ছিল জোয়ার। হস্তিনাপুরে প্রায় ৩০০০ হাজার বছর পুরনো চাল পাওয়া গিয়েছে, এখন পর্যন্ত তাই প্রাচীনতম নিদর্শন এ দেশে। যাই হক, মনে হয় খৃষ্ট জন্মের আগেই দক্ষিণ এশিয়ার বন্য শিকারক্ষেত্র ধানখেতে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছিল।

মধ্যপ্রাচ্যের লোকে ধাতুর সঙ্গে পরিচয় করেছে কৃষি ও পশুপালনের অনেক পরে, কিন্তু ভারতে কখনও তেমন কোনও ব্যবধান ছিল বলে সাক্ষ্য নেই, দুই বিদ্যাই একত্র লভিত হয়ে থাকতে পারে। একেবারে আদি কৃষক সম্প্রদায়ে তামার উপকরণ বড় একটা দেখা যায় না, কিন্তু তার কারণ সম্ভবত দারিদ্র্য, অজ্ঞানতা নয়; অর্থাৎ ধাতু সংগ্রহের সংগতি ছিল না বলে অগত্যা তারা 'প্রস্তর যুগে' পড়ে ছিল। কিন্তু অনতিবিলম্বে স্থানীয় তামা ও টিনবাহী পাথর থেকে ধাতু উদ্ধার আরম্ভ হয়েছে দেখা যায়; এই দুই ধাতুর সংযোগে হয় কাঁসা, এবং ভারতের সব প্রাগৈতিহাসিক ধাতব কৃষ্টিই কাংস্যযুগের অন্তর্গত বলা যেতে পারে। গর্ডন চাইল্ড লিখেছেন যে কাঁসার প্রথম আবিষ্কার সিন্ধু উপত্যকায়ই ঘটে থাকতে পারে এবং ভারতীয় কাংস্যশিল্প সুমেরের সমপ্রাচীন। পক্ষান্তরে ভারতে কোথাও কোথাও তামা ও কাঁসার পাশাপাশি পাথরের কুড়ালও চলতি ছিল বহু দিন, এমন কি লৌহ যুগ শুরু হওয়ার ৩০০ বছর পরেও, যেমন দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণ দিকে ব্রহ্মগিরিতে। লৌহ যুগ সম্ভবত ৫০০ বিসির কাছাকাছি আরম্ভ হয়েছে দাক্ষিণাত্যে ও উপদ্বীপীয় ভারতে, উত্তরে হয়তো সামান্য আগে (প্রসঙ্গত যে ব্রিটেন আজ এত শিল্পোন্নত দেশ, সেও শুরু করেছিল প্রায় ঐ তারিখে)। আর, উপযুক্ত চুলায় পোড়ানো খাঁটি মৃৎপাত্র এ দেশে বোধ হয় ৩০০০ বিসির আগে তৈরি হয় নি।

ইতিপূর্বে আমরা ইঙ্গিত পেয়েছি যে পুব ও পশ্চিম দেশ থেকে কোপানি ও হাত-কুড়াল ভারতে প্রবেশ করেছে কয়েক লক্ষ বছর আগে; তেমনি অনেক সাম্প্রতিক কালে হয়তো যথাক্রমে ঘষা কুড়াল ও অণুশিলার জন্য ভারত আবার এই দুই অঞ্চলের কাছে ঋণী।

কি করে এ ধরনের বিদ্যা দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়েছে এ প্রশ্ন স্বভাবতই মনে জাগে এবং এর জবাব এখনও কিছুটা রহস্যাবৃত। সে কালে বই সংবাদপত্র বেতার তো ছিলই না, চলা ফেরা অনেক দুরূহ ছিল আজকের তুলনায়। বিদেশের জন সমাগম ঘটলে তাদের থেকে নতুন বিদ্যা শেখা অবশ্য সম্ভব এবং এই শিক্ষাই সবচেয়ে দ্রুত, কিন্তু পাড়ার থেকে পাড়ার পথ ধরেও ধীরে ধীরে ছড়িয়ে থাকতে পারে নতুন জ্ঞান; এক জায়গায় লোকে দেখলে প্রতিবেশীরা কোনও কাজে ধাতু ব্যবহার করছে সাবেক পাথরের পরিবর্তে, তাতে কাজের অনেক সুবিধা হয়, তখন তারা তা শিখে নিলে, আবার তাদের থেকে শিখলে পাশের লোকে।

মধ্যপ্রদেশে নর্মদা নদীর দক্ষিণ তীরে মহেশ্বরের কাছে নাবড়া তোলী টিলায় এক নবপ্রস্তর ঘাঁটি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, তা ১২০০ বিসিরও প্রাচীন। এখানে লোকে বাস করত চৌকোণ এবং গোল বাড়িতে, তাদের মাঝখানে ছিল সরু চলাফেরার পথ। বাড়ির ভিতরে শস্য ভাঙবার শিল মেঝের সঙ্গে গাঁথা, উনান অনেকটা এ কালের ইট মাটির তৈরি চুলার মতই। কাঠের খুঁটির উপর ছাত বসানো, দেয়ালের মত তাও সম্ভবত ডালপালা ও মাটি দিয়ে তৈরি হত। মেঝে ও দেয়াল চুনকাম করা হত। যাঁরা গ্রামটি উদ্ধার করেছেন তাঁদের ধারণা এখানে কয়েক ঘর মাঝির বাস ছিল।

উত্তর মহীশূরের ব্রহ্মগিরি নামক জায়গায় আছে আর একটি প্রসিদ্ধ নব-প্রস্তর ঘাঁটি, এখানে বসতি ছিল মোটামুটি স্থায়ী কৃষিজ্ঞানী সম্প্রদায়। এরা বাস করত কাঠের ঘরে, তার কোনও কোনওটার দেয়াল পাথর দিয়ে মজবুত করা। চার পাশে জঙ্গল, কিন্তু ঘষা পাথরের কুড়াল দিয়ে কেটে, এবং হয়তো আগুনে পুড়িয়ে, তা সাফ করে চাষের জমি তৈরি করা কঠিন ছিল না। এদের জীবনযাত্রার সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের বর্তমান রেড্‌ডি সম্প্রদায়ের তুলনা করা হয়েছে; গোদাবরীর পার্শ্ববর্তী পার্বত্য অঞ্চলে এরা যে জীবন কাটায় তা অনেকটা যাযাবর সংগ্রাহক ও স্থিতিশীল কৃষকের মাঝামাঝি,

ঘর দুয়ারের স্থায়িত্ব সামান্যই, ভাঁড়ারে বুনো গাছ গাছড়া ও মূলের পাশাপাশি কিছুটা খাদ্য যোগায় চাষ ও গার্হস্থ্য পশু। চাষের রীতি খুবই প্রাথমিক, জঙ্গল কেটে বা পুড়িয়ে সেই ছাইতে এরা জোয়ার বা মটরের বীজ ছড়ায়, অথবা লাঠি দিয়ে খুড়ে বীজ বোনে, কোদাল বলে কিছু নেই। ব্রহ্মগিরির প্রাগৈতিহাসিক অধিবাসীদের ঘর সংসার হয়তো এই রকমই ছিল অনেকটা। দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য এলাকার সাক্ষ্য থেকেও কিছুটা চঞ্চল এক জীবনের চিত্র পাওয়া যায়—ঘষা-কুড়ালী সম্প্রদায় পশু চরিয়ে বেড়াচ্ছে (অনেক জায়গায় গোবরের স্তূপ পাওয়া গিয়েছে) যেটুকু স্থিতিশীলতা তাদের জীবনে তা ঐ অল্প স্বল্প কৃষিচর্চার ফলে। এ জায়গায় ঘষা কুড়াল কৃষ্টির বয়স ১০০০-৩০০ বিসি। তামা ও কাঁসার জিনিসও কিছু পাওয়া গিয়েছে।

মনে হয় ১০০০ বিসি কি তার কিছু পরে বর্মার দিক থেকে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য বনভূমিতে প্রবেশ করেছিল প্রাথমিক কৃষিজ্ঞানী কয়েক দল লোক। এদের হাতে ছিল ঘষা পাথরের কুড়াল। এই কুড়াল মধ্য ভারতে মিশ্রিত হয়েছে অণুশিলার সঙ্গে যা আরও আগেই প্রতিষ্ঠিত ছিল দেশের মধ্য ও দক্ষিণ অংশে। অন্তত মধ্য ভারতে যে এই অণুশিলা-শিল্পীরা তখন পর্যন্ত কৃষি ও পশুপালন জানত না তা মনে হয় না, কিন্তু জঙ্গল কেটে জমি পরিষ্কার করতে এই উন্নত কুড়াল তাদেরও সম্ভবত খুব কাজে লেগেছে। এই নতুন আগন্তুকরা হয়তো দূর চীন অঞ্চল থেকে ধাতুবিদ্যাও সঙ্গে করে এনেছিল কিছুটা, পক্ষান্তরে স্থানীয় সূচনার থেকেই তা প্রধানত গড়ে উঠে থাকতে পারে। উত্তরে ও উত্তর-পশ্চিমে যে নব-প্রস্তর যুগের এই নানা বিদ্যা বহু শতাব্দী ধরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল তা তো আমরা জানি। ঐখানেই সিন্ধু উপত্যকায় ভারতে প্রথম ঐতিহাসিক সভ্যতার সূর্যোদয়।

এই অধ্যায়ে নবপ্রস্তর যুগের নানাবিধ আবিষ্কার ও তজ্জনিত বৃত্তির যা পরিচয় দেওয়া হল তার থেকে সমসাময়িক জীবনযাত্রা ও সমাজব্যবস্থার অনেকটা আমরা অনুমান করতে পারি। তার সঙ্গে এখানে আরও দু চার কথা যোগ করা যেতে পারে।

যুদ্ধ বিগ্রহের খুব স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ চিহ্ন না পাওয়া গেলেও প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত মেলে। ইরান সিরিয়া তুরস্ক গ্রীস য়োরোপের বল্‌কান অঞ্চলে মাটির বিভিন্ন স্তরে ব্যবহৃত বস্তুর মধ্যে আকস্মিক কৃষ্টিগত পার্থক্য লক্ষিত হয়েছে—যেমন হওয়া স্বাভাবিক যদি বাইরের থেকে কোনও দল হানা দিয়ে সাবেক বাসিন্দাদের মেরে শেষ করে বা বিতাড়িত করে। কখনও বা দুই কৃষ্টির মিশ্রণও দেখা যায়, যেন নতুন সমাজে পুরনোরাও কিছুটা স্থান পেয়েছে—হয়তো বিজয়ীদের প্রজা বা দাস হিসাবে। নবপ্রস্তর যুগের শেষ দিকে সামরিক কুঠার বা পরশু ও চকমকির ছোরা য়োরোপের কবরে রক্ষিত বস্তুদের মধ্যে প্রধান হয়ে উঠেছিল, এই সময়ে আত্মরক্ষার জন্য অনেক সম্প্রদায় প্রাকারাদি গড়েছে এমনও দেখা যায়। যুদ্ধ বিগ্রহের প্রধান কারণ যে খাদ্য সংকট তা অনুমান করা যেতে পারে। কৃষি আরম্ভ হওয়ার পরে প্রথম দিকে আবাদী জমির অভাব ছিল না ঠিকই, কিন্তু একই খেত বেশী দিন চাষ করা চলত না (কি কারণে তা আমরা আগে দেখেছি)। এই ব্যবস্থায় অকর্ষিত ভূমি ফুরিয়ে গিয়ে ক্রমে খাদ্যসমস্যা প্রকট হয়ে উঠতে বাধ্য। বন্যা অনাবৃষ্টি ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ফসল ও পশু ধ্বংস হলে সামান্য সঞ্চয় বেশী দিন টিঁকত না, আক্রমণ ছাড়া উদর পূর্তির উপায় থাকত না। দুর্ভিক্ষের ফলে একে অন্যের শরণাগত হয়ে থাকলে অহিংস মিশ্রণও ঘটে থাকতে পারে। যুদ্ধ প্রথমে পেটের দায়ে আরম্ভ হয়ে থাকলেও পরে যখন দেখা গেল যে খাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে ধন সম্পত্তি দাস দাসী ইত্যাদিও উপরি মেলে সহজে তখন তা ক্রমে 'বীরের খেলা' হয়ে দাঁড়াল।

নিজের শ্রম লাঘবের যে ইচ্ছার থেকে মানুষ বলদকে জুড়েছে তার হালে বা গাড়িতে, কখনও তারই প্রেরণায় সে দল বেঁধে অন্যান্য সম্প্রদায়ের উপর হানা দিয়েছে হয়তো, তাদের শস্য কেড়ে নিয়ে খাদ্যোৎপাদনের কষ্ট বাঁচিয়েছে, কেউ বা তার পর সেখানেই ঘর বাড়ি বানিয়েছে। এর জন্য সে যুগের লোকের হীন নীতিকে ধিক্‌কার দেওয়ার কোনও কারণ নেই, এ যুগে এত ধর্ম নীতি তত্ত্বকথা শেখার পরেও সুসভ্য জাতিরা পরের সম্পত্তির লোভে বিনা লজ্জায় যুদ্ধ চালিয়ে থাকে।

যাই হক, শাসকরা বাস করেছে জমিদারী চালে, প্রজাদের থেকে আদায় করেছে তাদের উৎপন্ন শস্যের এক মোটা অংশ, তার ফলে উৎপাদন

বাড়ানো প্রয়োজন হয়ে পড়েছে ; এ কথা অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু সম্বন্ধেও খাটে। এ ব্যবস্থা য়োরোপে মধ্যযুগ পর্যন্ত চলে এসেছে, এ দেশে আজও অনেকে এর সঙ্গে পরিচিত। এই অল্পসংখ্যক পোষ্যের পুঁজির ব্যবস্থা করতে বহুসংখ্যকের অতিরিক্ত উৎপাদন সে কালে শুধু যুদ্ধ ও দেশজয় থেকে নাও ঘটে থাকতে পারে : মিশরে বাইরের আক্রমণ এর কারণ হলেও ইরাকে সম্ভবত দেশের ভিতরেই এর উৎপত্তি ; সে দেশে সভ্যতার কেন্দ্র ও অতিরিক্ত সম্পত্তির ধাতা ছিল কোনও এক স্থানীয় দেবতা—অর্থাৎ রাজতন্ত্র নয় পুরোহিততন্ত্র। ইরাকের প্রাচীনতম দলিল-চিত্রে যুদ্ধের দৃশ্যের সঙ্গে দেখা যায় বন্দীর দল, এদের মধ্যে যারা বেঁচেছে তারা হয়তো যাবজ্জীবন ক্রীতদাস থেকেছে, শহর গড়তে দেহক্ষয় করেছে। এ সব অবশ্য ঐতিহাসিক কালের কথা, কিন্তু তার আগেই নিশ্চল সমাজে এই ভাগাভাগির পথ প্রস্তুত হচ্ছিল। এ দেশে সিন্ধুসভ্যতার শুরুতেই দেখা যায় সমাজের জটিল চেহারা—অপাঙ্‌ক্তেয় শ্রমিকদের জন্য আলাদা বাস ব্যবস্থা বা 'কুলি লাইন', কুলীন শাসক শ্রেণীর হাতে অতিরিক্ত খাদ্য সঞ্চয়, ইত্যাদি ; কি ভাবে অভ্যুদয় এই শ্রেণীর, কি ধরনের কর্তৃত্ব ছিল এদের হাতে তা কেউ জানে না।

সুতরাং নানা চিহ্ন ও সম্ভাবনার থেকে নবপ্রস্তর যুগেই যুদ্ধ বিগ্রহের ইঙ্গিত আমরা পাই, যদিও এগুলি হয়ত ছোট খাটো সংঘর্ষের বেশী কিছু ছিল না। এর ফলে ধাতুর ব্যবহার বেড়ে থাকতে পারে, সাবেক অস্ত্র যতই সুলভ হক ধাতুর মত নির্ভরযোগ্য নয়— দ্বন্দ্বযুদ্ধে ঠিক কাজের সময়ে পাথর ভেঙে যেতে পারে, কিন্তু তামার ফলা নয়।

বলা বাহুল্য, নবপ্রস্তর যুগের সব আবিষ্কার সে কালে মানুষ দেবতার দান বলেই নিয়েছে, নানা দেশের পুরাণে তার কৃতজ্ঞ স্বীকৃতি দেখা যায়। যেমন মেকসিকো অঞ্চলে মানুষ রূপার নিষ্কাশন বা জহুরীর বিদ্যা শিখেছে দেবশ্রেষ্ঠ কেট্‌জ্ঞালকোট্‌লের থেকে। অনতিদূরে পেরু দেশে:সূর্যদেবের সন্তানরা তাকে শিখিয়েছে কেমন করে বীজ বুনতে হয়, কেমন করে পথ কেটে পাহাড়ের জল আনতে হয় খেতে বাগানে ; সে দেশের প্রধান পালিত পশু লামা—তাকে পোষ মানানো, চরানো, তার থেকে পশম সংগ্রহ, সেই পশম দিয়ে কাপড় তৈরি, কাপড় রং করা এ সবের রহস্য এরাই উদ্‌ঘাটন করেছে, তেমনি কুমার সেকরার কাজ থেকে আরম্ভ করে বাড়ি গ্রাম শহর মন্দির

সৃষ্টির বিদ্যাও। এই সব নতুন জ্ঞানের প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ নতুন রূপ নিল, জটিলতা দেখা দিল তার মধ্যে, সেখানেও দেবতার হাত মানুষকে পথ দেখিয়ে নিয়েছে সুশৃঙ্খল সংহত জীবনের দিকে—স্ত্রী পুত্র পরিবার নিয়ে বাস করা, প্রবীণদের নেতাদের মেনে চলা (বিশেষ করে ইন্‌কা শাসকদের) সে জীবনের ভিত্তি। পারস্যে তেমনি হোশাং দেব শিখিয়েছে ভূমির কর্ষণ, নদী থেকে খাল কেটে তার সেচের ব্যবস্থা, ধাতুর সন্ধান ও ব্যবহার, পশুর পালন ও প্রজন—উপরন্তু ন্যায় বিচার ও আচার। সে দেশের ধর্মরাজ যামশিদ কয়েক শতাব্দী ধরে মানুষকে ভাগ করেছে চার শ্রেণীতে : পুরোহিত, যোদ্ধা (যারা আর্য জাতির শত্রুকে প্রতিরোধ করবে), কৃষক ও কর্মকার ; এই শ্রেণীবিভাগ যদি আমাদের ঈষৎ পরিচিত মনে হয় তো এই প্রসঙ্গে বলি যে যামশিদের প্রাচীন নাম যিম, বৈদিক দেবতা যম আর সে অভিন্ন। পারসীক পুরাণে আমাদেরই মত সুর অসুর ধর্ম অধর্মের সংগ্রাম দেখা যায়—বস্তুত সে দেশের আর এক রাজা তমুরথ অসুরদের যুদ্ধে হারিয়ে তাদের থেকে আদায় করে নিয়েছিল মানুষের অতি প্রয়োজনীয় লেখন-বিদ্যা। চৈনিক পুরাণে মানুষকে এত সব বিদ্যা শিখিয়েছে পর পর তিন সম্রাট, তারাও প্রায় দেবতার অবতার। প্রথমেই সম্রাট ফু-হি সামাজিক জীবনের গোড়া পত্তন করলে, বোঝালে বিবাহের গুরুত্ব। মাছ ধরা, শিকার, পশুপালন, যজ্ঞে হোম, এমন কি বাদ্যযন্ত্র তৈরি পর্যন্ত তার কাছ থেকে শেখা। তার পর এল শুন্‌, সে কৃষির জনক, সেই সংক্রান্ত নানা যন্ত্র ও পদ্ধতি তার দান, নানা উদ্ভিদের (বিশেষত ভেষজ) গুণও সেই শিখিয়ে দিলে। এর পরে যা যা বাকি থাকল প্রসিদ্ধ যোদ্ধা সম্রাট হুয়াং-টি তার অভাব পূরণ করলে, যেমন চাকার গাড়ি, ঋতু অনুসারে চাষ, ধাতুবিদ্যা, মণি রত্নের ব্যবহার, ইটের বাড়ি, রেশমের চর্চা ও বয়ন, জ্যোতিষ এবং লেখন ; শাসন ব্যবস্থা এবং পয়সার ব্যবহারও এরই দান। এই রাজারা অবশ্য ঐতিহাসিক নয়, প্রাবাদিক, কিন্তু একটা কথা আছে যে সব পুরাণ কাহিনীর নেপথ্যে পাওয়া যাবে অন্তত এক কণা সত্য।

আগের অধ্যায়ে এক কাল্পনিক গ্রামকে কেন্দ্র করে আদি নবপ্রস্তর পল্লী সমাজের দৈনন্দিন গৃহস্থালির ছবি আঁকবার চেষ্টা হয়েছে অল্প কয়েকটি কথায়, এখানে এক বাস্তবিক গড়ন্ত শহরের জটিলতর জীবন অনুমান করা

যেতে পারে। শহরের নাম এরিদু, তার উল্লেখ করেছি আগে, অবস্থান দক্ষিণ ইরাকে। প্রত্নবিদের কুড়াল এখানেও স্তরে স্তরে বিবিধ কৃষ্টি উন্মোচিত করেছে—বসতির থেকে গ্রাম, তার থেকে শহর, শেষে মহানগর।

প্রাগিতিহাসের পৃষ্ঠা ৪০০০ বিসিতে খুললে দেখা যায় এরিদু গড়ে উঠেছে বেশ একটু উঁচু জমিতে, নিচে অবশ্য পূর্বতন সম্প্রদায়দের সমাধি। এখানে দাঁড়িয়ে প্রথমেই অদূরে চোখে পড়ে ইউফ্রেটিস নদী, তার জলে পাল তুলে চলেছে নৌকার শ্রেণী। পারের কাছে লক্ষ করা যায় সাধারণ লোকের নানা দিনগত কার্যকলাপ : নদীর জল সেখানে আনা হয়েছে নালি কেটে তার পাশে কেউ হাল চালাচ্ছে, কেউ খাগড়ার নল কাটছে কোনও কাজের জন্য, কেউ খেজুর পাড়ছে গাছে চড়ে। লোকসংখ্যা প্রায় ২০০০ ; এখানে চতুর্দিকে গ্রামের লোকেরা এসে জড়ো হয় দৈনিক প্রয়োজনের জিনিস বেচাকিনি করতে। মাঝে মাঝে দূর দেশের বণিক জহুরীরাও আসে আরও জমকালো পসরা নিয়ে—ইরানের গাঢ় নীল লাজাবর্দ, মিশরের চিকন অ্যালবাস্টার মর্মর, লোহিত সাগরের উপকূলে কুড়ানো কত রঙে রং করা বিচিত্র শাঁখ ঝিনুক। আগে এত রকমারি জিনিস চোখেও দেখা যেত না, এখন চলা ফেরার সুবিধা হয়েছে, বিশেষ করে নদী পথে ; তার ফলে টাইগ্রিস ইউফ্রেটিসের দুই তীর ছোট ছোট শহরে ভরে উঠেছে।

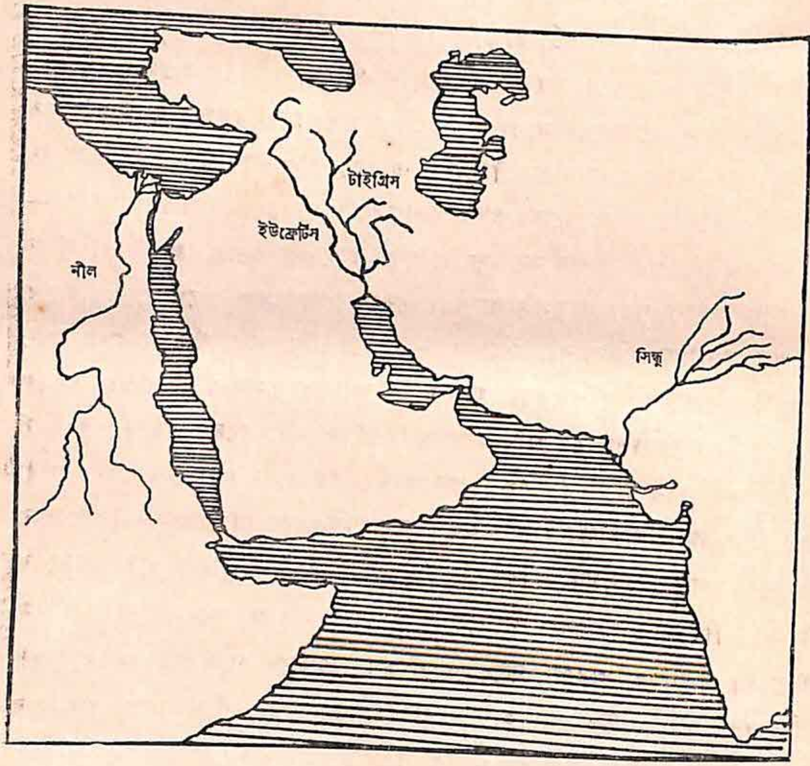
এরিদুতে কয়েক ঘর পাকা বাড়ি চোখে পড়ে, কিন্তু ইট এখনও খুব চলতি নয়, অধিকাংশ ঘরই সরল ও সাধারণ, তাদের খিলান করা কাঠামো খাগড়া আর হোগলা দিয়ে তৈরি, হাওয়া খেলবার জন্য দু দিক খোলা। কিন্তু সব কিছুর উপরে মাথা তুলে এক মন্দির সূর্যালোকে ঝলমল করছে শহরের উত্তর দিকে। মন্দিরের সোজা সোজা দেয়াল অবশ্য ইটের তৈরি, শাঁখের গুঁড়ো লেপে 'চুনকাম' করা। এর পরিকল্পনা অনেকখানি স্থাপত্য প্রতিভার পরিচয় দেয়, এর সৃষ্টি যৌথ প্রয়াসের উজ্জ্বল নিদর্শন। এখানে কত পূজারীর আনাগোনা, কত রকম তাদের সাংকেতিক ক্রিয়া কলাপ। সামনে প্রশস্ত চত্বর—উত্তর কালের সাক্ষ্য থেকে মনে হয়, শুধু পূজা পার্বণে নয় হাট বাজারে কিংবা সভায় উৎসবে কিংবা নিতান্ত অকাজে তা সাধারণের মিলন ক্ষেত্র। হয়তো বিশেষ উপলক্ষে এবং বিপদে আপদে সেখানে শহর-

বাসীদের ডাক পড়ে, গণ্যমান্য ব্যক্তিরা বক্তৃতা করেন; কারুকার্যখচিত আসাসোঁটা বা রাজদণ্ডের মত জিনিস পাওয়া গিয়েছে এরিদুতে, কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার এই প্রতীকটি বোধ হয় অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের ব্যবহারের বস্তু; এই আভিজাত্য ও সম্ভ্রমের কারণ সম্ভবত উচ্চ বংশ, অধিকতর বয়স বা জ্ঞান—ধন বা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নয়।

এরিদুর লোকে যে চাষ বাজার কারিকরী কাজ বা অদৃশ্য দেবতা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় ব্যাপারের চর্চা ছাড়া আর কিছু জানত না তা নয়, তারা যে হাসত খেলত শিল্প চর্চা করত তার প্রমাণ আছে, অথবা অনুমান সম্ভব। হয়তো মন্দিরের প্রাঙ্গণেই দাবা বা ঐ জাতীয় কোনও রকম অক্ষক্রীড়ার ছক কাটা ছিল—বিবিধ নবপ্রস্তর ঘাঁটিতে এ ধরনের খেলার ঘাঁটির মত বস্তু বহু উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। সংগীতের প্রথম উপকরণও এরিদুতেই পাওয়া গিয়েছে—এ কালের বাঁশের বাঁশীর মত ফুটো করা হাড়ের তৈরি যন্ত্র। ভাস্কর্য যে মানুষকে অনেক পুরা কালেই আকৃষ্ট করেছে তা আমরা দেখেছি, এ সময়েও এ শিল্প অনাদৃত ছিল না, তবে দুটি বিষয়ে বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয়: কিছু কিছু মৃন্ময়ী স্ত্রী-মূর্তি দেখা যায় যারা আগের তুলনায় যৌনপ্রকৃতিসর্বস্ব নয়, শ্রোণীভারে স্তনভারে অতি মাত্রায় বিড়ম্বিত নয়, এদের তনুদেহের শীর্ষে চুল চুড়ো করে বাঁধা (সিন্ধু উপত্যকায়ও এই ধরনের কেশ বিন্যাস দেখা যায়), একমাত্র অস্বাভাবিকতা অদ্ভুত অমানুষিক মুখ বা মুখোস—কিন্তু তার হয়তো কোনও ধর্মগত কারণ ছিল। দ্বিতীয়ত, এরিদুতে পুরুষ দেহের প্রথম পূর্ণাঙ্গ মূর্তি পাওয়া গিয়েছে—কোনও কারণে পুরুষের দেহ বা অঙ্গ ভাস্কররা এ যাবৎ অবজ্ঞা করে এসেছে। এখানে পালবাহী নৌকার দশ ইঞ্চি লম্বা এক মাটির প্রতিকৃতিও পাওয়া গিয়েছে—পাঁচ সহস্রাধিক বছর আগের কোনও ইরাকী শিশুর খেলনা সম্ভবত।

অন্যান্য বাড়ী ঘরের তুলনায় মন্দিরটি এত চমকপ্রদ যে শহরের আত্মাটি যে সেখানেই অধিষ্ঠিত ছিল, তাকে ঘিরেই যে সাধারণের জীবনধারা বয়ে যেত তাতে সন্দেহ থাকে না। শুধু তাই নয়, উত্তর কালে বহু শতাব্দী ধরে যে ঠিক একই জায়গায় বারে বারে মন্দির গড়া হয়েছে অতীতের ধ্বংসের উপর তাতে মনে হয় যেন একই দেবতা প্রতিষ্ঠিত থেকেছে। (এই অধ্যায়ের প্রথম দিকে উত্তর ইরাকেও এক মন্দিরশ্রেণীর ক্রমপরিণতিতে আমরা ঠিক

এই ঐতিহ্য লক্ষ করেছি।) প্রাগৈতিহাসিক কালেই এখানে বিগ্রহ, বলি, সাংকেতিক রং মন্ত্র ক্রিয়া ইত্যাদির প্রচলন হয়েছিল হয়তো। ঐতিহাসিক কালের উষায় এরিদুর মন্দিরে ছিল এক জলদেবতার অধিষ্ঠান, তার নাম এন্‌কি। ৪০০০ বিসিতেও কি এরই প্রভুত্ব ছিল? সে কালে মানুষের ভাগ্য জলের উপর এত বেশী নির্ভর করত যে তা মোটেই আশ্চর্য নয়। বাস্তুদেবতা



৪৬ নং চিত্র
এই চার নদীকে আশ্রয় করে পৃথিবীর প্রথম সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।

যেই হয়ে থাকুক, তার জন্য যে ঘর বানাতে হবে এবং সামান্য মানুষের তুলনায় তার ঘরটি যে সবচেয়ে বড় সবচেয়ে সুন্দর হবে তাতে এরিদুবাসীর মনে কোনও সন্দেহ ছিল না। শুধু এরিদু কেন, সর্বত্র সর্ব কালে মানুষ তার স্থাপত্য প্রতিভার শ্রেষ্ঠ যত্ন ও প্রয়াস উৎসর্গ করেছে মন্দির সৃষ্টিতে।

শুধু স্থাপত্যে নয়, শুধু নবপ্রস্তর যুগে নয়, এই রকম ব্যবহারিক প্রেরণাই পুরা কালে মানুষকে শিল্পী বানিয়েছে তা আমরা আগেও দেখেছি। কিন্তু শিল্প সৃষ্টির নিঃস্বার্থ প্রেরণা কি তাকে একেবারেই অস্থির করে নি, আজ যেমন করে? বিশ্বাস করা শক্ত যে বাঁশী আবিষ্কারের আড়ালে আছে কোনও দেবতার প্রতি ভয় বা ভক্তি, শুধু তাকে খুশী করতেই এরিডুর বাতাসে প্রথম সুর বেজে উঠেছিল। পুরাপ্রস্তর গুহাশিল্পীর হয়তো সময় ছিল না নিজের খেয়ালে ছবি আঁকবার, কিন্তু নবপ্রস্তর বিপ্লবের পরে জীবন-সংগ্রাম আর এত কঠিন ছিল না নিশ্চয়। এরই ফলে, অবসর বিনোদনের চেষ্টাকে আশ্রয় করে, মানুষের স্বাভাবিক শিল্প প্রতিভা এবং শিল্প সৃষ্টির বিবিধ সম্ভাবনা তার মনে উজ্জীবিত হয়ে উঠল। জনৈক নৃতত্ত্ববিদ মন্তব্য করেছেন যে মানুষের সাংস্কৃতিক প্রগতির মূলে আছে সময়ের ভারে ক্লান্তি বোধ করবার একান্ত মানবিক ক্ষমতা ("the human capacity for being bored")।

* * * *

মানুষের মিছিল যখন ইতিহাসের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে তখন তার সমাজ ও জীবন-পদ্ধতিতে যে অনেকখানি জটিলতা এসে গিয়েছে তা দেখা গেল। সেই পুরা কালের 'দিন আনি দিন খাই' ব্যবস্থার মারাত্মক বন্ধন থেকে বহু লক্ষ বছর পরে অবশেষে সে মুক্তি পেয়েছে। শুধু অন্ন চিন্তায় আর দিন কাটে না, অন্য চিন্তাও আছে, কারণ এখন তার অনেক প্রয়োজন। তা মেটাতে সৃষ্টি হয়েছে বিবিধ শ্রেণী—তাদের মধ্যে অনেকেরই সংসার আর আত্মসম্পূর্ণ নয়, চাহিদা মেটাতে নির্ভর করতে হয় অন্যের শ্রমের উপর; যে মন্দির গড়ে বা খাল কাটে বা ধাতুর কাজ করে তার হয়তো আর আবাদী জমি নেই, তাকে বিনিময়ে খাদ্য সংগ্রহ করতে হয়, অথবা সমাজ তাকে পোষণ করে। পরিবারের গণ্ডির বাইরে সমষ্টিগত সহযোগিতা ও যৌথ প্রচেষ্টা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে, তা না হলে যথেষ্ট উৎপাদন বা আত্ম-রক্ষা আর সম্ভব নয়। শুধু ঘরে ঘরে নয়, দেশে দেশেও যোগাযোগ ও নির্ভরতা বেড়েছে, বাণিজ্যের প্রয়োজনে, জলে স্থলে যান বাহনের সাহায্যে। মানুষ যা উৎপাদন করে তার একান্ত অধিকার তার আর নেই, ভাগ দিতে হয় সমাজের ভর্তা ও পোষ্যদের। শুধু সামাজিক বৃত্তি বা পেশায় নয়,

সামাজিক মর্যাদাতেও শ্রেণীর বিভাগ আরম্ভ হয়েছে—সামরিক, সংগঠনী বা জাদুকরী ক্ষমতার অধিকারী এক অভিজাত ব্যক্তি বা সংখ্যালঘিষ্ঠ শ্রেণী সমাজের শীর্ষে স্থান পেয়েছে হয়তো দুর্ভিক্ষ বা অন্য কোনও প্রাকৃতিক সংকট কালে, সমাজের উপর কর্তৃত্ব করছে ঐহিক কিংবা দৈব শক্তির প্রতিনিধি হিসাবে। ...

এর পরে বহু কাল পর্যন্ত নতুন আবিষ্কার এক আঙুলে গোনা যায় ; নবপ্রস্তর যুগের হাজার চার পাঁচ বছর ধরে প্রায় ঊর্ধ্বশ্বাস বিদ্যার্জনের পর মানুষ যেন তার ফল উপভোগ করতে বসল। ঐতিহাসিক কালের প্রধান আবিষ্কার অবশ্য লিপি—সুমেরে ও মিশরে। সে লিপি কিন্তু আজকের লেখা নয়, সম্পূর্ণ অক্ষর-লিপির ধারণা মানুষের মাথায় আসতে বহু শতাব্দী কেটে গেল —১৩০০ বিসির কাছাকাছি মধ্যপ্রাচ্যের পশ্চিম প্রান্তে তা ফিনিশীয় বণিক সম্প্রদায়ের আবিষ্কার। তার অল্প আগে (১৪০০-১৩০০ বিসিতে) তুরস্কের ইন্দো-য়োরোপীয় হিটাইট সাম্রাজ্যে প্রকৃত লৌহশিল্প আয়ত্ত হয়েছে। দশমিক সংখ্যাবিজ্ঞান ব্যাবিলনীয়রা উদ্ভাবন করেছে ২০০০ বিসির কাছাকাছি।

মানুষের জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত তার ইতিহাস সমগ্র ভাবে কল্পনা করতে গেলে যেন এক মিছিলের ছবি বার বার চোখের সামনে ফুটে ওঠে। যাত্রা যখন শুরু তখন বহু দূরে ঘনান্ধকার দিগন্তের গায়ে অল্প কয়েকটি মূর্তির ছায়া —ভীরু, মন্থর তাদের পদক্ষেপ ; সামনে অফুরন্ত পথের উপর দূরে দূরে এক একটি তোরণ, সে দিকে এগিয়ে আসতে আসতে লক্ষ লক্ষ বছর চলে গেল, তবু সেই গাঢ় তমসায় অতি ক্ষীণ আলো ফুটল মাত্র, শোভাযাত্রার রেখাটি বিশেষ প্রলম্বিত হল না। তার পর ক্রমে আকাশ উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে লাগল, যাত্রীদের পদক্ষেপ অনেক দ্রুত ও দৃঢ়, সামনের লোকে অনেকগুলি তোরণ পিছনে ফেলে এসেছে—কিন্তু জনরেখা এত দীর্ঘ যে অনেকে এখনও এর কোনও কোনওটা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে নি। চলার পথে এক সমুজ্জ্বল তোরণের কাছে যখন মিছিলের মুখ এসেছে সেই দিনটিতে আমরা শেষ করছি এই মানুষ পুরাণ—এই দরজা অতিক্রম করে মানুষ নিজের হাতে তার ইতিহাস রচনা করে গিয়েছে, একে একে মিশর, সুমের, সিন্ধু, ক্রীট ও গ্রীস দেশে সভ্যতার বীজ বুনেছে।

সে দিন থেকে আজ পর্যন্ত এই ৫০০০ বছরে অবশ্য আরও অনেকগুলি উজ্জ্বল তোরণ পার হয়ে সে প্রবেশ করেছে অনির্বাণ আলোর জগতে। এই সময়ের মধ্যে দুটি পরিবর্তন বিশেষ করে চোখে পড়ে : শোভাযাত্রা দেখতে

দেখতে বহু গুণ স্ফীত হয়ে উঠেছে ; দ্বিতীয়ত সে দিন যারা ছিল পিছনে আজ তারা পুরোভাগে, যারা ছিল আগে তারা পিছিয়ে পড়েছে—পুবের লোকের স্থান দখল করেছে পশ্চিমীরা।

এশিয়া হয়তো মানুষের জন্মক্ষেত্র, এশিয়ার মানুষ সর্বাগ্রে জীবিকার উপর কর্তৃত্ব অর্জন করে এক মহাবিপ্লব সাধন করেছে, পরে সেই অঞ্চলেই ঘটেছে সভ্যতার উন্মেষ। তার পর একদা এগিয়ে গেল নবীন য়োরোপ, কিন্তু হাজার দুই বছর পিছনে পড়ে থেকে আবার যেন এশিয়া (এবং আফ্রিকা) প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছে। সে যে সম্ভবত পুনরায় স্থান নেবে মিছিলের মুখে এমন ধারণা প্রকাশ করেছেন পশ্চিমের মনীষীরাই ; তার কারণ মিছিলে ক্রমেই বেড়ে চলেছে ময়লা হলদে কালো রঙের প্রাধান্য, এবং মাঝখানে যারা ঝিমিয়ে পড়েছিল তারা আবার সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে নতুন উৎসাহে।

কিন্তু কে এগিয়ে গেল কে পিছিয়ে পড়ল আজ তা আর বড় কথা নয়—আজ সমস্যা হল বেঁচে থাকার। আমাদের কাহিনীতে যেখানে মানুষের থেকে আমরা বিদায় নিয়েছি সেখানে সে বুঝেছে যৌথ জীবন ও সহযোগিতার মূল্য। কিন্তু এই শিক্ষা বহু চেষ্টাতেও কাজে লাগানো সম্ভব হয় নি আজ পর্যন্ত—এ দিকে তার প্রয়োজন বেড়েছে বহু গুণ। প্রায় দশ লক্ষ বছরের ইতিহাসে এত বড় সংকট আর দেখা দেয় নি কখনও। এই সংকট উত্তীর্ণ হতে পারলে তবেই এই মানুষের মিছিল আরও এগিয়ে যাবে পৃথিবীর লীলাক্ষেত্রে, আরও আশ্চর্য কীর্তি সাধন করবে শিল্পে বিজ্ঞানে দর্শনে, যার অঙ্কুর সেই আদিম অন্ধকারে প্রথম দেখা দিয়েছিল অন্ধবিশ্বাস আর কুহকে। নতুবা রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায়ের ডাক আসবে অকালে, কারণ নাটক যে পরিচালনা করছে তার চোখে সব অভিনেতাই সমান—২০০ কোটি বছরের ইতিহাসে দেখা যায় যে যে মানিয়ে নিতে পারে নি সেই তলিয়ে গিয়েছে অবলুপ্তির অন্ধকারে, তার প্রতি কোনও দয়া দাক্ষিণ্য করে নি প্রকৃতি। মানুষ তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হলেও এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার দার্শনিক স্পিনোজার উক্তি : মানুষের সুবিধা অনুযায়ী পৃথিবী তৈরি হয় নি—যেমন হাত পা তৈরি হয় নি মশার দংশনের জন্য, বা নাক সৃষ্টি হয় নি চশমা ধারণ করতে।

প্রাসঙ্গিক পাঠ্য

Carrington, Richard	:	A Guide to Earth History
Childe, Gordon	:	Man Makes Himself
Childe, Gordon	:	What Happened in History
Clark, Grahame	:	World Prehistory
Cole, Sonia	:	The Neolithic Revolution
Fairservis, W. A.	:	The Origins of Oriental Civilization
Laming, Annette	:	Lascaux
Montagu, Ashley	:	Man : His First Million Years
Nesturkh, M.	:	The Origin of Man
Piggott, Stewart	:	Prehistoric India
Sankalia, H. D.	:	Indian Archaeolgy Today
Stewart, George R.	:	Man : An Autobiography
Unesco	:	History of Mankind, Vol 1
Wheeler, Mortimer	:	Early History of India and Pakistan

নির্দেশিকা

লেখক সম্বন্ধে

শচীন্দ্রনাথ বসু ইতিপূর্বে নানা বিষয়ে বই লিখেছেন, কিন্তু বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ এই প্রথম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণীতে এম এস সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি পরে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পি এইচ ডি উপাধি আনেন।

তিনি এ যাবৎ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় রত।